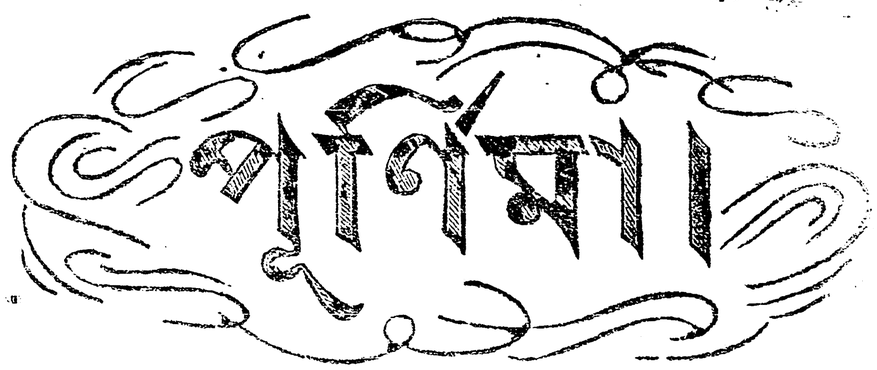

# পূর্ণিমা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ,
প্রাপ্ত ১৩-১ বঙ্গাব্দ

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সপ্তদশ বর্ষ।

বাঁশবেড়িয়া,

পূর্ণিমা যন্ত্রে—শ্রীশ্রীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৬ সাল।

# পূর্ণিমা

## সপ্তদশ বর্ষ।

## সূচীপত্র।


| বিষয় | পত্রাঙ্ক |
|---|---|
| অন্বেষণ | ১ |
| উদ্ভট কবিতা | ৬০ |
| কাব্যে ইতিহাস | ১৯। ৭৩। ৮৯। ১৩৯। ১৬৫ |
| কেরোসিন তৈল | ৯ |
| গদাই পুরুৎ | ৯৮ |
| ত্রিবিধ জীবন | ৪১ |
| দেশের ও দশের কথা | ৪০ |
| দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ | ১৬৯ |
| নির্ব্বাসিতা | ৩৬ |
| বারাণসী ও সারনাথে | ১৯১ |
| পরেশনাথ | ২১৮ |
| ভাগীরথী | ১৭ |
| ভাব ও ভাষা | ১৭৮ |
| ভারতে শিষ্টাচার | ২৭ |
| ভূ-প্রদক্ষিণ | ২। ৫৪। ১৩৭ |
| মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার | ২১৫ |
| মেঘদূতে মেঘের পথ | ১১৯ |
| সমাজের উপর সাহিত্যের প্রভাব | ৮১ |
| সমালোচন | ১৮৩ |
| সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্ | ১১। ৬৭। ১০৮। ১৫৩। ১৫৯। ২০৯ |
| স্মরণে | ২১৪ |
| হরিদ্বার | ৯৭ |

# পূর্ণিমা

## সপ্তদশ বর্ষের লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

" সুরেশচন্দ্র সেন।

" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

" চন্দ্রশেখর কর।

" যতীন্দ্রমোহন সিংহ।

" পশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

" নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

" রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

" চুণীলাল সেন।

" মুনীন্দ্রদেব রায়।

" কুমুদনাথ মল্লিক।

" অজরচন্দ্র সরকার।

" অচ্যুতচন্দ্র সরকার।

" সুধীরচন্দ্র মজুমদার।

" যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

" বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

## শেষ সুযোগ!!

ষোড়শ বর্ষের পূর্ণিমা কয়েক সেট্ মাত্র বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা, ৫৫০ পৃষ্ঠা সারগর্ভ প্রবন্ধে পরিপূর্ণ। তাহাতে প্রবীণ সাহিত্যরথী, বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সমালোচক, ভূতপূর্ব্ব "নবজীবন" ও "সাধারণী" সম্পাদক, মান্যবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের ১৫টী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ; হুগলী বারের প্রধান উকিল সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল মহাশয়ের "দ্বারকার পথে" শীর্ষক সুমধুর ভ্রমণ কাহিনী ও অন্যান্য সারগর্ভ প্রবন্ধ; "পাপের পরিণাম" "অনাথ বালক," প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বি, এ মহাশয়ের "হৈমবতী" গল্প; "কাব্যকথা" প্রণেতা সুপ্রতিষ্ঠ লেখক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু সুরেশচন্দ্র সেন এম, এ মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ "মহর্ষি-কণ্ব" প্রবন্ধ; হাইকোর্টের উকিল সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল মহাশয়ের "গণেশ মামা"; শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়ের বহু গবেষণাপূর্ণ "বৌদ্ধধর্ম্ম" বিষয়ক প্রবন্ধ; নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক, সাবেক "বঙ্গদর্শনের" লেখক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ, কাব্য-কণ্ঠ বিশারদ কবিরাজ ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ মহাশয়ের "আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস," "ত্রিগুণ ও ত্রিদোষ" প্রভৃতি সুচিন্তিত প্রবন্ধ; "বেলা," "পরিমল" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রণেতা সুকবি গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কবিতা; "মাধুরি" প্রভৃতি পদ্য গ্রন্থ প্রণেতা সুকবি চুনীলাল সেন এল্ এম্, এস্ মহাশয়ের পদ্য; প্রতিভাশালী লেখক শ্রীমান অজরচন্দ্র সরকারের তসর চাষ সম্বন্ধীয় সারগর্ভ প্রবন্ধ; শ্রীমান কুমুদনাথ মল্লিকের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ "নদীয়া-কাহিনী;" শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের কবিকঙ্কণের সমালোচনা এবং অন্যান্য বহু সুলেখকের সুচিন্তিত প্রবন্ধ, গল্প ও পদ্য প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। ডাকমাশুল সমেত মূল্য ২৷৵০।

শ্রীশ্রীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
পূর্ণিমা প্রকাশক, বাঁশবেড়িয়া।

## সন ১৩১৬ সালের

## পূর্ণিমায় কাহারা লিখিবেন ?

যাঁহারা গত বর্ষে লিখিয়াছিলেন, তাঁহরা ত লিখিবেনই তাহা ছাড়া বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজের প্রাইভেট সেক্রেটারি সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, আর, এ এস ; এফ্ আর এস এ (লণ্ডন) মহাশয়ের কৌতূহলোদ্দীপক "ভূ-প্রদক্ষিণ" ; "উড়িষ্যার চিত্র," "ধ্রুবতারা" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ লেখক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি, এ মহাশয় ; "পৌরানিক কথা" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা প্রসিদ্ধ সুলেখক বাঁকীপুরের গবর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম, এ বি এল মহাশয় ; ফরেষ্ট অফিসার রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল ; সুকবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি,এ এবং অন্যান্য অনেক সুলেখক পূর্ণিমায় লিখিবেন। যাঁহারা বর্ত্তমাণ বর্ষে পূর্ণিমার গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, সত্বর মূল্য পাঠাইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।

শ্রীশ্রীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
পূর্ণিমা প্রকাশক। বাঁশবেড়িয়া।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহকগণের প্রতি।—

পূর্ণিমার মূল্য অগ্রিম দেয়। গ্রাহকগণের নিকট সবিনয় নিবেদন তাঁহারা বৈশাখ সংখ্যা পূর্ণিমা পাইয়াই সপ্তদশ বর্ষের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করেন। নতুবা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পূর্ণিমা তাঁহাদের নিকট ভিপি ডাকে পাঠান হইবে। কাহারও আপত্তি থাকিলে ১লা আষাঢ়ের মধ্যে জানাইবেন। বাঙ্গালী গ্রাহকদের দুর্নাম আছে, যে তাঁহারা কাগজ লইয়া মূল্য দেন না, কিন্তু পূর্ণিমা দ্বারা তাঁহাদের সে কলঙ্ক দূর হইয়াছে। অতীব আনন্দের বিষয় সন ১৩১৫ সালের পূর্ণিমার মূল্য কোনও গ্রাহকের নিকট বাকী নাই।

ভরসা করি এবারেও পূর্ব্বমত অগ্রিম মূল্য পাঠাইতে কেহ ইতস্ততঃ করিবেন না। নিবেদন ইতি—

বিনীত নিবেদক শ্রীশ্রীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
পূর্ণিমা প্রকাশক

বৈশাখ। ১ম সংখ্যা।

# পূর্ণিমা

## সপ্তদশ বর্ষ।


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| অন্বেষণ | শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ | ১ |
| ভূ-প্রদক্ষিণ | শ্রীপশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, আর, এ, এস ; এফ্, আর, এস্, এ, (লণ্ডন) | ২ |
| কেরোসিন তৈল | শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি,এল | ৯ |
| সেতুবন্ধ রামেশ্বর | শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল | ১১ |
| ভাগীরথী | শ্রীঅচ্যুতচন্দ্র সরকার | ১৭ |
| কাব্যে ইতিহাস | শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায় | ১৯ |
| ভারতে শিষ্টাচার | শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ২৭ |
| নির্ব্বাসিতা | শ্রীচুনীলাল সেন এল্ এম্ এস্ | ৩৬ |
| দেশের ও দশের কথা | | ৪০ |

# ভূ-প্রদক্ষিণ।

## প্রথম অধ্যায়।

### [ যাত্রা ]

১৯০৬ সালে ১৭ এপ্রেল তারিখে আমরা তিনজন বন্ধু ভূ-প্রদক্ষিণ উদ্দেশে বহির্গত হই। এই ভূ-প্রদক্ষিণ বৃত্তান্ত আমার কতিপয় বন্ধু আমাকে লিপিবদ্ধ করিয়া কোন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুযায়ী এই প্রবন্ধাবলী লিখিতে আরম্ভ করিলাম। দেশে অনেক সাময়িক পত্র থাকিতে " পূর্ণিমায় " ইহা প্রকাশ করিবার দুইটি উদ্দেশ্য আছে। প্রথম " পূর্ণিমার " যে গ্রামে জন্ম আমি সেই গ্রামে ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। সুতরাং "পূর্ণিমা" আমার স্বদেশী। দ্বিতীয়, "পূর্ণিমায়" আমি পূর্ব্বে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখিতাম। এই দুই কারণে "পূর্ণিমা" আমার বড় প্রিয়। পূর্ব্বে লিখিতাম বেনামিতে, এবার লিখিলাম স্বনামে। আমার বেনামী নাম ছিল,—" প্রণবানন্দ শর্ম্মা "।

১৯০৬ সালের ১৭ এপ্রেল রাত্রিকালে বম্বে মেলে আমরা বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিলাম। চলিলাম ইউরোপ পথে। পরদিন প্রাতঃকালে মোগলসরাই ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। সেখান হইতে বারাণসীপতি ভগবান বিশ্বেশ্বরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া উত্তরপশ্চিমাভিমুখে ছুটিলাম। বৈকালে এলাহাবাদ, সন্ধ্যার সময় জব্বলপুর, তৎপরদিন প্রাতঃকালে ভুসাওল ও বৈকালে ৪টার সময় বম্বে পৌঁছিলাম। এ সকল স্থানের বর্ণনা এখানে নিষ্প্রয়োজন, কারণ বহু লোক দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। ইংলণ্ড যাত্রাও বহু লোকে লিখিয়াছেন। তাহাতেও নূতনত্ব বিশেষ কিছু নাই। তবে ইউরোপ খণ্ডের অন্যান্য দেশের বৃত্তান্ত অল্পই বাহির হইয়াছে এবং ঐ সকল দেশের বৃত্তান্ত বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করাই এই প্রবন্ধাবলীর উদ্দেশ্য।

আমরা বম্বে পৌঁছিয়াই বম্বের প্রধান গৌরব " তাজ মহল " হোটেলে বাসা করিলাম। " তাজমহল " সপ্ততল গৃহ। উহার নির্ম্মাণ কৌশল দেখিলে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠই আধুনিক ইউরোপীয় প্রণালীতে সজ্জিত। বাটীর বাহিরের শোভা প্রাচ্য ও



পাশ্চাত্য উভয়েরই সম্মিলন। বড় সুন্দর। সমুদ্রের কূলে স্থাপিত বলিয়া আরও রমণীয় দেখা যায়। তাজমহলের তুল্য গৃহ আধুনিক ভারতবর্ষে কোন স্থানে আছে কি না সন্দেহ। তাজমহলের উপরের কোন তালায় যিনি বাস করিয়াছেন, কিম্বা কোন জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে বারাণ্ডায় ক্ষণকাল সামুদ্রিক বায়ু সেবন করিয়াছেন, তিনি এ জীবনে সে সুখের কাল কখন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। তাজমহলে আমরা দুই দিন বাস করিয়া ২০ এপ্রেল বেলা ১০টার সময় জাহাজে চড়িলাম। আমাদের জাহাজের নাম ছিল " পেনিনসুলার " ( S. S . Peninsular. )। জাহাজে চড়িবার পূর্ব্বে হোটেলে ডাক্তার আসিয়া আমাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিল। সে সময় প্লেগের বড় হাঙ্গামা। যাহা হউক, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। ডাক্তার তাহা কিরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন বুঝিতে পারি নাই। যে দিন পরীক্ষা হইল তাহার পূর্ব্ব রাত্রে আমার সমস্ত রাত্রি ভেদ ও বমি হইয়াছিল। প্রাতঃকালে এত দুর্ব্বল যে উঠিবার শক্তি ছিল না। অতি কষ্টে কম্পিত কলেবরে সাহেবের সম্মুখে হাজির হইলাম। সাহেব কিন্তু healthy অর্থাৎ সুস্থ বলিয়া আমাকে পাশ করিয়া দিলেন। আমিও তাঁহার বাক্যে সুস্থ হইলাম। জগতের অনেক পরীক্ষাই এইরূপ। আমাদের মালপত্র পূর্ব্বে আমাদের ক্যাবিনে পাঠান হইয়াছিল। জাহাজ বেলা ৩ টার সময় বন্দর ছাড়িল। দেখিতে দেখিতে রমণীয় বম্বে নগর আমাদের চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইল। সুখের জন্মভূমি সোনার ভারত ছাড়িয়া আমরা অকূল সাগরে ভাসিলাম। বন্দরের নিকট সমুদ্রের জল খুব নীল নয়, কিন্তু যত মধ্যসমুদ্রে যাইতে লাগিলাম, জল ততই নীল হইতে লাগিল। চারিদিকে কিছুই নাই কেবল অনন্ত শ্যামারূপিনী সাগর। বায়ু হিল্লোলে জল কখন কম্পিত হইতেছে ও বায়ু প্রবল হইলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গ উঠিতেছে। তরঙ্গ প্রবল হইলে একটি তরঙ্গের উপর আর একটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইয়া শ্বেত বর্ণ ফেণ উদ্গীরণ করিতেছে। নীল জলের উপর শ্বেতবর্ণ ফেণ দেখিতে বড় চমৎকার। চারিদিকে কেবল তাহাই। মধ্যে মধ্যে একখানি জাহাজ অপর দিক হইতে আসিতেছে। সাত দিন ও সাত রাত অনবরত জাহাজ চলিতে লাগিল। চারিদিকে কেবল অনন্ত জলরাশি ও উপরে অনন্ত

আকাশ। মধ্যে আমরা একদিন একটা তিমি মৎস্য ( whale ) দেখিয়াছিলাম। সেটা জলের উপর মুখ বাড়াইয়া জল উদ্গীরণ করিতেছিল ; যেন একটা প্রকাণ্ড প্রস্রবণ ছুটিতেছিল। সাত দিনের পর আমরা দূর হইতে আরব দেশের ছোট ছোট পাহাড় দেখিতে পাইলাম। ক্রমে এডেন বন্দর দেখা গেল। বন্দরে যখন আমাদের জাহাজ যাইয়া নঙ্গর করিল তখন রাত্রি ১টা। এইখানে আমাদের জাহাজ পরিবর্ত্তন করিতে হইল। "পেনিনসুলার" জাহাজ বম্বে হইতে এডেন পর্য্যন্ত যায়, আবার বম্বে ফিরিয়া আসে। অষ্ট্রেলিয়ান মেল ষ্টীমার "মর্ম্মরা" ( S. S. Marmora ) এখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমাদের জাহাজ পৌঁছিবার এক ঘণ্টা মধ্যে আমরা মালপত্র সহ জাহাজ পরিবর্ত্তন করিলাম। এই পরিবর্ত্তন প্রণালী বড় চমৎকার। ক্রেণের ( crane ) সাহায্যে সমস্ত মাল এক জাহাজ হইতে অপর জাহাজে উঠান হইল। সমুদ্র বক্ষ বৈদ্যুতিক আলোকে দিবার ন্যায় আলোকিত হইয়াছিল। আমরা যখন একখানি ছোট ষ্টিমার যোগে "পেনিনসুলার" হইতে "মর্ম্মরায়" উপস্থিত হইলাম তখন আমাদের ক্যাবিনে যাইয়া দেখিলাম, আমাদের সমস্ত জিনিষ পত্র যথাস্থানে সাজান রহিয়াছে। জাহাজের লোকেই এই সকল করিয়া রাখিয়াছে। কাহারও একটি পিন পর্য্যন্ত হারায় নাই। যখন মর্ম্মরার বক্ষে আমরা যাইয়া দাঁড়াইলাম, তখন দেখিলাম অষ্ট্রেলিয়ান যাত্রীরা জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। আমাদের দেখিয়া সকলে সমঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন :—" Three cheers for the Indian gentlemen " আমরাও মস্তকাবরণ খুলিয়া তাঁহাদের অভিবাদন করিলাম। তাঁহাদের সৌজন্যে প্রীত হইয়া আমরা আপন আপন ক্যাবিনে যাইয়া শয়ন করিলাম। রাত্রি ৪টার সময় জাহাজ নঙ্গর উঠাইয়া সুয়েজ ( Suez ) অভিমুখে যাত্রা করিল।

প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি আমরা লোহিত সাগরে ( Red Sea ) প্রবেশ করিয়াছি। বেলা ৮টার সময় পেরিম দ্বীপ ( Perim Island ) দেখিতে পাইলাম। পেরিম আমাদের দক্ষিণে রহিল ; আমরা বরাবর সুয়েজ পথে চলিলাম। এই পেরিম দ্বীপের উপকূলে মুক্তা পাওয়া যায়। মুক্তা



তুলিবার জন্য বহুসংখ্যক লোক ও নৌকা নিযুক্ত আছে। সমুদ্র গর্ভে ডুবুরিগণ ( divers ) প্রবেশ করিয়া সমুদ্রের তলদেশ হইতে মুক্তার ঝিনুক উঠাইয়া আনে এবং ঐ ঝিনুকের ভিতর হইতে মুক্তা বাহির করে। এই কার্য্যে যথেষ্ট লাভ আছে। লঙ্কার ( Ceylon ) উপকূলেও এইরূপ মুক্তা পাওয়া যায়। পেরিমের অপর নাম অরমজ্ (Ormuz )। মিল্টনের " wealth of Ormuz and of Ind " এই পেরিম দ্বীপের উল্লেখে লেখা হইয়াছে। পেরিম আরবদেশের উপকূলে স্থিত। আরবদেশ সাধারণতঃ রুক্ষ কিন্তু এই পেরিম দ্বীপ দেখিতে বড় সুন্দর। আমাদের জাহাজ ক্রমাগত লোহিত সাগরে যাইতে লাগিল। দক্ষিণে এসিয়া ও বামে আফ্রিকা রাখিয়া আমরা ইউরোপ অভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। লোহিত সাগর শুনিয়া কেহ মনে করিবেন না যে উক্ত সাগরের জল লোহিত বর্ণ ; সম্পূর্ণ নীল, যেমন অপরাপর সাগরের জল। পৃথিবীতে সকল সাগরের জলেরই রং একরূপ, প্রগাঢ় নীল। বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর, আরব সাগর, লোহিত সাগর, ভূমধ্য সাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, আইরিশ সাগর, জর্ম্মন সাগর প্রভৃতি সকল সাগরের বর্ণ নীল।

আমরা ক্রমাগত পাঁচদিন পাঁচরাত্রি লোহিত সাগরের ভিতর দিয়া যাইয়া ষষ্ঠ দিন বৈকালে সুয়েজ ( Suez ) বন্দরে পৌঁছিলাম। ভারতবর্ষে প্লেগের জন্য ভারতাগত সমস্ত জাহাজেই আটক অর্থাৎ quarantine করা হইয়াছিল। যাত্রিদের কাহাকেও নামিতে দেওয়া হয় নাই। একজন ডাক্তার আসিয়া আরোহিদিগকে পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা নাম মাত্র, যেমন বম্বে বন্দরে হইয়াছিল। ডাক্তার মহাশয় বসিয়া রহিলেন, একজন লোক তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া প্যাসেঞ্জারদিগের নামের তালিকা পাঠ করিতে লাগিলেন। যাঁহার যখন নাম ডাকিল তিনি তখন উঠিয়া যাইয়া ডাক্তার মহাশয়ের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন। আমাদের নাম ডাকা হইলে আমরাও ঐরূপ চলিয়া গেলাম। এটাকে Doctor's Levee বলিলেও চলে। এখানে একটি রহস্য জনক ঘটনা হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গীগণের মধ্যে একজন Dr. Mukerjee ছিলেন। তাঁহার নামের "ডাক্তার" শব্দটি অস্পষ্ট ভাবে লেখা ছিল। তালিকা পাঠক উচ্চৈঃস্বরে পড়িলেন " The Mukerjee "। বন্ধু

যখন চলিয়া গেলেন তখন একটা প্রকাণ্ড হাসির রোল উঠিল। পরীক্ষা হইয়া গেলে সন্ধ্যার সময় সুয়েজ খালের ( Suez Canal ) ভিতর প্রবেশ করিলাম। খাল নিতান্ত অপ্রশস্ত; দুইখানি জাহাজ পাশাপাশি যাইতে পারে না। মাঝে মাঝে প্রশস্ত স্থান আছে। যখন দুইদিক থেকে দুইখানি জাহাজ আসে তখন একখানিকে খালের ঐ প্রশস্ত স্থানে অপরটির জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। খালের দুইধারে বালুকাময় প্রান্তর। বালি উড়িয়া আসিয়া খালের ভিতর পড়ে এবং dredger দ্বারা পরিষ্কার করা হয়। নিয়তই এইরূপ হইতেছে। সুয়েজ খাল প্রায় ৯০ মাইল লম্বা। লোহিত সাগর (Red Sea ) ও ভূমধ্য সাগরকে (Mediterranean Sea) যুক্ত করিয়াছে। সমস্ত রাত্রি খালের ভিতর দিয়া গেলাম। খালের ধারে মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম বা Canal Station আছে। সাইনাই পর্ব্বত ( Mount Sinai ) খাল হইতে দূরে দেখিতে পাওয়া যায়। পরদিন বেলা ১০টার সময় পোর্ট-সৈয়দ ( Port Said ) পৌঁছিলাম। পোর্ট সৈয়দ একটি ছোট সহর ও বন্দর, কিন্তু ইহাতে নানা দেশের লোক আছে। আরব, তুর্কী, ফ্রেঞ্চ, ইংরাজ, ইটালিয়ান, গ্রীক, এমন কি ভারতবর্ষের লোকও দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের লোকেরা মণিহারির দোকান করে, এবং প্রায় সকলেই সিন্ধু দেশের লোক। এসিয়াটিক লোকের মধ্যে আরব বেশি ও ইউরোপিয়ান-দের মধ্যে ফ্রেঞ্চ। পোর্ট সৈয়দে অনেক ভাল ভাল অট্টালিকা আছে এবং রাস্তাঘাটও ভাল। পূর্ব্বে এ রকম ছিল না। বড় কদর্য্য স্থান ছিল। সুয়েজ ও পোর্ট সৈয়দ মিশর ( Egypt ) দেশের অন্তর্গত। সুয়েজ কেনাল যে অদ্ভুত ক্ষমতাশালী ইঞ্জিনিয়ারের কল্পনা, ও তত্ত্বাবধানে কাটা হইয়াছে তাঁহার নাম মঁস্যু দি লেসেপ ( M. de Lesseps )। ইনি একজন প্রসিদ্ধ ফরাশী ইঞ্জিনিয়ার। ইঁহার লৌহময় প্রতিমূর্ত্তি সমুদ্রের তীরে বিরাজ করিতেছে। জাহাজে আসিতে বা যাইতে বহুদূর হইতে দেখা যায়।

'মর্ম্মরা' জাহাজ বরাবর পোর্ট সৈয়দ হইতে মারশেল ( Marseilles ) বন্দরে যাইবে। আমাদের কল্পনা ছিল ইটালী ( Italy) সুইজরল্যাণ্ড (Switzerland ) প্রভৃতি দেশ দর্শন করিয়া পরে ইংলণ্ড যাইব। সেই কারণে পোর্ট সৈয়দ বন্দরে আমরা জাহাজ বদল করিলাম। প্রাতরাশ সমাপন



করিয়া আমরা 'মর্ম্মরা' পরিত্যাগ করিয়া বুন্দিসির জাহাজে চড়িলাম। এই জাহাজের নাম 'ওসাইরিস' ( Osiris )। "আইসিস্" ( Isis ) এবং "ওসাইরিস্" এই দুইখানি জাহাজ পাল্‌টা পাল্‌টি করিয়া পোর্ট সৈয়দ হইতে বুন্দিসি যাতায়াত করে। জাহাজ দুইখানিই ছোট কিন্তু বড় দ্রুতগামী। যখন পূর্ণ তেজে চলে তখন ছুরির ন্যায় জল কাটিয়া যায়। আমাদের ভাগ্যে "ওসাইরিস্" ছিল, সুতরাং আমরা তাহারই শরণ লইলাম। জাহাজে মাল বোঝাই করিতে ও ডাক প্রভৃতি লইতে দুই তিন ঘণ্টা কাটিয়া গেল। বেলা প্রায় ২টার সময় "ওসাইরিস্" বন্দর ছাড়িয়া তীরের ন্যায় ছুটিতে লাগিল। বড় জাহাজে ঢেউ লাগে না, ছোট জাহাজে লাগে; সুতরাং তরঙ্গ বেশি হইলে জাহাজ কাঁপিয়া কাঁপিয়া চলে। ভূমধ্য সাগর ( Mediterranean Sea ) বক্ষে এইরূপে তিন দিন তিন রাত্রি চলিলাম। দ্বিতীয় দিনে 'ক্রীট' ( Crete ) অথবা ক্যাণ্ডিয়া ( Candia ) দ্বীপ দেখিতে পাইলাম। ক্রমে জাহাজ ক্রীটের উপকূলে সমস্ত দিনই চলিতে লাগিল। ক্রীটের পর্ব্বত, বৃক্ষরাজি ও সমুদ্র তীরবর্ত্তী ছোট ছোট গ্রাম নজর হইতে লাগিল। সর্ব্বোপরি আইডা পর্ব্বত ( Mount Ida ) প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান, মস্তকে তুষাররাজি, অঙ্গে বৃক্ষরাজি এবং পদতলে ছোট ছোট পর্ব্বত রাজি। ক্রীট দেখিতে বড় সুন্দর। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ক্রীট ছাড়িলাম, কিন্তু সেই সময়েই আকাশে মেঘের সঞ্চার হইল। ক্রমে মেঘ ঘনীভূত হইতে লাগিল, তাহার পরে ঝড়। সমুদ্র প্রবল বায়ুবেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল। আমরা কোন মতে আহারাদি সারিয়া আপন আপন ক্যাবিনে যাইয়া শয়ন করিলাম। অর্দ্ধেক রাত্রে উঠিয়া দেখি সমুদ্র ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে চারিদিকে ভয়ানক অন্ধকার ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গ। আমার বন্ধু, পূর্ব্বোল্লিখিত 'The Mukerjee' মহাশয়, আমার ক্যাবিনে শয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলাম, তিনি গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছেন এবং বমি করিয়া ক্যাবিন ভাসাইয়া দিয়াছেন। বুঝিলাম সমুদ্র পীড়া ( Sea Sickness ) হইয়াছে। অপর একটি বন্ধুর ক্যাবিনে যাইয়া দেখিলাম, তাঁহারও ঐ অবস্থা। জাহাজের ডাক্তার সাহেব এই সময় ক্যাবিনে ক্যাবিনে ঘুরিয়া দেখিতেছিলেন কাহার

সমুদ্র পীড়া হইয়াছে। আমি যেমন ক্যাবিনের বাহিরে আসিলাম অমনি ডাক্তার সাহেব আমার ঘাড়ের উপর পড়িলেন; আমিও পড়িলাম তাঁহার ঘাড়ে। উভয়ে জড়াজড়ি করিয়া পড়িয়া আবার উঠিলাম। উভয়েই অপ্রস্তুত। তিনি বলিলেন, Excuse me, আমি বলিলাম Excuse me। আমি তাড়াতাড়ি ক্যাবিনে যাইয়া শয়ন করিয়া রহিলাম। রাত্রি ৪টার সময় গ্রীসের ( Greece ) উপকূল দিয়া চলিলাম। কিন্তু সেই অন্ধকার ও দুর্যোগে কিছুই দেখা গেল না; আর কাহার সাধ্য দ্যাখে। প্রাতঃকালেও খুব ঝড় ছিল। সমুদ্র কম্পমান, জাহাজও কম্পমান, আমরাও কম্পমান। প্রাতঃকালে উঠিয়া ডেকের উপর গেলাম। সেখানে যাইয়া দেখিলাম কয়েক জন বীর পুরুষ, অর্থাৎ যাঁহাদের সমুদ্র পীড়া হয় নাই, ডেকের উপর বেঞ্চে বসিয়া আছেন। আমারও সমুদ্র পীড়া হয় নাই, সুতরাং আমিও সেই বীর পুরুষদিগের মধ্যে স্থান পাইলাম। আমার যে সমুদ্র পীড়া হয় নাই তাহার কারণ আমি উহা নিবারণের একটি উপায় জানি। যদি কোন সমুদ্র যাত্রী ঐ উপায় জানিতে চাহেন, যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আমার নিকট আসিলে বলিয়া দিতে পারি। উহা লিখিয়া জানান যায় না। ক্রমে যত বেলা অধিক হইতে লাগিল, ঝড়ও কমিতে লাগিল। বেলা ২টার মধ্যে সব ঠাণ্ডা। তখন সমুদ্র শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। চারিদিক পরিষ্কার। আমরা ডেকের উপর উঠিলাম। দূরে কূল দেখিতে পাইলাম। কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'ওটা কি?' কাপ্তেন বলিলেন,—'Italian Coast.' এই ইটালীর কথা কতই শুনিয়াছি, কতই পড়িয়াছি, কিন্তু কখন দেখি নাই। সেই ইটালী আজ দেখিতে পাইলাম। বালককালে যখন ভূগোল পাঠ করিতাম, তখন ইটালী দেখিবার বড় সাধ হইত। সেই সাধ আজ পূর্ণ হইল। জাহাজ ক্রমে ইটালীর উপকূল দিয়া চলিতে লাগিল। একটি সুন্দর নগর দেখিতে পাইলাম। কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'ওটি কোন সহর?' কাপ্তেন বলিলেন,—ওত্রান্তো ( Otranto ) বেলা ৫টার সময় বৃন্দিসি বন্দরে জাহাজ নঙ্গর করিল। সম্মুখে বৃন্দিসি, সম্মুখে ইউরোপ। বৃন্দিসি ইউরোপের দ্বার। ছোট খাট বৃন্দিসি, কিন্তু ইহার খুব গৌরব। এইখানে ভার্জিলের নিকট বিদায় লইয়া আমরা ইউরোপের ঘাটে পদার্পণ করিলাম।

শ্রীপশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

# কেরোসিন তৈল।

## [ সামাজিক প্রবন্ধ * ]

বহু দিন পূর্ব্বে যখন আমি "তৈলতত্ত্ব" নামক ক্ষুদ্র সামাজিক প্রবন্ধ লিখি, তাহাতে প্রধানতঃ যে চারিটী তৈল আমাদের দেশে আজ কাল খুব প্রচলিত অর্থাৎ তিলের তৈল, সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল ও রেড়ির তৈল, এই চারি প্রকার তৈলের বিষয় লিখিয়াছিলাম। তাহা পাঠ করিয়া আমার কোন বিজ্ঞ আত্মীয় বলেন যে কেরোসিন তৈল আমাদের দেশে আজ কাল যেরূপ চলন হইয়াছে, উহাও আমাদের সর্ব্বদা ব্যবহৃত তৈলের মধ্যে এক রকম বিবেচনা করা আমার উচিত ছিল এবং তাহার বিষয়েও কিছু বলা আবশ্যক ছিল। সে কথা শুনিয়া আমি সেই অবধি ভাবিতেছি—কেরোসিন তৈলের কথা কি বলিব। পূর্ব্ব লিখিত তৈলতত্ত্বের কথা সংক্ষেপে এই; তিলের তৈল পিতৃলোকদিগের ও নিজাত্মীয়দিগের স্নেহ, সরিষার তৈল প্রতিবেশীর স্নেহ, নারিকেল তৈল স্ত্রীলোকদিগের স্নেহ এবং রেড়ির তৈল দাস দাসীর স্নেহ। তবে কেরোসিন তৈল কি স্নেহ হইবে? কেরোসিন তৈল যে ধাতুর জিনিষ তাহাতে ইহার তৈল ভাবটা বড় কম বলিয়াই তৈলতত্ত্ব আলোচনার সময় উহাকে মনে পড়ে নাই। না আছে ইহার সে তৈলের মাখমাখ, চট্‌চটে ভাব, আর না আছে কোন স্নিগ্ধকারী গুণ। কাজেই তৈলপর্য্যায় মধ্যে উহাকে ধরিতে সহসা মনে হয় নাই। কিন্তু এখন তৈল বলিয়া বিচার করিতে হইলে স্নেহ অধিকারে ইহার সহিত কিসের তুলনা হয়। বোধ হয় বৈদেশিক স্নেহের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। বিদেশীর ভালবাসায় যেমন না আছে সে মাখমাখ ভাব, না আছে সে স্নিগ্ধকারী গুণ, এই তৈলেও তদ্রূপ। তবে যখন জ্বলে, আলো খুব প্রখর হয়। বিদেশীর প্রেমও তথৈবচ। যখন ভালবাসা দেখান হয়, তাহার চটকটা বড়ই বেশী, চক্ষু ঝলসাইয়া যায়। আমরা সেই জন্যই একটু বেশী আলোর লোভে কেরোসিন তৈল ব্যবহার করিতেছি।

---

* তৈলতত্ত্বের পরিশিষ্ট।

দেশীয় কত বড় লোকের মুখে, কত বিদেশীর সদাশয়তার, সহৃদয়তার, দয়া দাক্ষিণ্যের ও অপর কত কি গুণের প্রশংসা করিতে শুনিয়াছি। কথাটা ঠিক, তাঁহারা যখন যাহা করেন তাহার দীপ্তি বড় প্রখর। কিন্তু সে স্নেহ, সে ভালবাসা যতই প্রবল হউক না, কৈ তাহাতে সে প্রাণে প্রাণে মেশে কৈ, সে চট্‌চটে ভাবটা কৈ, সে স্নিগ্ধকারী গুণটা কৈ, তাহাতে প্রাণের ভিতর যে ঠাণ্ডা হয় না। বরং অনেক সময় কেরোসিন তেলের ঝাঁজে অনেকক্ষণ লেখাপড়া করার পর এমনি মাথা ধরে যে মাথায় কিছু তিলের তেল দিলে যেন ভাল হয়। হইলে কি হয় বাহ্যিক চটকের এমনি মাহাত্ম্য যে আমরা আবার তাহা ভুলিয়া গিয়া সেই কেরোসিন তৈল ব্যবহার করি। দেশী লোকের ভালবাসায় মন উঠে না, তাই বিদেশীর জ্বলন্ত শিখায় প্রাণাহুতি দি। তাই কি কেবল চক্ষু ঝলসান আর মাথা ধরা। যিনি ঘরে কেরোসিন তেল ব্যবহার করেন তিনিই জানেন যে কিরূপ ইহাতে জিনিষ পত্র, ঘর দ্বার অপরিষ্কার হয়। কত যে ময়লা জন্মে, কালী পড়ে, তাহার সীমা নাই। বিদেশীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়াও আমাদের ঘর দ্বার নানা রকমে আবর্জ্জনা পূর্ণ হইতেছে। তাহাদের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের আচার ব্যবহার, এমনি অনুকরণ করিতে বসিয়াছি যে আমাদের ইহকাল পরকাল মজিতেছে। তাই আমরা এখন তুলসিমঞ্চে ক্রোটন রোপন করিতেছি, ঠাকুরের বদলে কুকুরের সেবা করিতেছি, দুগ্ধের স্থানে চা পান করিতেছি, দিনরাত বিদেশী আঙ্গবাব পোষাক পরিচ্ছদের আয়োজন করিতেছি। এ সকলই কেরোসিন তেলের মাহাত্ম্য। সময় গুণে, অবস্থা দোষে, মোমের বাতির আলো যুটে না, আর রেড়ির বা নারিকেল তৈলের মিটমিটে আলোয় মন উঠে না। কাজেই আমাদের মহা বিভ্রাটে পড়িতে হইয়াছে।

তারপর যদি আয় ব্যয়ের দিক দিয়া দেখেন কথাটা আরও পরিষ্কার। আমাদের সরিষা, নারিকেল বা রেড়ির তৈলের মাটীর প্রদীপের দাম কি, আর কেরোসিন তেলের একটা সসাজ আলোরই বা দাম কত। আলোর দীপ্তিটা খুব প্রখর বটে কিন্তু অসুবিধা ও ব্যয় বাহুল্য কত। বিদেশী লোকের সহিত প্রণয় করিতেও এইরূপ অনেক সাজপাট চাই, ব্যয় বাহুল্য



আছে। একজন বিদেশী সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন শুনিবা মাত্র অন্ততঃ এই দারুণ গরমের দিনেও একটা কিছু আচ্ছাদন গায়ে দিতেই হইবে। প্রদীপে তেল ঢালিয়া জ্বালাইলে চলিবে না, চিম্‌নি চাই, আর যদি জুটিয়া উঠে, ডুম চাই, চাপা চাই, আর কত কি যে চাই তাহা আমরা জানি না। তাই বলি এত গোলে কাজ কি, কেরোসিন তৈল যেখানকার সেখানেই থাকুন, আমরা আমাদের তিল, সর্ষপাদি লইয়াই থাকি। তাহাতেই আমাদের ভক্তি, তাহাতেই আমাদের তৃপ্তি।

শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

---

# সেতুবন্ধ রামেশ্বর।

যখনই কংগ্রেস উদ্দেশ্যে বড়দিনের বন্দে মান্দ্রাজ যাওয়া ঠিক হইল, তখনই মনে মনে সংকল্প করিলাম যে এবার রামচন্দ্রের সেতু দেখিব—ও রামেশ্বরম্ দ্বীপে রামেশ্বরম্ লিঙ্গমূর্ত্তি দর্শন করিব। আর কোথাও যাওয়া না যাওয়া অবস্থা ও সঙ্গীর উপর নির্ভর, কিন্তু সংকল্পটা অটুট। তাই যখন হাবড়া পুরাতন প্লাটফরমে গিয়া টিকিট কিনিলাম, তখনই রামেশ্বরের দ্বিতীয় শ্রেণীর রিটর্ণ টিকিট কিনিলাম। সস্তা হইল—এক ভাড়ায় যাওয়া আসার টিকিট মিলিল। বড় দিনের বন্দ বলিয়া রেল কোম্পানির এটা অনুগ্রহ। মূল্য ৬১৲ কয়েক আনা গণিয়া দিলাম। মোট ঘাট লইয়া বসিয়া আছি—এই আসেন এই আসেন, কিন্তু আসিলেন না—আমার দ্বারকা পথের সঙ্গী, আমার জ্বালামুখী যাত্রার সঙ্গী—সেই, পাঠকের পূর্ব্বপরিচিত পূর্ণচন্দ্র আসিলেন না। সুতরাং আমি একা—ভেকা। ট্রেণ ছাড়িল।

আরও একটু উপক্রমণিকা চাই। পাঠক পাঠিকা আমায় ক্ষমা করিবেন

গুরুদেবের কৃপার শেষ নাই। তাড়াতাড়ি একটা গাড়ীতে উঠিলাম—বড় ভিড়। গাড়ীতে আমি উঠিতে না উঠিতে পাশের দুইটি বার্থ একেবারে অধিকৃত, কাজেই যত শীঘ্র পারি মধ্যের বেঞ্চখানি আমি দখল করিলাম। উপরের বার্থ দুইটিও দখল হইয়া গেল। একটু পরে বুঝিলাম, গাড়ীখানি কম্পোজিট অর্থাৎ আধখানি সেকেণ্ড ক্লাশ, আর আধখানি ফার্ষ্ট ক্লাশ। প্রথমেই গাড়ী দেখিয়া হর-গৌরি মনে পড়িল। প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন, আঃ চৌধুরী অর্থাৎ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, বড় ব্যারিষ্টার, কংগ্রেসের সেক্রেটরী, বড় লোক। আর ছিলেন স্বয়ং শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট। আর ছিলেন আল্লাবাদের হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়। আর ছিলেন রাসবিহারী বাবুর প্রাইভেট সেক্রেটরী আর পথিমধ্যে জুটিয়াছিলেন—বহরমপুরে—একজন উকীল যোগীয়া। তিনি বহরমপুরে কংগ্রেস পক্ষের লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। হাবড়া প্লাটফরমে আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় তারস্বরে টেলিগ্রাম হস্তে এই নিমন্ত্রণ কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

আমাদের কামরায় ছিলেন, রাসবিহারী বাবুর ভাই বিপিন বাবু বর্দ্ধমানের উকীল, আর এ পক্ষ স্বয়ং আর তিনটি অপরিচিত ব্যক্তি। আবুল কাসেম সাহেবকে বিপিন বাবু ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু ভাল কামরা পাইয়া সেইখানে উঠিয়া যান। বলাই বাহুল্য খানিকক্ষণ পরে আলাপ পরিচয় হওয়ায় অপরিচিত আর অপরিচিত রহিলেন না। গাড়ীতেই পরদিন যুক্তি হইল আমরা তিনজনে রামেশ্বর যাইব এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিব—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ভ্রমণ করিতে যাইব ইত্যাদি ইত্যাদি।

মান্দ্রাজ কংগ্রেস মণ্ডপের পার্শ্বেই এলফিনষ্টোন কোং হোটেল ভবনে আমাদের থাকিবার স্থান হইয়াছিল। আমরা নিম্নতলায় ছিলাম। আমাদের ঘরে আমরা তিন জনেই ছিলাম। অন্য লোক আসে নাই। পাশের ঘরে ছিলেন—"পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ"—সেই আল্লাবাদের শ্রীযুক্ত সত্যচরণ। তিনি খুব উঁচু সুরে কথা কন, আমরা প্রথম প্রথম চমকাইয়া উঠিতাম। সেই ঘরে ছিলেন আর একজন ব্যারিষ্টার। তারপর এসেছিলেন অনেক। অনেকে আবার কেবল দেশ দেখিয়া বেড়াইতে



আরম্ভ করিলেন। আমাদের তাহা নয়, রথও দেখা রম্ভাও বিক্রয় করা। ক'দিন বেশ সুখে ছিলাম। সে কথা ত আর বলিব না, মনেই রহিল।

তাপ্তীতীরে তিরোভাব হইয়াছিল যে কংগ্রেসের সেই কংগ্রেসের আবার আবির্ভাব হইল কংগ্রেস্-গুরুর—মৃতসঞ্জীবনী অমৃতবারি সেচনে। প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্রে দিক্ নিনাদিত হইল। সকলেই সুখী হইলেন—রাজায় প্রজায়—মর্‌লে গোখ্‌লে। আর আমরা? মিষ্টান্ন মিতরে জনা। তা মাছ মাংস খাই না—আমার ভারী বিপদ। এই বিপদেও সঙ্গী ছিলেন—রাজসাহীর কিশোরীমোহন বাবু।

সব যাক্, কথা কত মনে উঠিতেছে—তর্ক বা কত?

প্রাণে প্রাণ পড়্‌লো ধরা
বলে গেল সোনার পাখী।

মনে সুখ, শরীরে সুখ। হু হু করে বসন্ত বায়ু বহিতেছে, তাহার মৃদু মন্দ শীতল স্পর্শে শরীর মন একেবারে পবিত্র মোহিত কিন্তু চকোরের সুখ দেখিতে পারে না চাতকী। দুইদিন সুখভোগ করিতে না করিতে চাতকী অভিশাপ দিল। আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল। ক্রমে বসন্ত মলয় মারুৎ হিল্লোল স্থলে হইল কি না মুষলধারে বরিষণ। বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি। কিন্তু কাজের কোন ব্যাঘাত হয় নাই। এমন কি শেষ দিনে বৃষ্টি স্বত্বেও আমরা কলিঙ্গদার ( Collingoda ) রাজার বাসায় নিমন্ত্রণ খাইতে ও বাজী দেখিতে ও সঙ্গীত শুনিতে, বীবীর নাচ গান দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

কংগ্রেস ফুরাইল—হয়ত কংগ্রেস বাদীর হাতে গালি খাইব। কিন্তু আমি ভাই কংগ্রেস কাহিনী লিখিতে বসি নাই। আমি একটুখানি উপক্রমণিকা দিতেছি মাত্র। রাগ করিও না—সকল কার্য্যেরই সময় আছে।

যে দিন আসিব, ওঃ সে দিনের কি ভীষণ চিত্র। বেশী বৃষ্টি হইলে সাহেবরা বলেন Raining cats and dogs—কিন্তু এ যে মান্দ্রাজী বৃষ্টি—এখানে কুকুর বিড়ালের পরিবর্ত্তে মহিষ উষ্ট্রের কথা বলা যাইতে পারে। মুষলধারে বৃষ্টি—বিছানা মাদুর তোরঙ্গ প্যাট্‌রা ভিজিয়া একেবারে পাঁক—আর আমরা ভিজিতে ভিজিতে একখানি গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া S I. R. দক্ষিণ ভারতের রেলের বড় ষ্টেশন এগমোর ( Egmore ) ষ্টেশনে আসিয়া পঁহু-

ছিলাম। আমাদের প্রোগ্রাম ঠিক করাই ছিল—লাট বেলাট যাচ্চেন কি না। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়ার আমাদের টুর প্রোগ্রাম প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এগমোরে আসিয়া মনে হইল, বাড়ী যাই, আর কাজ নাই দেশ দেখিয়া। এত ভিড়, আর সব দ্বিতীয় শ্রেণীর পথিক। মধ্যম শ্রেণী নাই কি না? তার উপর আবার বিপদ, শ্লীপদের উপর আবার বিস্ফোটক আছে। ত্রিচিনপল্লী সহরে একটি বিশাল মেলা বসিয়াছে। কাবেরী নদীর মধ্যস্থলে একটি চরে বিষ্ণুমূর্ত্তি মন্দিরে স্থাপিত আছেন। নাম হইতেছে শ্রীরঙ্গম্। মেলার নাম শ্রীরঙ্গম্ মেলা। পৌষের কৃষ্ণা একাদশীতে কাবেরী স্নান করিয়া বিষ্ণু পূজা করিতে হয়। শুনিলাম দশ লক্ষ লোক আসিয়াছে। ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি পাঁচ মিনিটে স্পেশিয়াল দিতেছে অথচ যেমন লোক তেমনি। আমাদের সাম্‌নে পাঁচখানা গাড়ী ছাড়িয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে আমরা চারি হাত মাত্র অগ্রসর হইয়াছিলাম। হাঁসিবেন না, কথা সত্য, সাক্ষীও আছে। তারপর জোর করিয়া প্লাটফরমে যাইতে চেষ্টা করিলে ফিরিঙ্গিরা ধরিয়া মারে—চক্ষে দেখিলাম বটে। ফিরিঙ্গি অর্থে এখানে সাহেব মাত্রই নন; ট্যাঁস বা মেটে যাহারা তাহাদের কথা বলিতেছিলাম। আর সকলের মরণ কি একই দিনে। কংগ্রেসের যত লোক সবই সেই দিন সেইক্ষণে প্লাটফরমে উপস্থিত। যাহাহৌক অনেক কষ্টে দুইটি অপরিচিত দাদার সাহায্যে (এখন অবশ্য পরিচিত কিন্তু অপরিচিত বলায় ক্ষতিই বা কি) একখানি গাড়ী দখল করিলাম। আমি যাইতে না যাইতে আমার কাপড় টানিয়া ফেলিয়া দিয়া অধিকার করিলেন আমার স্থান—একটি বৃদ্ধ, নিবাস মুর্শিদাবাদ। একটা ঝগড়া হইল। কি করি, নহিলে স্থান পাই না। অনেক কষ্টে একটু বসিবার স্থান হইল। গাড়ী ছাড়িল, প্রাণ হাঁফ্ ছাড়িল, বাপ্‌রে বাঁচিলাম। এমন বিপদে কখনও মানুষে পড়ে। আর পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, ভূপেন্দ্র, সত্যেন্দ্র ইত্যাদি কেহ বাকী নাই। ওদিকে ভাগলপুরের দীপনারায়ণ আছেন। ওদিকে লাক্ষ্ণৌএর বৃদ্ধ গঙ্গাপ্রসাদ চলিয়াছেন, ওদিকে পার্সীদের দল চলিয়াছেন, জাহাঙ্গীর পেটিট তাঁহাদের নেতা। পথে নারী বিবর্জ্জিতা, ইহারা মানেন না। ভালমানুষ ডাক্তার ভালচন্দ্রও সপরিবারে যাইতেছেন। চখে চখে হইলে



আর কথা নাই, একটু হাঁসি, একটু নেয়াপাতী গোছ দন্ত বহিষ্করণ ও কেবল মাত্র মুখে উচ্চারণ "রামেশ্বরম্", তারপর সেক্‌হ্যাণ্ড বা বন্দে মাতরম্ অভিবাদন। দুই একজন ফ্রেঞ্চ জানা লোক ছিলেন। আলাপ হইল। তাঁহারা পঁদিচেরী যাইতেছেন। আমাদের কামরার সেন্‌সস্ লইয়া দেখা গেল একজন আছেন টিনীবেলী জেলার। তিনি বি এল পড়িতেছেন, শীঘ্রই উকিল হইবেন। আমরা জানিতাম, কিছু দিন পূর্ব্বে টিনীবেলী জেলায় রাজনৈতিক বড় ঝড় বহিয়া গিয়াছিল এবং চীদাম্বরম্ পীলে প্রভৃতি দুই একটি মহীরুহ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল। আমরা রাজনীতিকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া তখন সঙ্গীতানন্দে মগ্ন হইলাম। ভাবী-উকীল মহাশয়কে আমরা একটি গান গাহিতে বলিলাম। তিনি অনেকটা অনুনয় বিনয় করিয়া লাজ-সৌজন্য দেখাইয়া শেষে গান আরম্ভ করিলেন। এই গান রচিত "তামিল" ভাষায়। মান্দ্রাজ সহরের উত্তরের জেলা গুলিতে যে ভাষা চলিত তাহার নাম 'তেলেগু'। আর দক্ষিণদিকের জেলাগুলিতে যে ভাষা প্রচলিত তাহার নাম তামিল। টিনীবেলী জেলার কাছে ভারতবর্ষের বিস্তার খুব কম। সে জন্য এ উপকূল হইতে ও উপকূল—করমণ্ডল হইতে মালাবার উপকূল যাওয়া কিছু আয়াসসাধ্য ব্যাপার নহে। মালাবার উপকূলের ভাষা—মালয়ালম্। সংস্কৃত ও তামিলের সংমিশ্রণে যে ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার নাম মালয়ালম্। এই ভাষা শুনিতে বড় সুমিষ্ট। আমাদের কানে বেশ লাগে, যেন কোন দেবমন্দিরে স্তব পাঠ হইতেছে। কথায় কথায় ভাসিয়া যাইতেছি। সে যাহাহৌক ভাবী-উকীল মহাশয়ের গলাটি ভাল, আর সুরলয়ও বোধ আছে বলিয়া বোধ হইল—আমাদের বেশ লাগিল। আমরা অনুরোধ করায় তিনি আরও কতকগুলি গান গাহিলেন। আমরা কৌতূহলী হইয়া তামিল ভাষার একটা 'ভকেবুলারি' করিয়া লইলাম। ক্রমে সে বিদ্যার পরিচয় দিব।

কখনও টিনীবেলীর লোকের, কখনও পঁদিচেরীর (পণ্ডিচারী) লোকের সহিত আমাদের আলাপ ও কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। বাহিরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন। দূর হইতে ভেকের গান শুনিয়া আমাদের ঋগ্বেদের 'ভেক স্তোত্র' মনে পড়িয়া গেল। ভেক যে হটযোগী।

গাড়ী আর চলে না। যেখানে সেখানে দাঁড়াইতে লাগিল, আর ক্রমাগত বিলম্ব হইতে লাগিল। আমাদের নিদ্রা হয় না সুতরাং গল্প চলিতে লাগিল। পঁদিচেরীতে মিউনিসিপল নির্ব্বাচন উপস্থিত, আর কাউনসিল নির্ব্বাচনও বটে। বঙ্গদেশের ফরাসীডাঙ্গা হইতে বাবুরা ভোট দিতে পঁদিচেরী আসিয়াছেন শুনিলাম। আরও শুনিলাম, তাঁহাদের সমস্ত খরচা ফরাসী-সরকার বহন করিবেন। যাতায়াত দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া আর প্রতিদিন ১৮৲ টাকা করিয়া খরচা (খোরাকী ও অপরাপর খরচা) প্রত্যেক কাউন-সিলের মেম্বর হইবার পদপ্রার্থীকে ভোটদাতার প্রাপ্য। এই নির্ব্বাচনের ফলে এক ব্যক্তি পারী সহরের পার্লামেণ্ট সভার সভ্য অর্থাৎ ডেপুটী হইবেন। ফরাসিস পার্লামেণ্ট সভার নাম 'চেম্বর অব্ ডেপুটীস্'। আর প্রত্যেক সভ্যের নাম 'ডেপুটী'। যিনি নির্ব্বাচিত হইবেন, তিনি ফরাসি অধিকৃত ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হইবেন। বলাই বাহুল্য, দুই তিন জন প্রার্থী থাকেন, আর সকল ভোটারই খরচা পান। তারপর মিউনিসিপল নির্ব্বাচন উপলক্ষে পঁদিচেরীতে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তাহা শুনিলাম। সে দাঙ্গাটি কতক ইংরেজাধিকারে ও কতক ফরাসি অধিকারে হইয়াছে। এখন কে তার বিচার করিবে তাহারই কথা চলিতেছে।

ক্রমে আমরা একে একে ঘুমাইয়া পড়িলাম। নানা সুরলয়ে নাসিকা ধ্বনি চলিতে লাগিল। ক্রমে নাসিকাধ্বনির ঐক্যতান-বাদন আরম্ভ হইল। আমরা ঐ ঐক্যতান বাদন শুনিতে শুনিতে নিদ্রাদেবীর পদে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

ভোরে নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম—বৃষ্টি পূর্ব্ববৎই পড়িতেছে। গাড়ীখানি মাঠের মাঝে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত বংশীধ্বনি করিতেছে। অনেকক্ষণ পরে আবার গাড়ী ছাড়িল। ক্রমে ফরসা হইয়া গেল। দূরে দূরের দুই একটি মন্দির চূড়া নয়নে পড়িতে লাগিল। বেলা দশটার সময় আমরা তাঞ্জোরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

---

# ভাগীরথী।

ভাগিরথি! তুমি কোথায় চলিয়াছ। তুমি আপন মনেগাহিতে গাহিতে কোথায় চলিয়াছ? তুমি কি এমনি মনভোলান গান গাহিতে গাহিতে নিত্যই যাও। প্রতিদিন কি এইরূপে যাইতেছ? জানি না কোন্ দিনে, কোন শুভদিনে সেই তুষার-ধবলিত-হিমাচল হইতে তোমার জন্ম হইয়াছে! জানি না তুমি কত কাল চলিতেছ, কত দূর হইতে আসিতেছ। তোমার কূলে কত শত নগরের উত্থান পতন দেখিলে, তুমি কিন্তু সেই আপন মনেই চলিয়াছ। তুমি কান্যকুব্জে পৃথ্বীরাজের জয় ভেরি শুনিলে; জয়চন্দ্রের সহিত পৃথ্বীরাজের সমর দেখিলে। তুমি দেখিলে ভারতবাসী কিরূপে ঘরের লক্ষ্মীকে পরের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিল। তুমি কি সেদিনও এইরূপই ধীরে ধীরে চলিয়াছিলে? সেদিন কি তোমার উপরে কোন প্রলয় ঝঞ্ঝার আবেশ হয় নাই? তুমি বারাণসীতে হিন্দুর প্রতাপ দেখিলে, মুসলমানের আধিপত্য দেখিলে, আবার চৈৎসিংহের ভাগ্য বিপর্য্যয় দেখিলে। বারাণসীর সেই মহা শ্মশান কত কাল হইতে তোমার বক্ষে জ্বলিতেছে? যেদিন এই বাঙ্গালাদেশে তোমার ঐ সাধের নবদ্বীপে চৈতন্যদেব জন্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত প্রদেশ প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়াছিলেন সেদিনও কি তুমি এইরূপ ধীরে ধীরে আপন মনে চলিয়াছিলে? সে দিন কি তুমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠ নাই? নিজেকে সার্থক মনে কর নাই? আর একদিন তোমারই তীরে এই বাঙ্গালায় ইংরাজে ও মুসলমানে সমর প্রজ্বলিত করিয়াছিল। যে দিন বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ভারতবাসীকে পরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছিল, সেদিন কি তুমি এইরূপ ধীরে ধীরে বহিয়া চলিয়াছিলে? সেদিন কি তুমি অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যকে বল নাই;——

"কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ!
বারেক ফিরিয়া চাহ ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে, দেব, করিলে গমন,
আসিবে ভারত ভাগ্যে বিষাদ রজনী।"

তুমি ভারতের কত শত বিপ্লব দেখিয়াছ। তোমার তীরে কত দেশ কত নগর শ্মশানে পরিণত হইয়াছে; আবার কত শ্মশানকে নগরে পরিণত হইতে দেখিলে। তোমার তীরে দুই পার্শ্বে কত শ্মশান রহিয়াছে। দেখ দেখ—ঐ চিতা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কে আজ ঐ চিতায় শয়ন করিয়াছে; কে তাহার সমস্ত জীবনের ভার বহিতে অক্ষম হইয়া দুর্গম পথ ভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়া শান্তি ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে; সংসারে যে শান্তি পাইল না, শ্মশানে তাহার শান্তি, তাহার বিশ্রাম, তাহার আনন্দ। এরূপ কত শত চিতা তোমার দুই পার্শ্বে জ্বলিতেছে। এত শ্মশান দেখিয়া কি তোমার বিষাদ আসে না? তোমার তীরে এই বিরাট শ্মশান সাত কোটি নর নারীর আবাস ভূমি বঙ্গদেশ। এখানে ত আশার আহ্বান নাই, আনন্দের আশ্বাস বাণী শুনিতে পাই না, এখানে যে কেবল ক্রন্দন, কেবল বিষাদ, কেবল হাহাকার। তাই কি? এই কি বিষাদ ভূমি? না এখানে সকলই আছে, আশা আছে, ভরসা আছে, সুখ আছে, শান্তি আছে, ভক্তি আছে, ভালবাসা আছে, ধর্ম্ম আছে, কর্ম্ম আছে, বীরত্ব ধীরত্ব আছে, আত্মবিসর্জ্জন আছে, কেবল আমরা মায়া কুহকে আচ্ছন্ন হইয়া কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, শুনিতে পাইতেছি না।

ভাগিরথি! তোমার তীরে বসিয়া আছি। সন্ধ্যার স্নিগ্ধ বায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া আমার শরীর মন শীতল করিতেছে। আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি তুমি ভূমানন্দকে জানিতে পারিয়া আনন্দ সাগরাভিমুখে অবিশ্রান্ত ভাবে চলিয়াছ। তাই তুমি দুঃখে অভিভূত হও না; সেই জন্যই এত রাষ্ট্র বিপ্লব, এত ধর্ম্ম বিপ্লব, তোমার অক্লান্ত গতি রোধ করিতে পারে নাই। আমি বুঝিতে পারিতেছি যে ভারতবর্ষ তোমার ন্যায় ধর্ম্মকে উপলব্ধি করিয়াছে, তাই তাহার উপর যত বিপদই আসুক সে তাহাতে চঞ্চল হইবে না, সে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে না। সেই তুষার ধবল হিমাচলশিরে, তোমার উৎস যেমন চিরদিন উথুলিয়া উঠিতেছে, ও তাহাতে তোমার সুমন্দ স্রোত বাহিত হইতেছে, এই ভারতের মূল প্রস্রবণ ধর্ম্মও সেইরূপ চিরদিন সমানে সুশীতল ধারায়, ভারতে শান্তি বারি বর্ষণ করিতেছে।

কদমতলা চুঁচুড়া। শ্রীঅচ্যুতচন্দ্র সরকার।

# কাব্যে ইতিহাস।*

[ মুসলমান সময়ের বাঙ্গালীর শিক্ষা দীক্ষা, যুদ্ধবিগ্রহ, শান্তি অশান্তি, আচার বিচার, রীতি নীতি, পোষাক পরিচ্ছদ, চাষ বাস, গৃহস্থালী সংসার, আহার ব্যবহার, ধর্ম্ম কর্ম্ম, পূজা পার্ব্বণ, আতিথ্য উৎসব ইত্যাদি এবং ঐ সময়ের রাজ কার্য্য, বিচার কার্য্য, কর সংগ্রহাদি কার্য্য, পুলিস প্রভৃতির কার্য্য ইত্যাদি কি জানা যায় অর্থাৎ সেই সময়ের বাঙ্গালী ও বাঙ্গালার আভ্যন্তরিক ইতিহাস যতদূর সম্ভব কাব্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া বর্ণনা।— ]

## চৈতন্যের যুগ।†

[ পঞ্চদশ—ষোড়শ শতাব্দী। ]

চণ্ডীদাস মানস চক্ষে দেখিয়া গাহিতেছেন, 'এত আমার সে কাঁলাচাঁদ নহে, এযে গৌররূপে জগৎ আলো করিয়াছে;—এমন কোন দেশে হইবে?' —'এমন হ'বে কোন্ দেশে,'—একবার মাত্র বঙ্গদেশে হইয়াছিল, আপনার সমস্ত সুখ আশায় বিসর্জ্জন দিয়া, পরের জন্য অকিঞ্চন বেশে, একবার মাত্র শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইয়াছিলেন;— বঙ্গদেশে। সে প্রেম, সে ভক্তি, সে প্রীতি আর জগৎ কখনও দেখে নাই। যিনি আপনার সারাজীবন পরের জন্য হাসিমুখে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যাঁহার বাক্য একদিন পাষাণ পর্য্যন্ত বিগলিত করিয়াছিল, যাঁহার নামে, যাঁহার প্রেমে, যাঁহার গানে, একদিন বাঙ্গালার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক সুরে ডাক দিত, এক প্রাণে নাচিত, এক সুরে গাহিত; সেই প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে কোটী কোটী প্রণাম করিয়া আমরা আমাদের বিষয়টী আরম্ভ করিলাম।

বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য বাঙ্গালার সমাজের, বাঙ্গালার রাজ্যের প্রতিফলিত চিত্র। এই কাব্যগুলি হইতে আমরা মুসলমান সময়ের সকল ঘটনা, সকল অবস্থাই অবগত হইতে পারি। শাসনাদি সম্বন্ধে আমরা

* চুঁচুড়া হিন্দু সমিতির পঞ্চম বার্ষিক সভায় শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী মিত্র প্রদত্ত ২৫৲ টাকার উপহার প্রাপ্ত।

† কৃত্তিবাস ও চৈতন্যভাগবত।

দেখিতে পাই, বিচারের ভার প্রধানতঃ কাজির উপরেই ছিল, তিনি যাহা করিতেন তাহাই চূড়ান্ত বিবেচিত হইত। কাজির অধীনে 'শিকদার' এবং শিকদারের অধীনে 'দেওয়ান' ছিল। দেওয়ান রাজ্যের অন্যান্য বিষয় দেখিতেন।

আমরা ইতিহাস হইতে জানিতে পারি "হুসেন সাহ" ১৪৯৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় রাজত্ব করেন। তিনি প্রথমতঃ হিন্দুদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছিলেন, হিন্দুর দেবমূর্ত্তি, হিন্দুর দেবালয় সকল ধূলিসাৎ করিয়া আপনার ধর্ম্মের উজ্জ্বল মহিমা প্রকাশ করিয়াছিলেন তথাপি অবশেষে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অসাধারণ প্রেম, অমানুসিক দয়া দেখিয়া তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন; এবং হিন্দুর প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

হিন্দুর নিকট "কাজির বিচার" চিরদিনই আতঙ্ক জন্মাইতেছে। চৈতন্য ভাগবতে আমরা দেখিতে পাই, কাজি হিন্দুয়ানীর উপর খড়্গ-হস্ত হইয়াছিলেন; এবং হিন্দুর উৎসবাদির কথা শুনিলে সত্বর তথায় গমন করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে একান্ত যত্ন করিতেন। হিন্দুর প্রতি কাজির এইরূপ অত্যাচারের কথা চৈতন্যভাগবতের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত জড়াইয়া রহিয়াছে।

যুদ্ধ বিগ্রহ, শান্তি অশান্তি;—

কোন স্থানে যুদ্ধাদি হইলে, সকল স্থানে পথিকদের যাতায়াত করিতে দেওয়া হইত না;—নিষিদ্ধ পথে "ত্রিশূল" পুঁতিয়া পথিকদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইত।* এইরূপ যুদ্ধবিগ্রহের সময় দস্যুতস্করাদির ভয়ে দেশময় আতঙ্ক জন্মিত। কেহ একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে সাহস করিত না। স্থল পথে, জল পথে একই অবস্থা হইত। কোন দিকেই স্বস্তি থাকিত না।

* দুই রাজায় হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ।
মহাদস্যু স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ॥
রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে "জাগু" বলি লয় প্রাণে॥ চৈতন্যভাগবত।



স্থল পথে— "মহাদস্যু স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ।" —এবং
জল পথে,— "এ পানীতে নিরন্তর ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন প্রাণ সব নাশ করে॥" চৈতন্য ভাগবত।

এইরূপ অশান্তি দেশময় বিরাজ করিতেছিল। লোকে ধনজন পরিবার বর্গকে রক্ষা করিবার জন্য সভয়ে চেষ্টা করিতেছিল। বাহিরে এইরূপ বিপদ, আবার আপনার গৃহে, আপনার এলাকার মধ্যেও শান্তি ছিল না; —কাজি প্রত্যহই অতিশয় উপদ্রব করিয়া দেশের লোককে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছিল।

মুসলমান নৃপতির সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি ছিল "বাইশ বাজারে প্রহার" ইহা এতদূর কষ্টকর, যে অমিত বলশালী ব্যক্তিও পাঁচ ছয় বাজারে প্রহৃত হইয়াই প্রাণত্যাগ করিত। যথা:—

"হরিদাসকে,— বাইশ বাজারে মারিলেই যদি জীয়ে।
তবে বলি জ্ঞানী সব সাঁচা কথা কহে॥" চৈতন্যভাগবত।

শিক্ষা দীক্ষা, রীতি নীতি;—

পঞ্চদশ শতাব্দীতে হিন্দুর সমাজে প্রচুর পরিমাণে সহৃদয়তা ছিল। একের বিপদে "পাড়ার দশজন" বুক দিয়া পড়িত; দুঃখে দুঃখ ভোগ করিত; সুখে সুখ অনুভব করিত। বাঙ্গালীর শিক্ষা তখন সমাজে শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কাজির এত অত্যাচারেও সমাজে শান্তি ছিল। আপনার ধর্ম্মে, আপনার সমাজে হিন্দু সন্তুষ্ট ছিল। এই গেল সমাজের একদিকের অবস্থা। অন্যদিকে অনাচার, পাপাচরণ প্রচুর পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইতেছিল। আহার বিহারের তেমন বাঁধাবাঁধি ছিল না। গোমাংস পর্য্যন্ত অনেকে আহারের অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লইতেছিল।* এক কথায় ম্লেচ্ছরাজ্যে সকলই ম্লেচ্ছের মত আচরিত হইতেছিল। ধর্ম্মকর্ম্মে লোকের তেমন আস্থা ছিল না। যেন পাপ বলিয়া একটা কিছু জিনিষ ছিল না। মদ্যপানের আনুসঙ্গিক সকল দোষই—বেশ্যাগমন ইত্যাদি—সমাজের মধ্যে আধিপত্য করিতেছিল। সমাজের এইরূপ অনা-

* ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকাচুরি পরগৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ॥ —চৈঃ ভাঃ ২৪৯

চারের দিনে—এই বিষম দুর্গতির দিনে বৈষ্ণব ধর্ম্ম জাগিয়া উঠিল। সমাজের লোকে মৃদঙ্গ ধ্বনি ও হরিবোলের রোলে অস্থির হইয়া উঠিল। এই যুগে যেমন মৃদঙ্গের ধ্বনি ও হরিবোলের আনন্দরোল একদিকে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া উত্থিত হইতেছিল, অপর দিকে আবার বৈষ্ণব বিদ্বেষী দল বিদ্রূপ করিয়া বেড়াইতে লাগিল ;—

" শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে-পরিহাস।
কেহ বোলে সব পেট ভরিবার আশ॥ —৭৯ চৈঃ ভাঃ
শুনিয়া পাষণ্ডী সব মরয়ে বলগিয়া।
' নিশায় এগুলা খায় মদিরা আনিয়া॥
এগুলা সকল মধুমতী সিদ্ধি জানে।
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনে॥"
কেহ বলে ধান্য যদি কিছু মূল্য চড়ে।
তবে সে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥—২০৯ চৈঃ ভাঃ

আবার বৈষ্ণবগণও ইহাদের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন ;—

" এত পরিহারে যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারি তার মাথার উপরে॥ "

ইত্যাদি বাক্যে শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের বিষয় বেশ জানিতে পারা যায়। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণই বৈষ্ণবদিগের প্রতি অধিকতর অত্যাচার করিতেন ;—তাঁহারা পণ্ডিত হইয়াও মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন নাই। নানা তর্ক বিতর্ক করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এত অত্যাচারেও বৈষ্ণব ধর্ম্ম মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালার অধিকাংশ লোকই তাহাতে দীক্ষিত হইয়া আপনাদের কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিল। তখন হইতেই বৈষ্ণবদের ধারণা, উচ্চ করিয়া কীর্ত্তন করিলে অধিক পুণ্য হয় ;—

" —উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে।
শত গুণ ফল হয় সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে॥ " —চৈঃ ভাঃ

ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই দরিদ্র ছিলেন ; অথচ অনেক মূর্খ ব্যক্তি অতুল ধনরত্ন



ভোগ করিতেছিল। ব্রাহ্মণগণ চিরকালই দরিদ্র, তাই বলিয়া দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। কারণ ব্রাহ্মণের জন্ম পরের শিক্ষার জন্য। ধন রাশির লোভ করিলে তাহা যে একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে।

নেশা ;—

মদ্যপান প্রায় সকলেই করিত ;—এমন কি অনেক সাধু সন্ন্যাসীও মদ্য পান করিতেন। * পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এ সকল ব্যবহারকে যেন লোকে দোষাবহ জ্ঞান করিত না।

বৈষ্ণবদের তৃণ ধারণ ;—

দন্তে তৃণ করে কেহো কেহ নমস্করে।
কেহ বোলে,—" প্রভু! কভু না ছাড়িবা মোরে " —২৭৬ চৈঃ ভাঃ
দন্তে তৃণ ধরি, * ' প্রভু প্রভু ' বলি,
মাগয়ে ভকতি দান।—৩৩১ চৈঃ ভাঃ

মহাপ্রভু চৈতন্য শিক্ষা দিতেন, যে অত্যন্ত পাপাসক্ত হয় তাহারও গতি আছে কিন্তু পর নিন্দুকের গতি নাই ;—

মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোন কালে।
পর চর্চ্চকের গতি কভু নহে ভালে॥ —২৪৯ চৈঃ ভাঃ

গৃহস্থালী সংসার ;—

বধূগণ সর্ব্বদা সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন, কিসে শ্বশুর শ্বাশুড়ী, দেবর ননন্দা, স্বামী প্রভৃতিকে সুখে রাখিবেন ইহাই ছিল তাঁহাদের একান্ত বাসনা। উষাকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই গৃহের বধূগণ করিতেন ;—

" উষঃ কাল হইতে লক্ষ্মী যত গৃহকর্ম্ম।
আপনে করেন, সব এই তাঁর ধর্ম্ম॥ " —১০৩ চৈঃভাঃ

রন্ধন কার্য্য হিন্দুর গৃহের প্রত্যেক স্ত্রীই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। খাবার ও আহারের কথা চৈতন্যভাগবত ইত্যাদিতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি সংখ্যায় অতিশয় অল্প :—

খাবারের মধ্যে—পিঠা পানা ছানাবড়া। —৩৯৯ চৈঃ ভাঃ

---

* মদ্যপ সন্ন্যাসী হেন জানিলেন মনে।—২৯৫ চৈঃ ভাঃ

'মুদ্গ নারিকেল-জল-শস্যের সহিত।' কদলক, চিপীটক, ভর্জ্জিত তণ্ডুল; মুদ্গের বিয়লি। (পৃঃ ২১৬; ৪৪২ চৈঃ ভাঃ)

শাকের নাম অনেক পাওয়া যায়;——

অচ্যুতা নামে শাক; পটোল বাস্তুক-কাল-শাক, সালিঞ্চা-হিলঞ্চা-শাক; —পৃঃ ৪৩৪ চৈঃ ভাঃ।

ধর্ম্মাধর্ম্ম পূজা পার্ব্বণ;——

বৈষ্ণব ধর্ম্মই প্রধান; তদ্ভিন্ন শৈব শাক্ত উভয়ই দুষ্ট হইত। পূজা পার্ব্বণাদির বিষয় অতি অল্পই জানা যায়;—

ধর্ম্মাধর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি।
তাও যে পূজেন সেহো মহাদম্ভ করি॥
ধন রংশ বাড়ুক' করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে॥
যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপালের গীত।
ইহাই শুনিতে সর্ব্ব লোক আনন্দিত॥—৪৪০ চৈঃ ভাঃ

ইহার উপর আবার 'গুড়ন ষষ্ঠীর'* নাম পাওয়া যায়। এই ষষ্ঠী পূজা খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত।

আতিথ্য উৎসব;——

আতিথ্য প্রচুর পরিমাণেই ছিল। মহাপ্রভুর উপদেশ সকলেই পালন করিত।

"গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিক্ষায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম্ম॥
গৃহস্থ হইয়া যদি অতিথি না করে।
পশু পক্ষী হইতেও অধম বলি তারে॥—১০২ চৈঃ ভাঃ

অতিথিকে গৃহস্থ এত ভক্তি করিতেন, যে তিনি যাহা চাহিতেন, গৃহী তাহাই দিতে প্রাণপণ যত্ন করিতেন;— নিত্যানন্দের পিতা হাড়াই পণ্ডিতের

*চৈতন্যভাগবত।



গৃহে একদিন এক সন্ন্যাসী আসিলেন,—পণ্ডিত আতিথ্য করিলেন, শেষে,—

"গন্তকাম সন্ন্যাসী হইলা উষঃকালে।
নিত্যানন্দ-পিতা প্রতি ন্যাসিবর বোলে;—

আমার নিকট ব্রাহ্মণ নাই, তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আমার সঙ্গে কিছু দিনের জন্য দিতে হইবে।*

শুনিয়া ন্যাসীর বাক্য শুদ্ধ বিপ্রবর।
মনে মনে চিন্তে বড় হইয়া কাতর॥
"প্রাণভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী।
না দিলেও 'সর্ব্বনাশ' হয় হেন বাসি॥
সুতরাং ন্যাসীরে দিলেন পুত্র নোয়াইয়া মাথা॥

এ সকল কেবল কল্পিত কাহিনী নহে। ইহা বাস্তব ঘটনা।

উৎসব-গৃহে আলিপনা কাটা হইত; বড় বড় কলাগাছ চারিদিকে পোঁতা হইত, এবং বড় বড় চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া বিবাহ মণ্ডপ বা উৎসবস্থান সজ্জিত করা হইত:— বড় বড় চন্দ্রাতপ সব টাঙ্গাইয়া।
চতুর্দ্দিকে রুইলেন কদলী আনিয়া॥
সর্ব্বভূমি করিলেন আলিপনাময়॥—১১১ চৈঃ ভাঃ

এই বর্ণনা সাধারণতঃ বিবাহের সময়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বিবাহের অধিবাস কালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পান খাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইতেন:—

"অধিবাসে গুয়া আসি খাইবা বিকালে"॥ ১১১ চৈঃ ভাঃ

বিবাহের নান্দিমুখ লোকাচার প্রভৃতি সকলই সম্পন্ন হইত। চৈতন্যভাগবতে এক লোকাচার বলিয়া 'স্ত্রীআচার,' 'জলসহা' ইত্যাদি বলা হইয়াছে;—

ষষ্ঠী পূজি তবে বন্ধু মন্দিরে মন্দিরে।
লোকাচার করিয়া আইলা নিজ ঘরে॥

বৈষ্ণবদের উৎসব এক মহা সমারোহ ব্যাপার বলিয়া মনে হয়;—

"কেহো বান্ধে পতাকা, চান্দোয়া কেহো টানি।
কেহো বা ভাণ্ডারী কেহ দ্রব্য দেয় আনি॥
সঙ্কীর্ত্তন, শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল।
সঙ্কীর্ত্তন সঙ্গে ধ্বনি বাজয়ে বিশাল॥—৪৪৩ চৈঃ ভাঃ

এবং এইরূপ উৎসবে চন্দন ও মালার ছড়াছড়ি হইত ;—খাওয়া দাওয়া প্রচুর পরিমাণে সম্পন্ন হইয়া, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া উৎসব শেষ হইত। এইরূপ উৎসবে গৃহে গৃহে প্রদীপ জ্বলিত ;—

আনন্দে দেউটী বান্ধে প্রতি ঘরে ঘরে ॥—৩২৪ চৈঃ ভাঃ।

পোষাক পরিচ্ছদ ;—

বৈষ্ণবের,— কৌপীন, বহির্ব্বাস, ত্রিকচ্ছবসন।

দ্বারবানের,— মহাপাগ শোভে শিরে ধটি পরিধান।
দণ্ড হস্তে সভারে করয়ে সাবধান ॥

বস্ত্রাদির মধ্যে দেখিতে পাই ;—

পট্টনেত, শুক্ল নীল সুপীত বসন, পাটশাড়ী কাঁচুলী, পাটের পাছড়া।

গহনার মধ্যে,—কণ্ঠে হার, গুঞ্জামালা, (মণিমুপ্রবাল মুক্তাহার—পৃঃ ৪৫৮ চৈঃ ভাঃ) নাসায় গজমতি ;—হস্তে শঙ্খ, অঙ্গদ, বলয়, কঙ্কন ;—কর্ণে কুণ্ডল, মুক্তাকসা সুবর্ণ ;—জঠরপাটে বেত্র, বংশী ছরিকা ;—অঙ্গুলীতে "রত্নেখিচন-সুবর্ণ মুদ্রিকা," চরণে রঞ্জন নূপুর ও তদুপরি মল্ল।—(৪৫৮ পৃঃ, চৈতন্যভাগবত।)

এতদ্ভিন্ন সুবর্ণরজতমরকত ; শিঙ্গা, ছাঁদভোরী প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়, কিন্তু কোন অঙ্গে পরিধান করা হইত জানা যায় না। —৪৫৮পৃঃ— চৈতন্যভাগবত।

ক্রমশঃ

শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

# ভারতে শিষ্টাচার।

বিদ্যা, বয়স অথবা সম্পর্কে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগের প্রতি সমুচিত ভক্তি ও গৌরব প্রদর্শন করা ; বিশিষ্টবিত্ত এবং পদমর্য্যাদাসম্পন্ন লোকদিগের যথাযোগ্য সম্মান করা ; আপনার সমান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের প্রতি সখ্যভাব ও সমাদর সূচক ব্যবহার করা ; বিদ্যা, বিত্ত ও বয়সে যাঁহারা আপন অপেক্ষা ন্যূন তাঁহাদিগের প্রতি মিষ্টবাক্য প্রয়োগ ও সস্নেহ ব্যবহার করাকে শিষ্টাচার বলা যায়। শিষ্টাচারপরায়ণ লোকদিগের প্রতি সকলে অনুরক্ত এবং অশিষ্টের প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকে। পাছে যথোচিত আদর ও সম্মান না পাইয়া কিংবা দুই চারিটা কর্কশ বাক্য শুনিয়া অবমানিত এবং দুঃখিত হইতে হয় এজন্য শিষ্টাচারহীন লোকের নিকট কেহ সহজে যাইতে চাহে না।

যে সকল ব্যক্তি ভক্তি, গৌরব এবং সম্মানের পাত্র তাঁহাদিগের প্রতি যুবকগণের যে প্রকার আচরণ করা উচিত, তাহা মনুসংহিতায় বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে, এজন্য মনু প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্রই প্রস্তাবিত বিষয়ে আমার প্রধান অবলম্বন। মনু বলিয়াছেন, —

"লৌকিকং বৈদিকংবাপি তথাধ্যাত্মিকমেবচ।
আদদীত যতোজ্ঞানং তং পূর্ব্বমভিবাদয়েৎ ॥"

"অনেক পূজনীয় ব্যক্তি একস্থানে বিদ্যমান থাকিলে যাঁহার নিকট লৌকিক, বৈদিক কিংবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করা যায় তাঁহাকে অগ্রে অভিবাদন করিতে হয়"। শিক্ষক মাত্রেই পূজনীয়, তন্মধ্যে সরহস্য বেদার্থ জ্ঞানদাতা অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞানদাতা সমধিক ভক্তি ও গৌরবের আস্পদ।

"উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্মজন্মহি বিপ্রস্য প্রেত্যচেহচ শাশ্বতং ॥"

"জনক এবং সমগ্র বেদার্থের উপদেষ্টা আচার্য্য উভয়েই পিতৃপদবাচ্য, এই উভয়ের মধ্যে আচার্য্য পিতাই বিপ্রদিগের পক্ষে গুরুতর যে হেতু আচার্য্য পিতা হইতে যে জন্ম তাহা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল দ্বারা ইহলোক এবং পরলোকে নিত্য হয়।"

মনু অন্যত্র বলিয়াছেন, আচার্য্য অপেক্ষা পিতার এবং তাঁহা অপেক্ষা মাতার গৌরব অধিক।

'উপাধ্যায়ান দশাচার্য্যো আচার্য্যাণাং শতং পিতা।
সহস্রন্তু পিতৃন্ মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে॥'

'আচার্য্য উপাধ্যায় অপেক্ষা দশ গুণ অধিক গৌরবান্বিত, পিতা আচার্য্য অপেক্ষা শতগুণ মাননীয় এবং মাতা পিতা অপেক্ষা সহস্রগুণ মাননীয়া।' আবার রামায়ণে কৌশল্যা শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন 'আমি তোমার গুরু, তোমাকে আদেশ করিতেছি বনে যাইও না অযোধ্যাতেই থাক' তদুত্তরে শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছিলেন 'আপনি আমার গুরু, কিন্তু পিতা আপনারও গুরু ও আমাদের উভয়েরই মান্য এবং উভয়েরই তাঁহার আজ্ঞা পালন ও সত্য রক্ষা জন্য যত্ন করা উচিত।' ফলতঃ ব্রহ্মচারী, আচার্য্যকে ব্রহ্মের মূর্ত্তি স্বরূপ জ্ঞান করিয়া ভক্তি ও শুশ্রূষা করিবেন ইহাই অভিপ্রেত। গৃহস্থের পক্ষে মাতা পিতা ও আচার্য্য তিনই সমান মান্য; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও পিতৃবৎ মাননীয়।

'আচার্য্যশ্চ পিতাচৈব মাতা ভ্রাতাচ পূর্ব্বজঃ।
নার্ত্তেনাপ্যবমন্তব্যো ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ॥'

'আচার্য্য, পিতা, মাতা এবং জ্যেষ্ঠ সহোদরকে পীড়িত হইলেও মনুষ্য বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কখন অবমাননা করিবেন না'।

পূর্ব্বোক্ত গুরুজনত্রয়ের পর বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃব্য মাতুল শ্বশুর প্রভৃতিকে প্রত্যুত্থান ও পাদ গ্রহণ পূর্ব্বক অভিবাদন করিতে হয়। কিন্তু ঐ সকল সম্বন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তিরা অভিবাদক অপেক্ষা অল্পবয়স্ক হইলে তাঁহাদিগকে প্রত্যুত্থানাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করিবে, পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিতে হয় না।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক লোকের বিশ্বাস থাকিতে পারে যে পূরাকালে এ দেশে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করা হইত না, ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। স্ত্রীলোকদিগের কি প্রকার সমাদর করিতে হয় তাহাও মনু উপদেশ দিয়াছেন।

'পর পত্নীচযাস্ত্রীস্যাদসম্বন্ধাচ যোনিতঃ।
তাং ব্রূয়াদ্ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতিচ॥'



'পরপত্নী অথবা যে নারী মাতৃপিতৃবংশীয়া নহেন তাঁহাদিগকে ভবতি! সুভগে, ভগিনি! বলিয়া সম্বোধন করিবে।'

যে সকল স্ত্রীলোক সম্বন্ধে গুরুতর তাঁহাদিগের প্রতি মনু সমধিক সম্মান প্রদর্শনের বিধি দিয়াছেন।

'মাতৃষসা মাতুলানী শ্বশ্রূরথ পিতৃষসা।
সংপূজ্যা গুরুপত্নীবৎ সমাস্তাগুরুভার্য্যয়া॥'

মাতৃষসা, মাতুলানী, শ্বশ্রূ এবং পিতৃষসা ইহারা গুরু পত্নীসমা এবং গুরুপত্নী তুল্য পূজনীয়া অর্থাৎ সমাগত হইলে ইঁহাদিগের পাদ গ্রহণ পূর্ব্বক অভিবাদন করা উচিত।'

'ভ্রাতুর্ভার্য্যোপসংগৃহ্যা সবর্ণাহন্যহন্যপি।
বিপ্রোষ্যতূপসংগৃহ্যাজ্ঞাতি সম্বন্ধিযোষিতঃ॥'

'জ্যেষ্ঠ সহোদরের সবর্ণাপত্নী অভিবাদকের বয়োজ্যেষ্ঠা হইলে প্রত্যহ চরণ স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিবে। জ্ঞাতি ও অন্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট স্ত্রীলোক দিগকে প্রবাস হইতে সমাগত হইয়া পাদ গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিবে।'

'পিতুর্ভগিন্যাং মাতুশ্চ জ্যায়স্যাঞ্চ স্বসর্য্যপি।
মাতৃবদ্বৃত্তিমাতিষ্ঠেৎ মাতা তাভ্যো গরীয়সী॥'

পিতৃভগিনী মাতৃভগিনী ও জ্যেষ্ঠ সহোদরার প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করিবে এবং মাতাকে ইঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতরা জানিবে।

মনু আত্মীয় স্ত্রীলোক মাত্রের সমাদর করার বিশেষ ফলশ্রুতি এবং না করার দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

'পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতা পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষযিতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥
যত্রনার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তেতত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি জাময়োযত্র বিনশ্যত্যাশুতৎকুলং।
ন শোচন্তিতু যত্রৈতাবর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা'॥

'বহুকল্যাণার্থী পিতা ভ্রাতা, পতি ও দেবর প্রভৃতি সকল সময়ে স্ত্রীলোক-দিগকে ভোজন ও বসন ভূষণাদি দ্বারা সমাদর করিবেন। যে কুলে স্ত্রীগণ

পূজিত হন সেখানে দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া বিরাজ করেন, আর যে কুলে তাঁহাদিগের অনাদর হয় সে বংশে সমস্ত ক্রিয়া নিষ্ফল হয়। যে কুলে স্ত্রীগণ দুঃখিনী থাকেন, সে কুল শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যেখানে তাঁহারা আহ্লাদিতা থাকেন সে কুল সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়'।

মনু সাধারণতঃ মান্যত্বের কারণ পাঁচটী নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

'বিত্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম্মবিদ্যাভবতি পঞ্চমী।
এতানিমান্যস্থানানি গরীয়োযদ্যদুত্তরং॥'

বিত্ত অর্থাৎ ন্যায়ার্জ্জিত ধন, বন্ধু অর্থাৎ পিতৃব্যাদি সম্বন্ধ, কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং বিদ্যা এই পাঁচটী সম্মানের কারণ ইঁহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটী অপেক্ষা পর পরটী অধিক সম্মানের কারণ। এইটী সম্মান প্রদর্শন বিষয়ে সাধারণ সূত্র। সর্ব্ব দেশেই ইহা একরূপ প্রচলিত আছে। সকল দেশে বিত্তশালী লোকের অধিক বা অল্প সমাদর হইয়া থাকে। এ দেশ অপেক্ষা অন্যান্য দেশে ধন সমৃদ্ধিশালী লোকের সম্মান কিছু অধিক। মনু ধন সম্পত্তি মান্যত্বের সর্ব্বনিম্ন কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; বিত্তশালী লোক অপেক্ষা পিতৃব্য মাতুল শ্বশুর প্রভৃতি সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তি অধিক সম্মানের পাত্র। ঐ সকল স্বসম্বন্ধীয় ব্যক্তির বয়স অল্প হইলে তাঁহাদিগের অপেক্ষা অধিক বয়স্কের সম্মান অধিক। বয়োবৃদ্ধের সম্মান সর্ব্বদেশে আছে। Gray hairs should be respected, 'ধবল কেশ সম্মানের আস্পদ' ইহা ইংরাজিতে একটী প্রচলিত কথা। আমাদের দেশে পুরাকালে যুবকগণ বৃদ্ধের কি প্রকার সমাদর করিতেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে।

উদ্ধং প্রাণাহ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আয়তি।
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে'॥

'বৃদ্ধ ব্যক্তি সমাগত হইলে যুবকের প্রাণ যেন আহ্লাদে দেহ হইতে বাহিরে যাইবার জন্য ইচ্ছা করে এবং উপস্থিত বৃদ্ধকে প্রত্যুত্থান অভিবাদনাদি দ্বারা সম্মান করিলে তাঁহার প্রাণ পুনর্ব্বার সুস্থ হয়।

'অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি সংবর্দ্ধন্তে আয়ুর্ব্বিদ্যা যশোবলং॥'



যে যুবা বৃদ্ধ সমাগত হইলে তাঁহাকে প্রণাম করেন এবং সর্ব্বদা বৃদ্ধ জনের সেবা করেন, তাঁহার আয়ু, বিদ্যা, যশ এবং বল এই চারিটী পরিবর্দ্ধিত হয়।

উপরি উক্ত শ্লোক দুইটীর মধ্যে প্রথমটীতে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধি অথবা অকর্ত্তব্য কর্ম্মের নিষেধের কথা বলা হয় নাই। পূর্ব্বকালে যুবকগণ বৃদ্ধের প্রতি গৌরব প্রদর্শন বিষয়ে কিরূপ অসাধারণ ব্যগ্রতা ও আগ্রহ প্রকাশ করিতেন তাহাই কিঞ্চিৎ কবিত্ব সহকারে বর্ণন করা হইয়াছে। দ্বিতীয়টীতে বৃদ্ধ সেবার ফলশ্রুতি বর্ণিত হইয়াছে।

বয়স অপেক্ষা কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্মানের উচ্চতর কারণ অন্য দেশ অপেক্ষা ভারতে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির সম্মান ও সমাদর অধিক।

পূর্ব্বোক্ত সাধারণ সূত্রে সম্মান ও গৌরবের সর্ব্বোচ্চ কারণ বিদ্যা বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। কিন্তু স্থানান্তরে মনু বলিয়াছেন, 'কোন দ্বিজ কেবল গায়ত্রী মাত্র পরিজ্ঞাত হইয়া বিধি নিষেধ বিষয়ে বিশেষ সাবধান এবং সর্ব্বথা সুনিয়ন্ত্রিত হইলে যেমন মাননীয়, ত্রিবেদজ্ঞ হইয়াও শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধের অবাধ্য হইলে তাদৃশ মাননীয় নহেন।' ভারতে ধর্ম্মহীন বিদ্বানের সমাদর হইত না। ধর্ম্মশীল বিদ্বানের সম্মান ও গৌরব সকলের উপর। ধর্ম্মই এদেশের সার সর্ব্বস্ব এবং ধর্ম্মই সকল কার্য্যের চরম লক্ষ্য ছিল। ধর্ম্মের প্রধান সাধন বলিয়াই ভারতবাসী শরীরের স্বাস্থ্য ও বল বীর্য্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন; ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান হইবে বলিয়াই বিদ্যোপার্জ্জনের জন্য যত্ন করিতেন; ধর্ম্মানুষ্ঠানের সুবিধা হইবে বলিয়াই অর্থোপার্জ্জনে আয়াস করিতেন। শত শত গুণ থাকিলেও ধর্ম্মহীনজনের ভারতে আদর হইত না। এখনও এক জন শাস্ত্রজ্ঞ ইষ্টনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং প্রচুর বিত্তশালী ব্যক্তি কোন প্রাচীন হিন্দুর নিকট সমাগত হইলে ঐ নির্ধন পাদুকাহীন ব্রাহ্মণের গৌরব অধিক হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ বিদ্বান ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের সম্মান করা হইত। ক্রমে উহা বংশ মর্য্যাদায় পরিণত হইয়াছিল। মনু বলিয়াছেন 'দশ বর্ষ বয়স্ক ব্রাহ্মণ শত বর্ষীয় ক্ষত্রিয়ের নিকট পিতৃতুল্য।' পুরাণ ইতিহাসেও ব্রাহ্মণগণের সমধিক সম্মানের বর্ণনা দেখা যায়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে ব্রাহ্মণদিগের পরিচর্য্যার ভার

নিজ হস্তে রাখিয়া তাঁহাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু মনু ব্রাহ্মণদিগকে সম্মানের আকাঙ্ক্ষা করিতে এবং তাহাতে প্রীত হইতে নিষেধ করিয়াছেন।'

'সম্মানাদ্ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেবচাকাঙ্ক্ষে দবমানস্য সর্ব্বদা॥'

'ব্রাহ্মণ সম্মানকে বিষবৎ জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রীত হইবেন না। অমৃত তুল্য জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা অবমাননার আকাঙ্ক্ষা করিবেন।, মানাপমান সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা এবং ক্ষমাই ব্রাহ্মণের সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ।

বিশ্বামিত্র তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়া বশিষ্ঠের নিকট গিয়া নমস্কার করিলেন। তিনি জয় হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিলেন, আপনি আমাকে ব্রাহ্মণ করিলেন কিন্তু বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতি নমস্কার করিলেন না। ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি তপোবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছ, বশিষ্ঠ অবশ্য মানিবেন; বিশ্বামিত্র পুনর্ব্বার গিয়া নমস্কার করিলেন, এবারও সেই জয় হউক আশীর্ব্বাদটী পাইলেন। আবার ব্রহ্মার নিকট গেলে তিনি বলিলেন, যদি এবার প্রতিনমস্কার না করেন তাহা হইলে বশিষ্ঠের মস্তকে বজ্রাঘাত হইবে। এইবার বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকটবর্ত্তী হইবার সময় ভাবিলেন যদি পূর্ব্ববৎ আচরণ করেন তবে ত বজ্রাঘাতে ব্রহ্মহত্যা হইবে এই মনে করিয়া ফিরিলেন; তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ "ভো ব্রাহ্মণ! আসুন আসুন নমস্কার" বলিয়া আহ্বান করিলেন। বিশ্বামিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, দুইবার আপনাকে আমি নমস্কার করিলাম তখন প্রতিনমস্কার করিলেন না এখন ডাকিয়া নমস্কার করিতেছেন ইহার কারণ কি? তদুত্তরে বশিষ্ঠ বলিলেন ব্রাহ্মণোচিত প্রধান গুণ ক্ষমা আপনার এখন হইয়াছে, এখন আপনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তাই আপনাকে আহ্বান করিয়া নমস্কার করিতেছি।

হে ব্রাহ্মণগণ! আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা বিদ্যা, ধর্ম্ম, আত্মসংযম, এবং ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণের জন্য সকলের নিকট সম্মান পাইয়া আসিতেছিলেন। আমাদিগের এখন সেই সকল গুণ নাই, তথাপি সেই মহানুভবদিগের বংশীয় বলিয়া প্রণামাদি পাইতেছি। এক্ষণে যদি কেহ সম্মান না করেন



তাহাতে দুঃখিত বা রুষ্ট হওয়া উচিত নহে, বরং মনুর উপদেশ অনুসারে সম্মানের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করাই ভাল।

পুরাকালে হিন্দুগণ রাজার প্রতি কিরূপ গৌরব প্রদর্শন করিতেন তদ্বিষয়ে মনুসংহিতার বহু শ্লোকের মধ্যে একটী মাত্র উদ্ধৃত করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

"বালোঽপিনাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতিভূমিপঃ।
মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেন তিষ্ঠতি॥"

"রাজা বালক হইলেও তাঁহাকে মনুষ্য জ্ঞান করিয়া অবমাননা করিবে না তিনি মহান্ দেব নররূপে ভূলোকে বিরাজ করেন"। রাজাকে পূর্ব্বে মনুষ্য জ্ঞান করাই তাঁহার অপমান করার ন্যায় বিবেচিত হইত।

পিতা মাতা আচার্য্য এবং রাজার সম্মান দেবতার শ্রেণীর অন্তর্গত। রাজাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় মনে করিয়া সমুচিত সম্মান ও গৌরব প্রদর্শন করিবার বিধি আছে। কিন্তু রাজা যথাবিধি প্রজা পালন বিষয়ে অমনোযোগী হইলে অথবা কোন অনুচিত কার্য্য করিলে প্রধান প্রধান প্রজাগণ রাজসমীপে যাইয়া আবেদন ও প্রতিবাদ করিতেন, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজাও তত্তৎ স্থলে আপন কার্য্য সংশোধন করিয়াছেন অথবা প্রজাদিগকে আপনার কার্য্যের ঔচিত্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রজাগণ কখনই রাজার অসম্মান, অনাদর বা বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। তাদৃশ কার্য্য দেবহেলনের ন্যায় গণ্য ছিল।

রাজার অধিকৃত পুরুষ অর্থাৎ রাজকর্ম্মচারিদিগকে বিশেষ সম্মান করা উচিত, কারণ রাজার আজ্ঞায় তাঁহারা রাজার প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করেন; তাহা না মনে করিলেও পূর্ব্বোক্ত সম্মানের সাধারণ সূত্রানুসারে তাঁহাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, বিজ্ঞতা ও বয়স প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া সমুচিত সম্মান করা বিহিত।

এ পর্য্যন্ত মনুসংহিতা অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে পুরাকালে কিরূপ শিষ্টাচার প্রণালী প্রচলিত ছিল তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেই শিষ্টাচারের অনেক ব্যতিক্রম হইয়াছে। ভারতীয়

বালক ও যুবকগণ স্বভাবতঃ নম্র ও শান্ত প্রকৃতি, তথাপি পূর্ব্বতন শিষ্টাচার পদ্ধতির যে কিছু কিছু অন্যথাভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে তাহাদিগের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। পিতা মাতা অথবা আত্মীয় স্বজন বাল্যকাল হইতে প্রাচীন আচার ব্যবহারের শিক্ষা দিলে পুরুষানুক্রমিক সদাচার অক্ষুণ্ণ থাকিত। মৌখিক উপদেশ বা যুক্তি প্রদর্শনের কোন প্রয়োজন হয় না। সন্তানদিগকে শিশুকাল হইতে গুরুজন ও বৃদ্ধদিগের প্রতি ভক্তি ও সম্মান করিতে শিক্ষা দিলে, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস বশতঃ প্রণামাদি শিষ্টাচার স্বাভাবিক কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া যায়। সন্তানগণ যৌবন প্রাপ্ত হইলে নূতন আচার ব্যবহারের আদেশ বা উপদেশ তত ফলোপধায়ক হয় না। তখন যদি শিক্ষক বা কোন অভিভাবক বলেন প্রত্যহ বয়োবৃদ্ধ গুরুজনদিগকে পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে, ঐরূপ শিক্ষা দিলে হয় ত আশৈশব অনভ্যস্ত নূতন কার্য্য করিতে যুবকগণের এক প্রকার লজ্জা লজ্জা, বাধ বাধ বোধ হওয়ায় তাহারা ইচ্ছাসত্ত্বেও তাদৃশ শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বিরত হয়। অথবা শিক্ষক ও অভিভাবকের উপদেশের প্রতিবাদ করিয়া বলিতে পারে গুরুজনের প্রতি মনে ভক্তি ও তাঁহাদিগের আদেশ প্রতিপালন করিলেই ত যথেষ্ট সম্মান করা হইল। মাটীতে পড়িয়া প্রণাম না করিলে কি হয় না? যুবকগণ অভিভাবকের আদেশ বলিয়া অনিচ্ছাপূর্ব্বক গুরুজনদিগকে অভিবাদন করিলে তাহা অভিবাদ্য ও অভিবাদক কাহারও মনোরম ও প্রীতিপ্রদ হয় না। তাদৃশ প্রণামাদি করা ও না করা প্রায় সমান। সরল ও অকৃত্রিম আচরণই আহ্লাদকর হইয়া থাকে।

৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে দুই একটী পরিবারের মধ্যে যে প্রকার শিষ্টাচার দেখিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে এখনও আনন্দের উদয় হয়। তন্মধ্যে একটীর অন্তর্গত দুইজনের আচরণের কিঞ্চিৎ এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি আমাদিগের পূজ্যপাদ অধ্যাপক ৺ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাসাবাড়ীতে দুই ভ্রাতা কয়টী পুত্র ও ভ্রাতৃ পুত্র এবং অন্য ছাত্র কয়েকজন থাকিয়া অধ্যয়নাদি করিতেন। তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহাদিগের শাস্ত্রানুযায়ী ধর্ম্মানুষ্ঠান ও আচার ব্যবহার শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। কাহারও সদাচারের ত্রুটি দেখিলে তিরস্কার করিতেন। কিন্তু



সৌম্যমূর্ত্তি মধুরভাষী গুরুদেবের তিরস্কার কাহার নিকট কর্কশ বোধ হইত না। কখনও ২।৪ দিন অধ্যাপক মহাশয়ের শরীর অসুস্থ হইলে তাঁহার ভ্রাতা রামময় চট্টোপাধ্যায় অথবা রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতেন। তাঁহাদিগকে আমরা খুড়া মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করিতাম, তাঁহারাও আমাদিগের প্রতি এক গুরুর ছাত্র বোধে সখ্যভাব মিশ্রিত এক প্রকার বাৎসল্য ভাব প্রদর্শন করিতেন। খুড়া মহাশয়েরা সমবেত ছাত্রদিগের নিকট আসিয়া একখানি টুল আনাইয়া তাহাতে উপবেশন করিতেন, কদাচ গুরুর আসনে বসিতেন না। তাঁহাদিগের অকপট গুরুভক্তি সূচক নম্র ব্যবহার দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিতাম। "গুরুজন যে শয্যায় নিত্য শয়ন করেন বা যে আসনে নিত্য উপবেশন করেন তাহাতে শয়ন বা উপবেশন করিতে নাই" মনুর এই নিষেধের বিষয় ভাবিয়াই তাঁহারা পৃথক আসনে বসিতেন, কাহাকে দেখাইবার জন্য নহে। ঐ প্রকার আচরণ বাল্যকাল হইতে তাঁহাদিগের অভ্যস্ত ছিল বলিয়াই করিতেন। আমাদিগের অন্যতম পূজনীয় অধ্যাপকের এক প্রিয় ছাত্র ২।৪ দিনের জন্য স্বীয় অধ্যাপকের প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতে আসিয়া গুরুর আসনেই উপবেশন করিয়া অধ্যাপনা করিতেন। তিনি যে পূর্ব্বোক্ত মনুর নিষেধের কথা জানিতেন না তাহা নহে, তিনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কেবল বাল্যকাল হইতে অভ্যাস না থাকায় সে বিষয়ে অবধান করিতেন না।

সাধারণতঃ শিষ্টাচার বিষয়ে অধিক শিক্ষা কিংবা উপদেশ দিবার আবশ্যকতা কিছু নাই, কার্য্য অথবা বাক্য দ্বারা গর্ব্ব, অহঙ্কার কিংবা রুক্ষভাব প্রকাশ না পায় এরূপ সাবধান হইয়া চলিলেই লোকে শিষ্ট মনে করে। গুরুজনদিগের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে হয়, অন্য মাননীয় ব্যক্তিদিগকে করশিরঃসযোগে নমস্কার করিতে হয়, ব্যক্তি বিশেষকে মিষ্টবাক্যে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কাহাকে বা ঈষৎ হাস্য ও শিরঃকম্পনাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিতে হয়, তাহা হইলেই শিষ্টতা প্রদর্শিত হয়। তবে যে মনুর কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পুরাতন শিষ্টাচার প্রণালী বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইলাম, তাহার কারণ পাছে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে Good morning, Good evening, Beg your pardon, Thank you প্রভৃতি

কথাগুলির তর্জ্জমা করিয়া অভিনব ধরণের শিষ্টাচার আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই জন্য পূর্ব্বতন পদ্ধতির আলোচনা করা ভাল মনে করিয়াই করিলাম।

পরন্তু যথোচিত বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করাই শিষ্টাচারের উদ্দেশ্য। কিন্তু স্থল বিশেষে সেই নম্রতা অতি মাত্র হইলে নিজের ক্ষুদ্রতা বা নীচাশয়তা প্রকাশ পাইতে পারে, সে বিষয়ে একটু সাবধান হওয়া উচিত। দম্ভ, অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া অশিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হওয়া যেমন দোষাবহ, অত্যন্ত বেশী নম্রতা দেখাইয়া নীচাশয় বলিয়া পরিচিত হওয়াও তেমনই নিন্দনীয়। বৃদ্ধ গুরুজনদিগের সম্বন্ধে সে প্রকার সতর্কতার আবশ্যকতা নাই, তাঁহাদিগের সমাদর ও সম্মান যত অধিক হইবে ততই ভাল।

শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

# নির্ব্বাসিতা।

মধুর প্রভাত, সুনীল গগণে
জ্বলিছে তপন লোহিত বরণ
প্রভাত সমীর বহিছে শীতল,
করিছে বিহগ প্রভাত কূজন॥

ধরণীর কোলে শ্যাম দূর্ব্বাদলে
দুলিছে শিশির মুকুতা বিমল।
অদূরে তটিনী বহিছে হরষে
দুকূল উপজি' হীরক তরল॥

আশে পাশে বন—হিংস্রক শ্বাপদ
সরীসৃপ সেথা করিতেছে বাস।
বিপদ যেথায় সহস্র মূরতি
বিরাজে সতত মানব সন্ত্রাস॥

বাল্মীকি-আশ্রম নাতিদূরে স্থিত;
পোতভাগে তার এই বনস্থলী,
স্বল্প পরিসর তরু লতাময়;
নিস্তব্ধ এখন এখানে সকলি॥

সহসা ভাঙ্গিয়া নীরবতা সেই
কাঁপাইয়া বন উঠিল বিলাপ।
চমকিল পশু, চমকিল পাখী;
সকলের মনে জাগিল সন্তাপ॥

দেখিতে দেখিতে উন্মাদিনী সম
বেগে বনভূমে হইল প্রকাশ॥
বিজলী বরণা আকুলা রমণী
শিথিল-বসনা মুক্ত কেশপাশ॥



লক্ষ্য বন পথে শ্রীকর প্রসারি'
কহিতে লাগিল বামা সরোদনে—
দুরু দুরু বক্ষ উঠিল পড়িল
নাসায় নিশ্বাস বহিল সঘনে॥
"কোথায় পলাও দেবর লক্ষ্মণ
অসহায়া মোরে ফেলিয়ে বিজনে।
নাহি বিবেচনা 'কোথা রব আমি;
কোথা পাব হেথা আত্মীয় স্বজন'॥
রামের বনিতা——রক্ষণের ভার
দিয়াছেন রাম জানি, তব করে।
ঘোর বনমাঝে ত্যজি তবে মোরে
কেমনে ফিরিছ অযোধ্যানগরে॥
রামের আদেশ ছিল তব প্রতি—
পে'লে যে আদেশ আমার আবাসে।
'মুনির আশ্রমে রাখিতে আমারে
তীর্থ স্নান হেতু মুনিকন্যা পাশে'
একি ব্যবহার দেখি তবে আজ
দেবর সুধীর ধার্ম্মিক সুমতি?
করিছ বর্জ্জন এরূপে আমারে
ভুলেছ কি, রথী, রঘুকুল রীতি (?)॥
আশ্রিত-রক্ষণ ক্ষাত্রধর্ম্মসার,
আশ্রিতা তোমার আমি রামাদেশে।
হায়! তবে গেলে কোন প্রাণে করি'
রাণী কাঙ্গালিনী এই বন দেশে॥
মৃত্যু অনাহারে হিংস্র পশু করে
সর্পমুখে কিম্বা আতঙ্কে হুতাসে
অনিবার্য্য হেথা; তাই ভাবি মনে,
রে লক্ষ্মণ, একি করিলিরে শেষে!

না হয় বা হ'ল—'মোর মৃত্যু তরে
নহ তুমি দুঃখী ঊর্ম্মিলাবিনোদ'।
'গর্ভে মোর আছে রামের সন্তান'
এ কথা তোমার হ'লো নাকি বোধ॥
রঘুবংশধর গরভে জীবিত;
কেমনে করিবে তার সর্ব্বনাশ(?)।
বনবাসে মৃত্যু ঘটিবে নিশ্চয়;
আমার মৃত্যুতে তার প্রাণনাশ"
ছিন্ন চিন্তাসূত্র——নিরবিলা সতী;
শ্রমজলবিন্দু দেখা দিল ভালে।
নয়নের ধারা কপোল বহিয়ে,
নামিয়ে আসিল ক্রমে বক্ষঃস্থলে॥
ক্ষণপরে তবে মুছিয়া নয়ন,
নতমুখে চিন্তা করিয়া আবার।
আপনা আপনি কহিতে লাগিল
সীতা দেবী ধীরে গম্ভীর আকার॥
"মনে পড়ে আজ পঞ্চবটী বনে
যেরূপে লক্ষ্মণ রক্ষিত আমায়।
যেরূপ যতনে সতত সেবিত;
যেরূপ তুষিত কথায় কথায়॥
সে স্নেহ মমতা কোথা তবে আজ
ভুলিল লক্ষ্মণ সে সব কি তবে?
না—না—না—কি যেন শুনিনু
কি যেন বলিল ছেড়ে গেল যবে॥
বলে গেল বটে অনিচ্ছায় তার
রামের আদেশে বর্জ্জিল আমায়।
জগদীশ সাক্ষী, নাহি তার দোষ,
মম বনবাস রাম-অভিপ্রায়॥

'রামের বনিতা মাতৃসম সীতা'
ভাবি' এতকাল সেবিয়াছে মোরে।
কিন্তু কি করিবে নাহিক উপায়,
ভ্রাতৃ অনুরোধ রাখিল এবারে॥
দোষাদোষ মোর করে নি' বিচার,
ধর্ম্মাধর্ম্ম তার দেখেনি ভাবিয়া।
ভ্রাতৃ-অনুগত ভ্রাতার আদেশ
শিরোধার্য্য মানি' গিয়েছে পালিয়া॥
সীতা কলঙ্কিনী ভাবি বুঝি মনে
অসুখী হৃদয় প্রাণেশ আমার।
তীর্থস্নান ছলে কনিষ্ঠের সাথে
করিল এরূপে তাই পরিহার॥
এত যদি মনে ছিল, রঘুনাথ;
লঙ্কা হ'তে কেন করিলে উদ্ধার?
অগিনী-পরীক্ষা কেন বা লইলে,
অযোধ্যায় কেন ফিরালে আবার॥
বড় সুখে ছিনু তোমা সনে, নাথ,
যদবধি মোরে করেনি' হরণ
পঞ্চবটী বনে ভিক্ষা ছল পাতি'
মায়াবী রাক্ষস দুর্ম্মতি রাবণ॥
সুখশান্তিহারা পরে দীর্ঘকাল
অশোক কাননে রহিনু বন্দিনী।
সে অবস্থা ক্রমে স'য়ে এসেছিল;
কেটে যেতেছিল দিবস যামিনী॥
কেন তবে শান্তি ফিরে দিলে মোরে;
সুখের স্বরগে আবার তুলিলে (?)
তুলিলে বা যদি কেন তবে, হায়,
দুঃখরসাতলে আবার ফেলিলে (?)

মিলনের পর প্রথম বিরহ
বড় নিদারুণ বড় দুঃখময়।
পুনর্ মিলন সুমধুর বটে
পুনর্ বিচ্ছেদে প্রাণ নাহি রয়।
বল্ তবে কোথা যাইবি অভাগী,
জুড়াইবি কোথা প্রাণের বেদন।
রাম আজ্ঞা তোর প্রতি 'বনবাস'
কাঁদ্ তবে সীতা কাঁদ্ আমরণ॥"
নীরবে কাঁদিল জনক দুহিতা;
বহুক্ষণ ধরি' দাঁড়াল সেথানে।
তারপরে কিছু সুস্থ হ'লে মন
আবার কহিল কাতর পরাণে॥
"স্বামীন্ দেবতা, প্রভো গুরু মোর
আশৈশব আমি সেবিয়াছি তোমা
কায়মনোবাক্যে; আজ(ও) তবে আজ্ঞা
পালিব তোমার চাহি' তব ক্ষমা॥
হোক্ মোর দুঃখ; হোক্ মৃত্যু মোর;
তুমি যদি সুখী—নাহি ক্ষতি তায়।
কর আশীর্ব্বাদ 'জন্মজন্মান্তরে
দাসী যেন শুধু স্থান পায় পা'য়॥"
থামিল বিলাপ গেল চিন্তা স্রোত
অন্য পথে বুঝি; আরো অগ্রসর
হ'য়ে বন পথে, কহিলা জানকী
দেবর উদ্দেশে, উত্তোলিয়া কর॥
তিষ্ঠ ক্ষণ কাল তিষ্ঠরে লক্ষ্মণ;
সীতার সন্দেশ— গুটী দুই কথা।
'জানায়ো প্রণাম শ্বশ্রূপদমূলে,
ব'ল অরণ্যেও দাসী তাঁর সীতা॥



যোগ্য সম্ভাষণ দিও পরিজনে
শুভ ইচ্ছা ব'লে করি সবাকার।
তোমারে কি কব? স্নেহ-আশীর্ব্বাদ
ভ্রাতৃ-ভকতির লহ পুরস্কার॥
রামের চরণে কিবা নিবেদন?
নিবেদন এই——যেন মোর প্রভু
অদর্শনে মোর না হন কাতর;
মোর দুঃখে কিম্বা না কাঁদেন কভু॥
জানিরে লক্ষ্মণ জানি ভাল মতে
বড় ভাল তিনি বাসিতেন মোরে।
তাই মুখফুটে নারিলেন নিজে
বলিতে আমারে "যাও সীতা দূরে"॥
'নির্ব্বাসন-দণ্ড দিলাম তোমারে;
প্রজা-রঞ্জন রাজধর্ম্ম জানি।
প্রজা ভাবে তুমি কলঙ্কিনী, সীতে,
চাহে তারা তাই সচ্চরিত্রা রাণী॥"
হায়, অনিচ্ছায় লোক অপবাদে
ডরি' শুধু প্রভু করেন বর্জ্জন!
তাঁর দোষ নাই; সব কর্ম্মফল;
তাঁর মন জানি মমতা-প্রবণ॥
দেখিও, দেবর, দেখিও আপনি—
ভরত শত্রুঘ্নে বলিও দেখিতে—
পতিরে আমার আপদে বিপদে
গৃহেতে বাহিরে রোগেতে শোকেতে॥

শেষ কথা মম নমি তাঁর পদে
বড় দুঃখ আর সেবিতে পাব না।
বড় দুঃখ দেখা হবে না অন্তিমে'
হা রাম স্বামিন্ সীতার সাধনা॥"
ফুরাইল কথা; 'মোহ গেল সতী—
ছিন্ন হেমলতা লুটাল ধুলায়।
অঙ্গের ভূষণ হ'ল অঙ্গচ্যুত
হইল ধমনী নিস্পন্দের প্রায়॥
নিস্তব্ধ কানন তখনি আবার
সে নিস্তব্ধ ভাব যাইল চলিয়া।
অদূরে উঠিল নরকণ্ঠ গীতি
বীণাযন্ত্র যোগে অমিয় ঢালিয়া॥
"রামগুণগান করয়ে রসনা
রাম নাম মন জপ, নিশিদিন
বাল্মীকির, আহা, সর্ব্বস্ব ও নাম"
থামিল সঙ্গীত; নীরবিল বীণ॥
জটাজুট ধারী আইল সন্ন্যাসী,
তবে, যেথা সীতা উজলি' ধরণী।
চাহি' মুখপানে কহিল কাতরে
'চিনেছি মা তুই রাঘব ঘরণী'॥
'ধ্যানযোগে তোর বিপদের কথা
জানিয়া এসেছি, রাম-মনোরমে,
আয় ল'য়ে যাই তবে গো মা তোরে
শান্তির অঙ্কেতে আমার আশ্রমে॥"

কমণ্ডলু হ'তে ল'য়ে স্নিগ্ধবারি
মুখেতে ছিটায়ে দিল মহামুনি।
সংজ্ঞা লভি তবে উঠিয়া বসিল
হায়! নির্ব্বাসিতা রামের রমণী॥

শ্রীচুনীলাল সেন।

# দেশের ও দশের কথা।

বর্ষারম্ভে দেশের কথা ভাবিতে গেলে বস্তুতই আশা ও নিরাশায় দোদুল্যমান হইতে হয়। বিগত বর্ষে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অন্যান্য বর্ষ অপেক্ষা কম থাকিলেও বসন্ত ও কলেরায় ততোধিক অনিষ্ট করিয়াছে। অন্নকষ্ট ও জলকষ্ট হ্রাস হওয়ার সংবাদ ত কুত্রাপি শুনা যায় নাই। ফরিদপুর—বাজিৎপুরের মুষ্টিমেয় বালক কর্ত্তৃক জলকষ্ট নিবারণোদ্দেশে এই ভীষণ গ্রীষ্মে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্থানীয় দত্ত পুষ্করণীর পঙ্কোদ্ধারকরণ এক অভাবনীয় ব্যাপার। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুল-তিলক আড্‌ভোকেট জেনেরল শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বড়লাটের কৌন্‌সিলের আইন সদস্য পদ লাভ —ভারতবাসীর পক্ষে সবিশেষ গৌরবের বিষয়। আলিপুর বোমার মামলায় জজ বীচ্‌ক্রফ্‌টের সুবিচারে সুপণ্ডিত অরবিন্দের নিষ্কৃতি লাভ ইংরাজ আদালতে ন্যায় বিচারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্যার লরেন্স্‌ জেঙ্কিন্‌স্‌ মহোদয় কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে সমাসীন হওয়ায়, আশা হয়, হাইকোর্টের প্রণষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার হইবে। বার্হা ডাকাতি মোকর্দ্দমায় ও মেদিনীপুর বোমার মামলায় তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে। লর্ড মিণ্টো—মর্লের শাসনসংস্কারে অনেকেই আশান্বিত তবে মুসলমান ভ্রাতৃগণের সহিত বিরোধাশঙ্কায় কেহ কেহ ম্রিয়মান। লর্ড মর্লে ভাঙ্গা বাঙ্গালা আর জোড়া লাগাইতে নারাজ। তবে মান্দ্রাজ ও বম্বের মত বঙ্গের ছোটলাটের খাস্‌ কৌন্‌সিল হইবে, তাহাতে চারিজন সদস্য থাকিবেন, তন্মধ্যে একজন বাঙ্গালী থাকাই সম্ভব। প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে সুদূর ব্রেজিল রাজ্যে বাঙ্গালী বীর কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের মৃত্যু সংবাদ এত কাল পরে সম্প্রতি এদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বিধর্ম্মী হইলেও বাঙ্গালী সুরেশ স্বীয় অকুতোসাহস ও অমানুসিক বীরত্বে স্বদেশবাসীকে জগতের সমক্ষে গৌরবান্বিত করত এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়ছেন।



# ত্রিবিধ জীবন।

খাইব পরিব সুখে কাল কাটাইব ইহাই সাধারণ মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য। সাধারণতঃ ইহাই অধিকাংশ মনুষ্য জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য। প্রাণিমাত্রেই জীবনে সুখ চায়। সেই সুখলাভের প্রত্যাশায় জীবনের কার্য্য যথাসাধ্য নিয়মিত করে। সেই সুখের অন্তরায় যে দুঃখ তাহা দূরে রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। এরূপ জীবন যাপনে নিন্দার বিষয় কিছুই নাই। যে সব ঘটনা অতীত কালে ঘটিয়াছে, যাহা বর্ত্তমানে চারিদিকে ঘটিতেছে, এবং যাহা ভবিষ্যতে ঘটিতে পারে, তাহার হিসাব নিকাস করিয়া চলাই এ প্রকার জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু তাহাই বা কয়জনে পারে? সেরূপ হিসাব নিকাসের ক্ষমতাই বা কয়জনের আছে? আর হিসাব নিকাসের ক্ষমতা থাকিলেও দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির তাড়নায়, কয়জন লোকে নিজ নিজ কর্ম্মের ফলাফল গণনা করিয়া কার্য্য করিতে পারে? মানুষ মারিলে ফাঁসি হইবে ইহা জানিয়া শুনিয়া লোকে মানুষ খুন করিতে প্রবৃত্ত হয় কেন? বস্তুতঃ কর্ম্মের ফলাফল গণনা করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে এরূপ সংযতচিত্ত লোকের সংখ্যাও অতি বিরল। তাই যাঁহাদের সেরূপ বিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা আছে, যাঁহারা কর্ম্মের ফলাফল গণনা করিয়া প্রবৃত্তি দমন করিতে পারেন, তাঁহারা নিন্দার পাত্র না হইয়া বরং প্রশংসার পাত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এরূপ বিচারমূলক জীবনকে "life of facts" সংসারগত জীবন বলা যাইতে পারে, কারণ এরূপ জীবন সংসারের ঘটনা পরম্পরা বিচারের দ্বারা নিয়মিত। আত্মসুখ লাভই এ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এরূপ জীবনে সুখ ও শান্তি থাকিতে পারে, কিন্তু মহত্ত্ব আছে কি?

মহত্ত্বের বিকাশ ভাবের উচ্চতায় ও গভীরতায়। হৃদয়ে উচ্চভাব ফুটিয়া উঠিলে, মানুষ নিজের সুখ-সম্পদ, আপদ বিপদ কিছুই গ্রাহ্য করে না। উচ্চ ভাবের উদ্দীপনায় মানুষ ভবিষ্যতের লাভ ক্ষতি গণনা করিবার অবসর পায় না। সেই ভাবের তরঙ্গে আত্ম-হারা হইয়া মানুষ সংসারের সুখ দুঃখে,

নিন্দা স্তুতিতে কিছু মাত্র বিচলিত হয় না। এরূপ জীবনকে " life of ideas " ভাবময় জীবন বলা যাইতে পারে।

তোমার আমার মত সংসার সুখ মুগ্ধ কত শত ক্ষুদ্র প্রাণী হইতেছে মরিতেছে, হয় ত খুব বিজ্ঞতার সহিত আপন আপন ক্ষুদ্রজীবন নিয়মিত করিয়া বুদ্‌বুদের ন্যায় কালসাগর তলে বিলীন হইতেছে। কিন্তু যে মহাত্মা কোন একটি উচ্চ ভাবে তন্ময় হইয়া তাহাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি যে দেশে যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পুণ্য চিহ্ন ধারণ করিয়া পবিত্র হইয়াছে। ইতিহাস তাঁহার অমরত্ব ঘোষণা করিয়া ধন্য হইয়াছে। এই সকল মহাভাবোন্মত্ত নরনারী সমগ্র মানব জাতির অক্ষয় সম্পত্তি। যে মহাপুরুষ পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি দধীচি হউন, শাক্যসিংহ হউন বা যীশু খ্রীষ্ট হউন —তিনি সমগ্র মানব জাতির পূজনীয়। যিনি পতিত দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি ম্যাট্‌সিনি হউন, ওয়াসিংটন হউন, প্রতাপসিংহ হউন—সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে তাঁহার বিজয় ঘোষণা করিবে। যিনি পতিত ধর্ম্মকে উদ্ধার করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ হউন, শঙ্করাচার্য্য হউন, মার্টিন লুথার হউন—ধর্ম্মজগতে চিরদিন তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

এই সকল মহাত্মা মানবজাতির ইতিহাস পৃষ্ঠে উচ্চতম ভূধর শিখরের ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু উচ্চতম গিরিশৃঙ্গের আবার ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা স্তর আছে। ভাবরাজ্যও সেইরূপ নানা স্তরে বিভক্ত। যে সকল নরনারী ভাবরাজ্যের ক্ষুদ্র স্তরে সাধনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পুণ্যকীর্ত্তিও চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রদেশে এরূপ ভাবের পাগল নরনারীর সংখ্যা খুব অধিক। কেহ বা দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ সাধন মানসে জীবন পণ করিয়া গিয়াছেন। কেহ বা কারারুদ্ধ কয়েদীদিগের সুখসুবিধার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। কেহ বা বর্ব্বর সমাজে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য জীবন পাত করিয়াছেন। কেহ বা নূতন দেশ বা নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য জীবন সমর্পণ করিতেছেন। কত মহিলা



যুদ্ধে আহত বা রোগশয্যায় শায়িত নরনারীর সেবার জন্য জীবন দান করিতেছেন। আর স্বদেশের বা স্বজাতির হিতের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত নহেন, এরূপ নরনারীর সংখ্যা ইয়ুরোপ, আমেরিকা বা জাপানে নাই বলিলেই চলে।

এক সময়ে আমাদের এই অধঃপতিত ভারতবর্ষেও এরূপ ভাবের পাগল নরনারীর সংখ্যা কম ছিল না। তাঁহাদের পুণ্যবলেই এক সময়ে এদেশ উঠিয়াছিল, আবার তাঁহাদের অভাবেই এদেশ এখন এত হীন হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুজাতির প্রকৃতিগত বিশেষত্বের জন্য প্রধানতঃ ধর্ম্মের দিক দিয়াই তাঁহাদের হৃদয়ের ভাবগুলি ফুটিয়াছিল, স্বদেশ বা স্বজাতির অবলম্বনে ফোটে নাই। বর্ত্তমান সময়ে ইয়ুরোপ, আমেরিকা বা জাপান যেরূপ স্বদেশের ভাবে উন্মত্ত হইয়াছে, এক সময়ে ধর্ম্মরূপ মন্দাকিনী ধারার উচ্ছ্বাসে এদেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। সেই সকল ধর্ম্মের ভাব কেবল যে আত্ম-যোগ-সাধনে বা ঈশ্বরের আরাধনায় নিবদ্ধ ছিল তাহা নহে। তাহা লোকের সামাজিক জীবনেও নানা ভাবে ফুটিয়া উঠিত। কারণ হিন্দুজাতির সমাজ ধর্ম্মের জন্য ছিল, ধর্ম্ম সমাজের জন্য ছিল না; তাঁহাদের সামাজিক কর্ত্তব্যগুলিও ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে সাধিত হইত।

কায়মনোবাক্যে গুরুর আদেশ প্রতিপালন করা শিক্ষার্থী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে শিষ্যের বিদ্যালাভ হয় না। এই নিজ-হিত-মূলক কর্ত্তব্যটিকে আমরা একালের লোকে অন্যান্য কত শত সামাজিক কর্ত্তব্যের ন্যায় কেবল সামাজিক কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝি। তাই স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে গুরুর আদেশ প্রতিপালন করাটা, গণিত বা বিজ্ঞান পাঠের ন্যায় একটি optional subject (ইচ্ছাধীন বিষয়) বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু সেকালের কোন কোন শিষ্য এমন পাগল ছিল যে এই ক্ষুদ্র সামাজিক কর্ত্তব্য পালনের অনুরোধে জীবন বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত ছিল! তাই আমরা দেখি, ধৌম্য-শিষ্য উদ্দালক গুরুর ক্ষেত্রে জল রক্ষা করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া (কেবল পড়া মুখস্থ করিবার জন্য নহে!) নিজে আলের উপর শুইয়া রাত্রি কাটাইয়াছিলেন, কারণ গুরুর আদেশ অবশ্য পালন করিতে হইবে। আবার সেই গুরুর আর একটি শিষ্য উপমন্যু গুরুর

আদেশে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল হৃষ্টচিত্তে গুরুকে অর্পণ করিয়া—এমন কি গরু চড়াইতে গিয়া গরুর দুগ্ধ, ও পরে দুগ্ধপায়ী বৎসের মুখের ফেন পর্য্যন্ত খাইতে নিষিদ্ধ হইয়া—অবশেষে ক্ষুধার জ্বালায় অর্কপত্র ভক্ষণ করিয়া অন্ধ হইয়াছিলেন। *

বিপন্ন ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করা একটি সামাজিক কর্ত্তব্য। ইহার মূলে নিজের স্বার্থপরতা অর্থাৎ "তুমি তোমার প্রতিবেশীর নিকট যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তুমিও তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর"—এই নীতি বিদ্যমান। এই হিসাবে বর্ত্তমান সময়ে অন্যকে আশ্রয় দেওয়া নিজের ইচ্ছাধীন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি যখন কখনও তোমার দ্বারস্থ হইব না, তখন তোমাকে আশ্রয় দিতে আমার গরজ কিসের? বিশেষতঃ তোমাকে আশ্রয় দিয়া যদি আমায় নিজকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়, তখন তোমাকে আমার বাড়ীর কাছে আসিতে দেওয়াই অন্যায়। অতএব হে আশ্রয়প্রার্থী বিপন্ন ব্যক্তি! তুমি দূর হও। এখনকার দিনে আমাদের এই বুঝ। কিন্তু পূর্ব্বকালে এদেশে এমন লোকও ছিলেন, যাঁহারা এই কর্ত্তব্যটিকে একটি পরম ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতেন, এবং শরণাগতের রক্ষার্থে নিজের যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত

* সেকালের গুরুর এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ দেখিলে, একালের কোন্ শিষ্যের ও তাহার অভিভাবকের রক্ত গরম না হয়? অন্ততঃ একজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারকের মুখে একদিন এই সেকেলে গুরুর যথেষ্ট নিন্দাবাদ শুনিয়াছিলাম। গুরু ধৌম্য নিষ্ঠুর ছিলেন সন্দেহ নাই, তবে একালের বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুগণের মস্তকভক্ষণকারী পরীক্ষা অপেক্ষা তাঁহার পরীক্ষা যে অত্যন্ত কোমল ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার পরীক্ষায় হয় ত এক দিনের জন্য শিষ্যের শারীরিক কষ্ট হইত, কিন্তু এখনকার পরীক্ষার ফলে সারা জীবনের জন্য চক্ষুরোগ (short sight), শিরঃপীড়া, হৃদ্‌রোগ ইত্যাদি এমন কি তিল তিল করিয়া শরীরক্ষয় ও মৃত্যু। সেকালের গুরুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে শিষ্য গুরুর বরে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হইতেন, আর এখনকার গুরুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সামান্য কেরাণীগিরি পাওয়াও কঠিন!



হইতেন না। তাই আমরা দেখিতে পাই, মহারাজ চক্রবর্ত্তী শিবি একটি ক্ষুদ্র কপোত পক্ষীকে শ্যেনের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য অবলীলাক্রমে নিজের শরীর হইতে মাংস খণ্ড কর্ত্তন করিয়া দিতেছেন!

এই প্রসঙ্গে একটি রমণীরত্নের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি যে সে রমণী নহেন—তিনি বাসুদেবের ভগিনী, অর্জ্জুনের সহধর্ম্মিণী, অভিমন্যুর গর্ভধারিণী, পাণ্ডব-কুল-লক্ষ্মী সুভদ্রা। মহারাজ দণ্ডী একটি ঘোটকীর জন্য কৃষ্ণভয়ে ভীত হইয়া সুভদ্রার শরণাপন্ন হইলেন। সুভদ্রা তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। তাহার ফলে স্বয়ং কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণের ভীষণ সমর বাধিয়া উঠিল। স্বর্গের দেবগণ, মর্ত্ত্যের প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গ সেই যুদ্ধে যোগদান করিলেন। পাণ্ডবদিগের সমূহ বিপদ উপস্থিত। তবুও সেই মনস্বিনী রমণী সুভদ্রাদেবী দণ্ডীকে পরিত্যাগ করিলেন না। পাণ্ডবগণও এই ঘোর বিপদে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। সত্যের জয় হউক, ধর্ম্মের জয় হউক—ইহাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। তুমি সহোদর ভ্রাতা, তুমি প্রাণপ্রতিম সখা, তুমি ভবসাগরের কাণ্ডারী স্বয়ং ভগবান্—আমার কর্ত্তব্য পালনের জন্য তোমাকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারি! বোধ হয়, ইহাই শিক্ষা দেওয়ার জন্য লীলাময়ের এই বিচিত্র লীলা। উভয় পক্ষে যুদ্ধের বিরাট আয়োজন হইল, কিন্তু যুদ্ধ হইল না। স্বর্গ মর্ত্ত্যের "অষ্টবজ্র" যেই মিলিত হইল, অমনি সেই অপূর্ব্ব ঘোটকী শাপমুক্ত হইয়া অপ্সরারূপ ধারণ করিয়া স্বর্গে গেল।

শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়ার ন্যায় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাও একটি সামাজিক কর্ত্তব্য। একবার যে কথা মুখ দিয়া বলিয়া ফেলিয়াছি, তাহা রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। কারণ তাহা রক্ষা না করিলে, আর কেহ আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে না, সুতরাং তাহাতে আমারই ক্ষতি। সেই ক্ষতি নিবারণ করিবার জন্য আমার নিজের অঙ্গীকার পালন করা আবশ্যক। কিন্তু সেই অঙ্গীকার পালন করিতে গিয়া যদি আমাকে অন্য প্রকারে অধিকতর ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, তবে আমি তাহা কেন পালন করিব? মুখ দিয়া হঠাৎ কথাটা বাহির করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া কি, তাহা একেবারে বেদবাক্যের মত অচল অটল হইবে? অন্ততঃ এখনকার দিনে

আমরা ত অঙ্গীকার পালনকে এই ভাবে দেখি। বিশেষতঃ রাজনীতি ক্ষেত্রে। কিন্তু এক সময়ে এদেশের লোক এই অঙ্গীকার পালনকে জীবনের এক মহাব্রত বলিয়া বুঝিতেন, তাই তাঁহারা সংসারের সুখ দুঃখ, জীবন মরণ ইহার কাছে অতি তুচ্ছ বলিয়া গণ্য করিতেন। তাই আমরা দেখিতে পাই, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট একটি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না—সেই কঠোর-প্রাণ ঋষির পরিতোষের নিমিত্ত নিজের স্ত্রী পুত্র বিক্রয় করিয়া, অবশেষে নিজে চণ্ডালের দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন! এইরূপে রাজর্ষি দশরথ কৈকেয়ীর নিকট কখন্ কোন্ সূত্রে দুইটি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাই স্মরণ করিয়া আপনার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে যৌব-রাজ্যে অভিষেকের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে প্রেরণ করিয়া নিজেও পুত্রশোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন!

শ্রীরামচন্দ্রও আদর্শ পুত্র। পিতার ধর্ম্ম রক্ষা করা সন্তানের একমাত্র কর্ত্তব্য। পিতা মৃত হইলেও সন্তানকে সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইবে। অবশ্য এখনকার দিনে আমরা পিতা জীবিত থাকিতেও তাঁহার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে তাঁহারই উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকি, মরিলে ত কথাই নাই। আর পিতার আজ্ঞা পালন করি কতক্ষণ? না যতক্ষণ আমাদের নিজের তাহাতে কোন অসুবিধা না ঘটে। কিন্তু রামচন্দ্র সেই পিতৃসত্য পালন এবং পিতার ধর্ম্মরক্ষাকে জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। তাই আদর্শ ভ্রাতা ভরত আসিয়া সজল নয়নে তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া যখন তাঁহাকে অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়া রাজ্য গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন, তখন তিনি কিছুতেই সম্মত না হইয়া বনবাসী হইলেন। তিনি অবশ্য জানিতেন, তিনি অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলে তাঁহার স্বর্গীয় পিতাই অধিকতর তৃপ্তিলাভ করিতেন। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ রামচন্দ্র পিতার ধর্ম্মকে পিতার সন্তোষ অপেক্ষাও অধিক জ্ঞান করিয়াছিলেন, এবং সেই ধর্ম্মের জন্য রাজরাজেশ্বর হইয়াও বনবাসী হইলেন।

আর সেই ভরত? ইনি ত আর একটি প্রথম নম্বরের পাগল। আজ কালকার দিনে এক সহোদর ভ্রাতা সামান্য সম্পত্তির জন্য অন্যের গলায় ছুরি দিতেছে—রাজ্যের জন্য ত কথাই নাই। রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন না, তখন ভরত যদি পিতার আদেশে রাজ্য গ্রহণ করি-তেন, তবে কে তাঁহার নিন্দা করিত? কিন্তু সেই সহোদরের অধিক ভ্রাতৃ বৎসল, ভ্রাতৃভাবোন্মত্ত ভরত অযোধ্যার সিংহাসন তৃণবৎ পরিত্যাগ করিলেন এবং রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে বসাইয়া, রামের প্রতিনিধি স্বরূপ, রামের প্রত্যাবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত, সন্ন্যাসীর বেশে রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভরত কি তোমার আমার মত মানুষ?



রামচন্দ্র কেবল আদর্শ পুত্র নহেন, তিনি আদর্শ রাজা। প্রজারঞ্জন করা রাজার একমাত্র কর্ত্তব্য। রাজা আছেন কেন? না প্রজার হিতের জন্য। ইহাই রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এদেশের প্রাচীন মত। অনেক মারা-মারি কাটাকাটির পর বর্ত্তমান সময়ে নানাদেশে এই ডিমোক্রেটিক্ ভাবের অভ্যুদয় দেখা যাইতেছে। তাই এখন নানাদেশে Representative Govern-ment এর উৎপত্তি হইতেছে। কিন্তু ভারতের পক্ষে ইহা নূতন জিনিষ নহে। আর ভারতে রাজার কর্ত্তব্য শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, এরূপ কোন দেশে কোন কালে কোন রাজা বুঝিবেন না। তাই আমরা দেখিতে পাই, যে সীতার শোকে অধীর হইয়া রামচন্দ্র একদিন সুগ্রীবের সাহায্য লাভার্থে অন্যায় সমরে বালিবধ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, যাঁহার উদ্ধারের জন্য সমুদ্রে সেতু বাঁধিয়াছিলেন, সবংশে রাবণ বধ করিয়াছিলেন, লঙ্কাপুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন,—সেই প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা সতী সাধ্বী পত্নীকে নিতান্ত অর্ব্বাচীন প্রজার মনস্তুষ্টির জন্য আসন্ন-প্রসবাবস্থায় অবলীলাক্রমে বনবাসে প্রেরণ করিলেন! এস্থলে রামের পতিধর্ম্ম রাজধর্ম্মের নিকট ম্লান হইয়াছে। সীতাপতি রাম নরপতি রামের ছায়ায় ঢাকা পড়িয়াছেন। সম্ভ-বতঃ এক জীবনে এক জনের দ্বারা সর্ব্ব প্রকার আদর্শ রক্ষা করা অসম্ভব, এই সত্য এখানে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। কিন্তু রাজোচিত কর্ত্তব্যরূপ মহাভাবোন্মত্ত রাম এই কার্য্য দ্বারা যে চিরদিনের জন্য প্রজার হৃদয় সিংহা-সনে বিরাজ করিবেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এবার সেই আদর্শ সতী সীতার কথা বলিব। রাবণ তাঁহাকে বল-পূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া অশোকবনে রাখিয়াছে। তিনি সেই অশোক-

বনের পরম রমণীয় পত্র-পুষ্প-শোভা একবারও দেখিতেছেন না। তিনি প্রবালময় সোপান ও সুবর্ণময় বেদিকা শোভিত অম্বরচুম্বী অট্টালিকা সকল তুচ্ছ করিয়া একটি বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতেছেন। রাবণ তাঁহাকে যে সকল বহুমূল্য বস্ত্রাভরণ অর্পণ করিয়াছিল, তাহার প্রতি ভুলক্রমেও দৃক্‌পাত না করিয়া নিজের একমাত্র ক্লিন্ন কৌষেয় বসন পরিধান করিয়া, উপবাসে শোকে ভয়ে কৃশা হইয়া পতি ধ্যান করিতে করিতে ধূমজ্বালাবৃত বহ্নিশিখার ন্যায় অথবা পঙ্কদিগ্ধ মৃণালিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। রাবণ আসিয়া তাঁহাকে অনেক প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া অনুনয় বিনয় করিল; তদুত্তরে তিনি তাহাকে নানা প্রকার তীব্র ভৎর্সনা করিলেন। অবশেষে রাবণ বলিয়া গেল—"আমি তোমাকে আর দুই মাস সময় দিতেছি; ইহার মধ্যে তুমি আমার বাধ্য না হইলে আমার প্রাতরাশের নিমিত্ত পাচকগণ তোমার শরীর খণ্ড খণ্ড করিবে।" সীতা নিরুপায় হইয়া বিলাপ করিতে করিতে উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। ঠিক এই সময়ে তাঁহার দুঃখের অমানিশা ভেদ করিয়া একটি ক্ষীণ আশার আলোক ফুটিয়া উঠিল। রামের চর হনূমান শিংশপা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে সীতার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং রামের অভিজ্ঞান প্রদর্শন দ্বারা সীতার সন্দেহ ও ভয় দূর করিলেন। হনূমান্ তাঁহাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য নিজের পৃষ্ঠে তুলিয়া শ্রীরামের নিকট লইয়া যাইতে চাহিলেন, এবং সীতার প্রত্যয়ের জন্য নিজের বিরাট বপুঃ দেখাইলেন। এরূপ অবস্থায় অন্য কোনো রমণী হইলে কি করিতেন? এইরূপ আসন্ন বিপদ হইতে যত শীঘ্র উদ্ধার পাওয়া যায় ততই মঙ্গল। এই দুই মাসের মধ্যে রাম যে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় আসিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা কি? আবার লঙ্কায় আসিতে পারিলেও এই দুই মাসের মধ্যে রাবণকে বধ করিয়া সীতার উদ্ধার সাধন করিতে পারিবেন তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? সুতরাং অন্য কোন রমণী রামের আগমন অপেক্ষা না করিয়া, হনূমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শ্রীরাম চন্দ্রের সহিত অনায়াসে মিলিত হইতে ইচ্ছা করিতেন। শত্রুগৃহ হইতে এরূপ ভাবে পলায়ন করা কি দোষাবহ? আমাদের মতে নহে। কিন্তু আদর্শ সতী জানকী এরূপ পলায়নে সম্মত হইলেন না। আদর্শ সতী



কি ইচ্ছাপূর্ব্বক পরপুরুষ স্পর্শ করিতে পারেন? কখনই না। আবার রাবণ যেনই তাঁহাকে তস্করের ন্যায় হরণ করিয়া আনিয়াছিল, তাই বলিয়া তিনি রঘুকুলবধূ কিরূপে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিবেন? এরূপভাবে পলায়ন করিলে তাঁহার স্বামী সেই রঘুকুল তিলকের বীরত্বে কলঙ্ক স্পর্শিবে। তাই তিনি হনূমানকে বলিলেন—"হে হনূমান্, আমি তোমার সাধু ইচ্ছা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু আমার জীবন যায় সেও ভাল, তবু আমি ইচ্ছা করিয়া পরপুরুষ স্পর্শ করিতে পারিব না। আর রাম যদি দশাননকে বধ করিয়া আমাকে উদ্ধার করিতে পারেন, তবেই তাঁহার উপযুক্ত কার্য্য হইবে।

"যদি রামো দশগ্রীবমিহ হত্বা স রাক্ষসম্।
মামিতো গৃহ্য গচ্ছেত্ত তৎ তস্য সদৃশং ভবেৎ॥"

অর্থাৎ সীতার নিকট পতিলাভ অপেক্ষাও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বড়! নিজের প্রাণ যায় সেও ভাল তবু বীর পতির যশোরাশিতে কলঙ্ক স্পর্শ না হয়। ধন্য সতী শিরোমণি! ধন্য বীরপত্নী!

যদি এই একটি সতী চরিত্র দেখিলেন, তবে আর একটি দেখুন। মহারাজ অশ্বপতির একমাত্র দুহিতা সাবিত্রী। এই কন্যারত্নকে তিনি অনেক তপস্যার ফলে লাভ করিয়াছেন, সুতরাং সাবিত্রী তাঁহার বড়ই আদরের বস্তু। অশ্বপতি উপযুক্ত বরের অভাবে তাঁহার বিবাহ দিতে পারিতেছেন না, কারণ তাঁহার মধ্যে এরূপ একটি তেজ ছিল যাহা কোন পরিণয়ার্থী যুবক সহ্য করিতে পারিলেন না। অবশেষে মহারাজ সাবিত্রীকে নিজের বর পছন্দ করিতে আদেশ করিলেন। সাবিত্রী দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান্‌কে দেখিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণে অশ্বপতি জানিতে পারিলেন, সত্যবান্ স্বল্পায়ুঃ। সেই জন্য মহারাজ অশ্বপতি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সাবিত্রীকে অন্য পতি বরণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। সাবিত্রী সত্যবান্‌কে মনে মনে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সত্যবানের ত বিবাহ হয় নাই? তবে আর সাবিত্রীর অন্য পতি বরণে বাধা কি হইতে পারে? বর্ত্তমান সময়ে আমরা ত ইহাতে কোন দোষ দেখি না। বিশেষতঃ সুসভ্য পাশ্চাত্য সমাজে এরূপ মনে মনে পতি বরণ করিয়া তাহার চিত্র আবার মন হইতে মুছিয়া ফেলা ত নিত্য ঘটনা। তাহাদের

দেখাদেখি আমাদের দেশেও এরূপ পতিবরণ কিছুদিন হইল আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুনারীর আদর্শরূপা সাবিত্রী মাতা অন্যরূপ বুঝিলেন। সেই আদর্শ সতীর হৃদয়-মুকুরে যে পতির চিত্র একবার প্রতিফলিত হইয়াছে, সেখানে অন্য মূর্ত্তি কি প্রকারে স্থান পাইবে? তাই তিনি পিতাকে বলিলেন, "সত্যবান্ দীর্ঘায়ুঃ হউন বা স্বল্পায়ুঃ হউন—সগুণ হউন বা নির্গুণ হউন, আমি যখন তাঁহাকে একবার পতি বলিয়া মনে মনে বরণ করিয়াছি, তখন এ জীবনে অন্য পতি গ্রহণ করিব না।"

আর দৃষ্টান্ত বাড়াইব না। এই সকল ভাবকে এখনকার লোকে কি বলিবে? বাতুলতা না Sentimentalism? এখনকার লোকে যাহাই বলুক, এই সব ভাবই খাঁটি আর্য্যভাব। এই সব ভাব খাঁটি ভারতবর্ষের জিনিষ। এক সময়ে ভারতবর্ষে এই সকল মহাভাবের সাধনা হইত। সেই সাধনায় যে সকল মহাত্মা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম পুরাণেতিহাস সগর্ব্বে বহন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রবল কলির প্রভাবে এখন সে সাধনা লুপ্ত হইয়াছে। এখন আর সেই আর্য্যগণ-সেবিত পুণ্যনিকেতন ভারতবর্ষকে চিনিবার উপায় নাই। কেবল একটি মাত্র ভাব অতীতের সহিত বর্ত্তমানের কথঞ্চিৎ যোগ রাখিয়াছে। সেটি হইতেছে হিন্দুনারীর পাতিব্রত্য সীতা সাবিত্রীর পুণ্যবলে এখনও এদেশে সতী নারীর অভাব হয় নাই। হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্য্য তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ইংরেজের আইনবলে সতীদাহ নিষিদ্ধ হইলেও, এখনও মধ্যে মধ্যে দুই একটি সতী রমণীকে অতি আশ্চর্য্যরূপে মৃতপতির অনুগমন করিতে শুনা গিয়া থাকে। কিন্তু দুর্জ্জয় কালের প্রভাবে হিন্দুজাতির এই শেষ গৌরবটুকু—ভারতের এই শেষ মহিমাটুকুও বুঝি আর থাকে না। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক সকল বিষয়েই বিলাতির অনুকরণ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, কারণ তাঁহাদের মতে এই বিলাতির অনুকরণই চরম উন্নতি। এতদিন কেবল 'অনুকরণ' ছিল, এখন স্বদেশী হুজুকে আবার 'অনুবাদ' আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা স্বদেশীর খাতিরে বিলাতী ভাবের 'অনুকরণ' করিতে লজ্জা বোধ করেন, তাঁহারা তাহার 'অনুবাদ' করিয়া লইতেছেন। কিন্তু কেবল অনুকরণ এবং অনুবাদ দ্বারা যেমন জাতীয় সাহিত্য গঠিত হইতে পারে না, সেই-



রূপ কেবল বিদেশীয় ভাবের অনুকরণ এবং অনুবাদ দ্বারাও জাতীয় জীবন গঠিত হইতে পারে না। যেমন স্থায়ী সাহিত্যের জীবন মৌলিকতা, সেইরূপ স্থায়ী জাতীয় জীবনের মূলেও মৌলিকতা। যে জাতির যে টুকু বিশেষত্ব তাহা বর্জ্জন করিলে, কোন্ ভিত্তির উপরে জাতি গঠন করিবে? সেই বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া, তাহার অবলম্বনে জাতীয় অট্টালিকা নির্ম্মাণ কর, এবং যদি তাহার উপর বিলাতী রঙ্ বিলাতী চাকচিক্য ফলাইতে চাও তবে ফলাইতে পার। তাহা হইলে জাতি গঠন স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য হইবে। তাহা হইলে সেই জাতীয় সৌধের ভিত্তি সমাজের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে। এই যে কিছুদিন পূর্ব্বে স্বদেশী ভাবের উচ্ছ্বাসে—স্বদেশপ্রীতির বন্যায় সমগ্র দেশ প্লাবিত হইয়াছিল, এখন সেই ভাবের বিন্দু কোথায়ও কিছু আছে কি? হাঁ, আছে বৈ কি। গভীর খাতেই বন্যার জল দাঁড়ায়, উচ্চ ভূমি হইতে তাহা সরিয়া যায়। যে সকল মহাত্মার হৃদয়ে ঈশ্বরভক্তি, গুরুজনভক্তি, স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি উচ্চভাব সকলের গভীরতা আছে, সেইখানেই এই স্বদেশপ্রীতির বন্যার জলও দাঁড়াইয়াছে, অন্য হৃদয়ে যত শীঘ্র আসিয়াছিল তত শীঘ্র সেখান হইতে সরিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই সকল জাতীয় ভাবই আমাদের জাতি গঠনের ভিত্তি হউক। বিশেষতঃ ধর্ম্ম জিনিষটি এদেশবাসী নরনারীর মজ্জাগত উচ্চভাব। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া যাঁহারা নেশন গঠন করিতে প্রয়াস পাইবেন, তাঁহাদের চেষ্টা কখনও এদেশে সফল হইবে না। ধর্ম্মবিচ্যুত জাতীয়তা বরং অনেক উপসর্গের উৎপাদন করিবে। যদি বল, এদেশে নানা ধর্ম্মের নানাজাতির বাস—ইহাতে "মহাজাতি" গঠন কি প্রকারে হইবে? মহাজাতি গঠনের প্রস্তাবটা আপাততঃ কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখিলেই ভাল হয়। আগে জাতি, না আগে মহাজাতি? আগে ব্যক্তি, না আগে জাতি? মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন এখন এদেশে আকাশকুসুম ও মায়ামরীচিকাবৎ অলীক। সেই মায়ামরীচিকার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার জাতিত্ব নষ্ট করিও না।

কথায় কথায় আমরা প্রস্তাবিত বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন সেই মূল প্রস্তাবের অনুসরণ করা যা'ক। ত্রিবিধ জীবনের

মধ্যে আমরা "Life of facts" ও Life of ideas দেখিয়াছি। এই দুই প্রকার জীবন ভিন্ন আর এক প্রকার জীবন আছে। তাহার নাম "Ideal life" অর্থাৎ আদর্শ জীবন।

ভাবময় জীবনের (life of ideas) কিরূপ মহত্ত্ব তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ভাবের উচ্ছ্বাস সকল ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় নহে। সেই উচ্ছ্বাসের মূলে পরহিতৈষণা বা অন্য কোন ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উন্মেষ না থাকিলে, তাহার মহত্ত্ব স্বীকার করা যায় না। পাশ্চাত্য জগতে বর্ত্তমান সময়ে অনেক লোক শুধু খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া নানা দুঃসাহসের কাজ করিতেছে। কেহ সাঁতার কাটিয়া ইংলিস্ চেন্যাল পার হইতেছে, কেহ পদব্রজে বা বাইসিকেলে চড়িয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে—ইত্যাদি। আমাদের দেশেও কোন কোন স্থলে দেখিতে পাই, মামলা মোকর্দ্দমার জিদ রক্ষা করিতে গিয়া কত লোকে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। আবার এমন কত ভাবোন্মত্ত ব্যক্তি দেখা যায়, যাঁহারা পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধে ক্ষণস্থায়ী যশঃ লাভ করিবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হইতেছেন এবং সেই ঋণ শোধের জন্য যাবজ্জীবন কষ্টভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের এই কষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের পরলোকগত পিতামাতার তৃপ্তি হয় কি না বলিতে পারি না, তবে এরূপ কার্য্য যে পরিণামদর্শী সুধীজনের নিকট নিন্দনীয় সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালেও লোকে এইরূপ ভাবের উচ্ছ্বাসে অনেক অকার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তখন ধর্ম্মের একাধিপত্য ছিল বলিয়া এই সব খেয়াল ধর্ম্মের বেশ ধারণ করিয়া লোকের মন ভুলাইত। কিন্তু খেয়ালের বশে আত্মত্যাগ কখনও ধর্ম্মপদবাচ্য হইতে পারে না। অথচ এই এরূপ একটি খেয়াল একদিন ধর্ম্মের বেশ ধরিয়া মহারথী কর্ণকে ভুলাইয়াছিল। কর্ণ যখন ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয় দাতা বলিয়া নিজ নাম ঘোষণা করিলেন, তখন ব্রাহ্মণবেশধারী ইন্দ্র আসিয়া তাঁহার নিকট তাঁহার জীবনস্বরূপ অক্ষয় কবচ ও কুণ্ডল ভিক্ষা করিলেন। তখন কর্ণকে বাধ্য হইয়া নিজের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে দেবদত্ত কবচ ও কুণ্ডল দান করিয়া নিজের মৃত্যুর পথ পরিষ্কৃত করিতে হইল। এরূপ দানকে আত্মহত্যা বলিব না তবে কি বলিব? এরূপ দান যে পুণ্যের কার্য্য না হইয়া ঘোরতর পাপের



কার্য্য, এই দানের ফলস্বরূপ মহাবীর কর্ণের অকাল মৃত্যুই তাহার প্রমাণ। ইহার অন্যতম সাক্ষী মহারাজ বলী। তাঁহাকেও এইরূপ অসংযত ভাবের উচ্ছ্বাসে পড়িয়া বামনরূপী বিষ্ণুকে পৃথিবীদান করিয়া পাতালে বন্দী হইতে হইয়াছিল। অতিদানরূপ খেয়ালের ইহাই ভগবৎ প্রদত্ত শাস্তি। অন্যের কথা দূরে থাকুক, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও এইরূপ একটি অধর্ম্মমূলক খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। দ্যূতক্রীড়া একটি ব্যসন সুতরাং ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ক্রূরমতি দুর্য্যোধন যখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন, তখন ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মবুদ্ধি প্রভাবে অনায়াসেই ত সেই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন। কিন্তু এই পাপ ব্যসন তখন তাঁহার নিকটে ধর্ম্মের মুখস পরিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাই তিনি বিদুরকে বলিলেন "যদি আমাকে সভা মধ্যে আহ্বান না করিত, তাহা হইলে আমি শকুনির সহিত ক্রীড়া করিতাম না। যখন আহূত হইয়াছি, তখন নিবৃত্ত হইব না, ইহাই আমার সনাতন ব্রত।*" সেই সনাতন ব্রত রক্ষার ফল হইল রাজ্যনাশ, দাসত্ব স্বীকার, দ্রৌপদীর অবমাননা এবং বনবাস। ধর্ম্মবেশধারী পাপ এইরূপে সাধুজনকেও প্রতারিত করে।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, সকল ভাবের উদ্দীপনাই কল্যানকর নহে। এমন কি উচ্চভাব সকলও অতিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে পাপজনক হয়। কারণ তাহা সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী। যাহা সৎ, যাহা সত্য, যাহা স্থায়ী মঙ্গল উৎপাদন করে, তাহাই সনাতন ধর্ম্ম। এই সনাতন ধর্ম্মই সকল প্রকার ভাবের কষ্টিপাথর। ধর্ম্ম বুদ্ধির প্রেরণায়ও যদি উচ্চভাব স্থায়ী মঙ্গলের সীমা অতিক্রম করে, তবে তাহা অধর্ম্মে পরিণত হয়, সুতরাং তাহাকে সংযত করা উচিত। উচ্চভাব সকলকে এই সনাতন ধর্ম্মের আলোকে সুসংযত করিতে হইবে। যে মহাত্মার হৃদয়ে ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রসূত উচ্চভাব সকলের উদ্দীপনা হয়, অথচ সেগুলি এই সনাতন ধর্ম্মের আলোকে সুসংযত,—যে মহাপুরুষের হৃদয়-ক্ষেত্র সর্ব্ব প্রকার উচ্চভাবের আকর অথচ তাহার কোন একটি অতিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অন্যগুলিকে হ্রাস করিয়া অমঙ্গল উৎপাদন করে না—

* কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত হইতে উদ্ধৃত।

যাহার চরিত্রে উচ্চতম ধর্ম্মভাব সকলের সুসংযত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়—তিনিই আদর্শ পুরুষ, তাঁহার জীবনই ideal life।

কিন্তু এরূপ উচ্চতম আদর্শ মানবজীবনে সম্ভবে না, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরই তাহার প্রমাণ। তাই স্বয়ং ভগবান কখন কখন লোকশিক্ষার জন্য আদর্শ জীবন গ্রহণ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। নচেৎ ক্ষুদ্র মানব কি দেখিয়া কোন্ অবলম্বনে ঊর্দ্ধে উঠিবে? তাই স্বয়ং করুণাময় কখনও পূর্ণরূপে, কখনও অংশ কলায় অবতীর্ণ হইয়া এই ধরাধাম পবিত্র করেন। তাই তিনি কখনও আদর্শ গৃহী, কখনও আদর্শ সন্ন্যাসী কখনও আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ পতি, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ সখা—আবার কখনও বা আদর্শ মাতা, আদর্শ দুহিতা, আদর্শ সহধর্ম্মিণী। তিনিই আদর্শ প্রেমিক, তিনিই আদর্শ প্রেমিকা। তিনিই আদর্শ প্রজা আবার আদর্শ রাজা। সেই এক হইয়াও বহু—সেই বহুরূপী, অনন্তরূপী পুরুষের পদে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

পুরুলিয়া। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

---

# ভূ-প্রদক্ষিণ।

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

### [বৃন্দিসি]

আমরা বৃন্দিসিতে পৌঁছিয়াই জাহাজে বসিয়া কুক কোম্পানীর (Thomas Cook& Sons) এজেণ্টের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কুক কোম্পানী আমাদের ইউরোপ ভ্রমণের বন্দোবস্তের ভার লইয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষার পর এজেণ্ট মহাশয় উপস্থিত হইলেন; তাঁহার সঙ্গে ছিলেন আমাদের কুরিয়ার (Courier) অর্থাৎ সাথী। এই সাথী আমাদের সঙ্গে ইউরোপে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইনি একজন ইটালিয়ান। উত্তম ইংরাজী বলিতে পারেন এবং ইউরোপের সকল দেশের ভাষাই জানেন। ইঁহার নাম Frederico Mantelli। অতি ভদ্র সন্তান। ক্রমা-



গত ৭।৮ মাস আমাদের সহিত সহবাস করায় আমাদের সহিত অত্যন্ত আনুগত্য হইয়াছিল। এত যত্ন করিয়া আমাদের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে আমরা বিদেশে আছি ইহা বুঝিতে পারি নাই। সাহেব প্রথমে আসিয়াই আমাদের লগেজের ভার লইলেন। আমরা ক্রমে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলাম। ইউরোপের মাটিতে নূতন পদার্পণ করিয়া সবই নূতন দেখিতে লাগিলাম। সাদা কুলি কখন দেখি নাই; এখানে দেখিলাম। উহারা ইটালিয়ান। আমাদের মাল সমস্ত লইয়া ম্যাণ্টেলি সাহেবের সহিত উহারা কষ্টম হাউসে গেল। সেখানে সাহেব অতি চতুরতার সহিত মাল পরীক্ষা করাইয়া আমাদের হোটেলে লইয়া আসিলেন। এখানে বক্তব্য যে মাল জাহাজ হইতে নামাইলেই কষ্টম হাউসে পরীক্ষা করে। যদি কোন মাশুলযোগ্য (dutiable) মাল থাকে তাহার মাশুল ধরিয়া লয়। আমরা একখানি ফিটন ভাড়া করিয়া আমাদের হোটেলে গেলাম। হোটেলের নাম Hotil Internationale। এই প্রথমে আমাদের ইউরোপীয় হোটেলে বাস। বাটিটি অতি সুন্দর তবে খুব বড় নয়। বৃন্দিসি যেমন সহর তাহার উপযুক্ত বাটী। হোটেলের অপরাপর বন্দোবস্ত ভাল। এখানে মে মাসে বেশ শীত পাইলাম। ভূমধ্যসাগরে পড়িবার পর হইতেই শীত পাইয়াছিলাম। রাত্রে আহারাদির পর একটি রহস্যজনক ঘটনা হইয়াছিল। ইটালী দেশের পূর্ত্ত বিভাগের (Public Works Department) রাজসচিব মহাশয় ঐ রাত্রে হোটেলে ছিলেন। তাঁহাকে ভোজ দিবার জন্য বৃন্দিসির প্রধান প্রধান লোকেরা সমবেত হইয়াছিলেন। বৃহৎ আয়োজন। ইটালিয়ান ডিনারের ব্যাপার কিরূপ দেখিবার জন্য আমাদের কৌতূহল হইল। আমাদের ঘরের পাশেই খানার ঘর। ঘরের পরদার পাশ হইতে আমরা গুপ্তভাবে দেখিতে লাগিলাম। যেমন খানার ঘটা তেমনি মদের কাণ্ড এবং তেমনি বক্তৃতার ঘটা। ইটালিয়ান ভাষায় বক্তৃতার ধুম, টেবিল চাপড়ান, হাত নাড়া এবং মুখভঙ্গী, এক নূতন ব্যাপার। আমাদের পূর্ব্বোক্ত বন্ধু "The Mukerjee" মহাশয়ের কৌতূহল একটু বেশি মাত্রায় হইয়াছিল; তিনি পরদার পাশ হইতে লুক্কায়িত ভাবে দেখায় সন্তুষ্ট না হইয়া খানার ঘরের দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। একজন

লোক ইহা দেখিয়া, আসিয়া ইটালিয়ান ভাষায় বলিল " Prohibito Entrata" ( প্রোহিবিতো এন্ত্রাতা ) অর্থাৎ প্রবেশ নিষেধ। মুখার্জ্জি মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না, দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রমে লোকটা গরম হইয়া উঠিল দেখিয়া 'ত্রাতা ত্রাতা' করিয়া হস্তভঙ্গী করিয়া দৌড়। লোকটা হতভম্ব হইয়া রহিল। আমাদের ঘরে একটা হাসির রোল উঠিল।

পরে আমরা শয়ন করিতে গেলাম। শয়ন করার পর মনে নানা চিন্তার উদয় হইল। ইউরোপে আসিয়া কি দেখিব এবং বম্বে ছাড়িয়া কি কি দেখিলাম ইহার একটা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। যাহা যাহা দেখিয়াছি তাহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত প্রথম অধ্যায়ে লিখিয়াছি। কিন্তু সহযাত্রীদের বিষয় কোন কথা লিখি নাই; এই অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ করিতেছি। বম্বে ছাড়িয়া জাহাজে চড়িলেই অ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ান ( Anglo-Indian ) মহাশয়েরা মুখের মুখোশ খোলেন। সে হাকিমী চাল আর থাকে না। সাধারণ মনুষ্য হইয়া যান। আমাদের সঙ্গে যে কয়জন অ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ান ছিলেন তাঁহাদের কোন কোন ব্যক্তির বিষয় উল্লেখ করিব। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন Bishop Chatterton। ইনি নাগপুরের বিশপ্, ছুটী লইয়া বাড়ী যাইতেছেন। ইহার বাড়ী আয়ারল্যাণ্ড। খৃষ্টান পাদরি হইলেও ইঁহার ধর্ম্মমত বড় উদার। সদালাপী, মিষ্টভাষী, ইঁহার সহিত আলাপ করিলে মন উন্নত হয়। জাহাজে যতদিন ছিলাম প্রতিদিনই আমাদের নিকট আসিয়া আপ্যায়িত করিতেন। জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়াও আয়ারল্যাণ্ডে ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি, কাঁকনাড়া কলের অধ্যক্ষ কর্ণেল ক্লার্ক ( Col. Clarke )। ইঁহার ন্যায় সদাশয় ব্যক্তি অতি দুর্ল্লভ। বিবাহের দিন বিবাহের পূর্ব্বেই হঠাৎ স্ত্রীর মৃত্যু হয়। সেই শোকে তিনি আজিও বিবাহ করেন নাই। এখন বয়স প্রায় ৬৫ বৎসর। নিজে ক্রোড়পতি, কিন্তু কিছুমাত্র অহঙ্কার নাই। দীন দরিদ্রের প্রতি বিশেষ দয়া। কাঁকনাড়ায় সাধারণের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করিয়া একটি ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছেন। কাঁকনাড়া ষ্টেশন হইতে ঐ ঘাট পর্য্যন্ত বহু ব্যয়ে একটি প্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। দেশীয় লোকের প্রতি বিশেষ প্রীতি। কোন্ কালে বিবাহের দিন স্ত্রী বিয়োগ



হইয়াছিল, তাহা এখন পর্য্যন্ত স্মরণ রাখিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই, ইহা বিশেষ মহত্ত্বের চিহ্ন।

যে রাত্রে ভূমধ্যসাগরে ঝড় হয় তাহার পরদিনে ওসাইরিসের ডেকের উপর বেড়াইতেছিলাম। একজন সাহেব আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'মহাশয় কি ভারতবর্ষের লোক?' আমি বলিলাম, 'হাঁ'। তিনি বলিলেন,—'আমি ভারতবর্ষের লোকদিগকে ভালবাসি।' শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম ও আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। তিনি বলিলেন,—'ভারতবর্ষের ধর্ম্ম অতি প্রাচীন এবং উন্নত। আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি।' ক্রমে কথায় কথায় বুঝিলাম ইঁহার আর্য্য ধর্ম্মের বিষয় বিশেষরূপে জানা আছে। ক্রমে ২।১ দিনের মধ্যেই তাঁহার সহিত বিশেষ বন্ধুভাব জন্মিল। দুইজনে সর্ব্বদাই একত্রে থাকি। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মমত তাঁহার জানা আছে। নিজে উদার ভাবের খৃষ্টীয়ান; কোন সাম্প্রদায়িক ভাব নাই। যে সকল মিশনরিরা ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে হিদেন ( heathen ) বলিয়া জানেন তাঁহারা ইঁহার নিকট বিশেষ শিক্ষা পাইতে পারেন। ইঁহার পিতা একজন অষ্ট্রীয়ান, মাতা সুইস্; নিজে জেরুশালেমে বাস করেন, কার্য্যোপলক্ষে লণ্ডন যাইতেছেন। জেরুশালেমে বাস করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "প্রভু ( The Lord ) সেখানে প্রকট হইয়াছিলেন।" এই কথা বলিবার পরই তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। দেখিলাম, লোকটি পরম ভক্ত। আলাপ করিয়া এত আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম যে তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। বৃন্দিসি পৌঁছিবার পূর্ব্বে তাঁহার কার্ড আমাকে দিলেন এবং আমার কার্ড চাহিলেন। তাঁহার কার্ডে লেখা আছে,—" John Vester—Jerusalem. " প্রিয়তম Vesterএর কার্ড আমার কাছে এখনও আছে, কিন্তু এ জীবনে আর তাঁহার সহিত দেখা হইবে না। দুই দিনের আলাপে যে সৌহৃদ্য জন্মিয়াছে তাহা এ জীবনে কখন বিস্মৃত হইব না। ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাকর্ষণ হইল। প্রাতঃকালে উঠিয়া জানালা দিয়া বন্দর দেখিতে লাগিলাম। বৃন্দিসির প্রাকৃতিক শোভা উত্তম। বন্দরটি ছোট। অপর পারে ইটালিয়ান গবর্ণমেণ্টের একটি কেল্লা আছে। এই স্থানকে রোমানেরা Brundusium বলিত।

৮টার গাড়িতে আমাদের Naples যাইতে হইবে, সুতরাং তাহার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলাম। ট্রেণের সময় উপস্থিত হইলে আমরা ষ্টেশনে গেলাম। ষ্টেশন যাইবার পথে সহরটি দেখিয়া লইলাম। স্থানটি ছোট ও অপরিষ্কার এবং লোকগুলি আরও অপরিষ্কার। রাস্তার মোড়ে মোড়ে অনেক নিষ্কর্ম্মা লোক দণ্ডায়মান। এরূপ অপর কোন ইটালিয়ান সহরে পরে দেখি নাই। পথে আসিতে আসিতে একদল মিলিটারি ব্যাণ্ড যাইতেছে দেখিলাম। তাহার সঙ্গে কতকগুলি বৃন্দিসির কর্ত্তৃপক্ষ লোক যাইতেছিলেন। রণবাদ্য বাজাইয়া ইঁহারা কৃষি প্রদর্শিনী (Agricultural Exhibition) খুলিতে যাইতেছিলেন। ষ্টেশনে পৌঁছিবার কতক্ষণ পরে গাড়ি ছাড়িয়া দিল। আমরা নেপল্‌স্ ( Naples ) পথে যাইতে লাগিলাম। এখানে ইটালিয়ান রেলওয়ে সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিতেছি। রেলওয়ে গাড়িগুলি ভাল। প্রথম শ্রেণীতে মখমল আঁটা গদি কিন্তু অপরাপর বিষয়ে আমাদের ভারতবর্ষীয় রেলগাড়ি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইটালী দেশ উত্তর দক্ষিণে লম্বা, একটি বড় বুট জুতার ন্যায়। একদিকে Mediterranean সমুদ্র, অপর দিকে Adriatic সমুদ্র। দুই কুল দিয়া দুইটি রেলওয়ে বরাবর উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। একটির নাম Mediterranean Railway অপরটির নাম Adriatic Railway। নেপল্‌স্ যাইতে আমরা কতকদূর Adriatic কূল দিয়া যাইয়া পরে এপিনাইন্‌স্ ( Appenines ) পর্ব্বত পার হইয়া Mediterranean (ভূমধ্যসাগর ) কুল দিয়া যাইতে লাগিলাম।

ইটালীর ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। রেলওয়ের দুইধারে শস্য ক্ষেত্রগুলি শস্যে পরিপূর্ণ। ধান্য হয় না, সমস্ত গমের চাষ। স্থানে স্থানে হয় শুনিতে পাইলাম। আঙ্গুরের ক্ষেত্র দুইধারে সারি সারি দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে যেমন পানের বোরজ, তেমনি আঙ্গুরের ক্ষেত্র। কাটি দিয়া সাজান, তাহার গায়ে আঙ্গুর লতা উঠিয়াছে। কোথাও বা মাচা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই আঙ্গুর ফল যখন ফলে তখন কৃষকদের বড় আমোদ। কৃষকেরা আঙ্গুর তুলিবার জন্য ক্ষেত্রে যায় ও এক প্রকার সেইখানেই বাস করে। আঙ্গুর উদর ভরিয়া খাইয়া মাতাল হইয়া পড়ে। এই অবস্থার অনেক চিত্র ( Oil painting ) দেখিতে পাওয়া যায়। কোন স্ত্রীলোক



আঙ্গুরের রস খাইয়া মাতাল হইয়া বৃক্ষমূলে শুইয়া আছে; আলু থালু বেশ, মুখে রৌদ্র লাগিবার ভয়ে মাথার উপর হাত দেওয়া আছে, হাতের ছায়া বক্ষস্থলে পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, ইটালিয়ান রমণীগণ পরমাসুন্দরী। এই প্রকার ছবিকে বাখান্তে ( Bacchante ) বলে। রেলের দুইধারে জলপাইয়ের ( Olives ) গাছ। দক্ষিণ ইটালীতে জলপাইয়ের খুব চাষ হয়। বাদামের গাছও ( Almonds ) যথেষ্ট দেখিলাম। ইটালিতে পল্লিগ্রাম খুব কম, নগরই বেশী। ইটালিয়ানেরা নাগরিক, নগরে থাকিতেই ভালবাসে। স্থানে স্থানে খামারবাড়ি ছাড়া রীতিমত গ্রাম ( village ) খুব কমই আছে। ছোট বড় নগর অনেক। বৃন্দিসি ছাড়াইয়া প্রথম নগর দেখিলাম বারি ( Bari )। বারি একটি ছোটখাট বন্দর, এড্রিয়াটিক সাগরের উপর স্থিত এবং এক লক্ষ লোকের বাস। বাড়িগুলি সুন্দর, সাদা ধপ্‌ধপে এবং রাস্তা ঘাট খুব পরিষ্কার। এড্রিয়াটিকের অপর পারে আর একটি বারি আছে তাহার নাম অন্তিবারি ( Anti-Bari )। এটি মণ্টিনিগ্রোর ( Montenegro ) রাজার অধিকৃত। এই মণ্টিনিগ্রোর রাজকন্যা হেলেনা এখন ইটালির রাণী। বারি হইতে আমরা ফোজিয়া ( Foggio ) নামক নগরে পৌঁছিলাম। এইখান হইতে উত্তর পশ্চিমাভিমুখে চলিলাম এবং বোভিনো (Bovino) হইতে আমরা Appenines পর্ব্বতের ভিতর দিয়া পর্ব্বতের অপর পারে গেলাম। এই পর্ব্বত পার হইতে অনেক টনেল দিয়া যাইতে হইয়াছিল। বোভিনো হইতে গেলাম বেনেভেনটো ( Benevento )। এই নগরটি বড় সুন্দর। নিকটে একটি ছোট পাহাড়ের উপর একটি কন্‌ভেণ্ট (Convent) অথবা আশ্রম আছে। ইটালিতে Convent বলিতে Monastery এবং Nunnery দুইই বুঝায়। এই বেনেভেণ্টোর নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে কৃষকেরা প্রতি বৎসর অধিক লাভের আশায় আমেরিকা যুক্তরাজ্যে (United States) চলিয়া যায়। যখন আমরা (Caserta) উপত্যকায় পৌঁছিলাম তখন দূর হইতে ভিসুভিয়স্ ( Visuvius ) আগ্নেয় পর্ব্বত দেখা গেল। কাসার্ত্তা হইতে বোর্বোঁ ( Bourbon ) রাজাদের পুরাতন রাজবাটী দেখিলাম। যতদূর আসিলাম কোথাও পতিত জমী দেখিতে পাইলাম না। সমস্ত দেশটাই আবাদ, যেন একখানি প্রকাণ্ড বাগান। ক্রমে আমাদের ট্রেণ সহ নেপল্‌সের নিকট-

বর্ত্তী হইতে লাগিল, তত ভিসুভিয়স্ পর্ব্বত ভালরূপ দেখা যাইতে লাগিল। আমাদের যাইবার পূর্ব্বেই ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল; তাহার নিদর্শন চারিদিকেই বর্ত্তমান। আমরা যখন দেখিলাম তখনও অত্যন্ত ধূম নির্গত হইতেছিল। এ বিষয় পরে আরও বিস্তারিত রূপে লিখিব। নেপল্‌স্ দূর থেকে দেখিতে বড় চমৎকার। ইটালিয়ানেরা বলে "Vido Napoli e mori" (See Naples and die) অর্থাৎ নেপল্‌স্ দ্যাখ তবে মর। বেলা ৫টার সময় আমরা ষ্টেশনে পৌঁছিলাম এবং অনতিবিলম্বে আমাদের হোটেলে গেলাম। হেটেলের নাম—Hotel Royale des Etrangers (Royal Hotel for Strangers) বৈদেশিকদিগের জন্য রাজকীয় নিবাস।

শ্রীপশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

---

## উদ্ভট কবিতা।

[২]

চৈত্র মাসে ভয়ে ভয়ে ঘোল নিয়ে হাতে।
ঢেলেছিনু পূর্ণিমার পাঠকের পাতে॥
ভেবেছিনু ঘোল খেয়ে দাঁত যাবে ট'কে।
রাগ মিটাবেন সবে লেখকেরে ব'কে॥
এবে শুনি অন্যমত, পড়ি' সে পয়ার।
অনেকেই করেছেন প্রশংসা তাহার॥
একজন পাঠকের পত্রে এই পাই।
"উদ্ভট কবিতা" আরো শুনিবারে চাই॥
বলেছিনু পুনরায় পারি দেখা দিতে।
কাজেই আবার হ'ল আসরে নাবিতে॥
সেবারে বিষয় ছিল "সেকাল একাল।"
সমাজের প্রতি কিছু ঝাড়া ছিল ঝাল॥
এবারে একটি কথা কহিব দেশের ;—
অসামান্য মাতৃভক্তি মূর্খ সন্তানের॥



## মূর্খের মাতৃভক্তি।

গঙ্গাতীরে গৌরাঙ্গের পুণ্যলীলা ধাম।
বঙ্গ বক্ষে সুবিখ্যাত শান্তিপুর গ্রাম॥
রাঢ়ীয় বারেন্দ্র বিপ্র গোস্বামীঠাকুর।
তিলি তাঁতি নানাজাতি বসতি প্রচুর॥
বহু পল্লী সমন্বিত সুবিস্তৃত স্থান।
মন্দিরে মন্দিরে নিত্য হরি নাম গান॥
তীর্থ সম বারমাস উৎসব উল্লাস।
বর্ষে বর্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পর্ব্ব হয় রাস॥
কিছু দিন গত হ'ল ছিল শান্তিপুরে।
ভাগীরথী তীর হ'তে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে॥
ক্ষুদ্র এক ভদ্রাসনে দরিদ্র কুটীর।
তাহাতে করিত বাস তৈলিক কবীর॥
মা বই সংসারে তার নাহি ছিল কেহ।
বাপ, ভাই বহু পূর্ব্বে ত্যজিয়াছে দেহ॥
নিজে সে বয়সে প্রৌঢ় স্থবিরা জননী।
শয্যা ধরা প্রায় বৃদ্ধা দিবস রজনী॥
অতি কষ্টে আসিত সে ঘরের বাহির।
মাঝে মাঝে হ'ত বুড়ী রোগেতে অস্থির॥
না ছিল তৃতীয় প্রাণী কবীরের ঘরে।
প্রাণপণে একা পুত্র মাতৃসেবা করে॥
নিরক্ষর মূর্খ ছিল তৈলিক নন্দন।
অতি মাত্র অল্প তার ছিল উপার্জ্জন॥
বুদ্ধি ছিল এত কম, এতই সরল।
সকলে বলিত তারে কবীর পাগল॥
কাজ ছিল কবীরের নুন বদলাই।
ভাঙ্গা চুরা ঘটী বাটী নিয়া দিত তাই॥
সহরের ঘরে ঘরে ফিরিত ডাকিয়া।

এক ঢেবো নিব আমি দুই ঢেবো * দিয়া ॥
যেই কথা সেই কাজ যা' নিত বাসন।
দ্বিগুণ ওজনে তার দিত সে লবণ ॥
সকলে জানিত সেই পাগলের গুণ।
ঠকাত না কভু কারে এক রতি চুণ ॥
মিথ্যা কথা চুরি কিংবা শঠতা বঞ্চনা।
এ সকল পাগলের জানাই ছিল না ॥
বেচিয়া বাসন ভাজা লাভ যা পাইত।
তাই দিয়া কোন মতে সংসার চলিত ॥
প্রভাতে উঠিয়া শয্যা ছাড়িয়া কবীর।
দুই হাতে পদধূলি নিত জননীর ॥
শিরে দিতে দিতে তাহা সুধাইত ধীরে।
আজ কি মা আছে কোন অসুখ শরীরে ॥
যদি বুড়ী বলিত "না, আছি বাবা বেশ।"
না রহিত কবীরের মনে কোন ক্লেশ ॥
স্নান করি আসি নিজে রন্ধন করিত।
মাকে খেতে দিয়া শেষে আপনি খাইত ॥
লইয়া নুনের গলে হইত বাহির।
অপরাহ্নে পুনঃ গৃহে ফিরিত কবীর ॥
—যে দিন বলিত বৃদ্ধা "বড়ই যন্ত্রণা।"
সে দিন রন্ধনাহার কিছুই হ'ত না ॥
ছুটিত সে বৈদ্য বাড়ী কহিত তাহাকে।
"দয়া করে একবার দেখে যান মাকে ॥"
কবীরের ব্যাকুলতা হেরি বৈদ্যরাজ।
যাইতেন তার বাড়ী ছাড়ি অন্য কাজ ॥
দেখিতেন সযতনে মাকে পাগলের।
দিতেন ঔষধ সহ ব্যবস্থা পথ্যের ॥

* ওজন বিশেষ।



নিতেন না অর্থ কিন্তু পাইতেন যাহা।
দরিদ্রের আশীর্ব্বাদ—মহামূল্য তাহা ॥
কবীর ঔষধ পথ্য দিত জননীরে।
যাতনা থাকিলে তার যেতনা বাহিরে ॥
নিবারিতে মার কষ্ট সতত প্রয়াস।
পাখা হাতে দীর্ঘকাল করিত বাতাস ॥
অনেক সময়ে পুত্র করিত মাতার।
মল মূত্র আদি নিজ হস্তে পরিষ্কার ॥
শোয়া'তে, বসা'তে, মাকে করিতে যতন।
ভাবিত সে তাকে শিশু কন্যার মতন ॥
রাত্রিতে এমন ভাবে ঘুমা'ত কবীর।
জাগিত শুনিবা মাত্র শব্দ জননীর ॥
স্বজাতি বা দ্বিজ গৃহে নিমন্ত্রণ হ'লে।
কবীর যাইত সেথা জননীরে ব'লে ॥
দাঁড়াইত এক কোণে পাতা হাতে লয়ে।
কহিত কৃতীর কাছে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে ॥
জানেন ত মোর বুড়ী মা আছেন ঘরে।
দিবেন কি এক পাতা খাদ্য তার তরে?
দুই পাতা যদি পাই এক পাতা খাব।
অন্য পাতা মার তরে বাড়ী নিয়ে যাব ॥
এক পাতা যদি দেন নিজে না খাইব।
ঘরে নিয়ে মাকে দিয়ে প্রসাদ পাইব ॥
অনেকেই কবীরের অবস্থা জানিত।
খুসী হ'য়ে দুই পাতা খাদ্য তারে দিত ॥
এক পাতা বান্ধি বস্ত্রে রাখি স্কন্ধোপরে।
অন্য পাতা খেয়ে নিজে ফিরিত সে ঘরে ॥
এইরূপে মূর্খ পুত্র করে মাতৃ সেবা।
পাগলেরে এত ভক্তি শিখাইল কেবা ॥

নাহি ছিল কবীরের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান।
করিত সে সদাকাল মাতৃপদ ধ্যান॥
একদা আসিল মার অন্তিম সময়।
কবীর ছুটিয়া গেল বৈদ্যের আলয়॥
বৈদ্য আসি নাড়ী দেখি কহিলেন তাকে।
আর না ঔষধ দিতে হবে তোর মাকে॥
দুই চা'র দণ্ড আর রহিবে জীবন।
যদিও এখনো আছে জ্ঞান বিলক্ষণ॥
এত বলি লয়ে থলি বৈদ্য চলি যায়।
কবীর ভাবিল মনে কি করি উপায়॥
কেবা আছে আপনার কারে বা ডাকিব।
জননীকে নিয়ে নিজে গঙ্গায় যাইব॥
পর্ব্বদিনে মাকে নিয়ে যাই গঙ্গা স্নানে।
তীরস্থ তাঁহাকে আজি করিব সজ্ঞানে॥
ঘরে ছিল ঝুড়ি এক পাড়িয়া লইল।
কাপড়ে ভিতর ভাগ মুড়িয়া ফেলিল॥
শীর্ণ দেহ জননীরে বসাইয়া তায়।
শিরে তুলি কবীর জাহ্নবী তীরে ধায়॥
মুখে হরি হরি বোল চখে বহে জল।
যত দ্রুত পারে তত ছুটিল পাগল॥
আসিয়া শ্মশান ঘাটে নাবাইল ঝুড়ী।
মায়ের রয়েছে জ্ঞান চেয়ে আছে বুড়ী॥
সজল নয়নে বৃদ্ধা ঊর্দ্ধ মুখে চায়।
পদ ধুলি লয়ে পুত্র মাথে সর্ব্ব গায়॥
অর্দ্ধ নাভি করি মায় করায় শয়ন।
হরি নাম মহামন্ত্র করে উচ্চারণ॥
হেন কালে গ্রামে যারা সংবাদ পাইল।
স্বজাতি দু তিন জন ছুটিয়া আইল॥



বলে তারা "কি করিতে পারি মোরা বল।
ধন্য মাতৃভক্তি তোর ধন্যরে পাগল"॥
দেখিতে দেখিতে বুড়ী ত্যজিল জীবন।
কবীর শিশুর মত করিল ক্রন্দন॥
স্বজাতিরা সৎকারের ব্যবস্থা করিল।
চিতা ভস্ম জাহ্নবীর নীরে বিসর্জ্জিল॥
শূন্য মনে স্বভবনে ফিরিল কবীর।
না পারে পশিতে ঘরে নেত্রে বহে নীর॥
সান্ত্বনা করিতে এল প্রতিবেশীগণ।
লোকে পূর্ণ কবীরের দরিদ্র ভবন॥
কারে কি বলিবে ভাবি না পায় পাগল।
ভাব দেখি কাঁদে প্রতিবেশীরা সকল॥
পর দিন প্রাতে দেখে তৈলিক নন্দন।
নিরানন্দ পাগলের বন্ধু সর্ব্বজন॥
কত লোকে আনি দেয় আতপ তণ্ডুল।
কেহ দেয় গব্য ঘৃত কেহ ফল মূল॥
কুম্ভকার, মালসার মূল্য দিতে গেলে।
বলে ভাই দেখি নাই তোর তুল্য ছেলে॥
যেই ভাবে সেবা ভক্তি করেছিস মা'র।
তোর গুণ বলিবারে শক্তি আছে কার॥
হাতের জিনিষ মোর মালসা মাটীর।
এর দাম তোর কাছে না নিব কবীর॥
সকলের দয়া দেখি গলিল পরাণ।
উঠিল পাগল মনে ভাবের তুফান॥
সংযমে অশৌচ কাল করিয়া যাপন।
মাসান্তে করিল মার শ্রাদ্ধ সমাপন॥
মন্ত্র পড়িবারে গিয়া কাঁদিল কবীর।
ব্রাহ্মণ বলেন "তোর মার মুক্তি স্থির॥

" এই গঙ্গা মরি আমি " জ্ঞান যার থাকে।
পরকালে নাহি পড়ে সে কভু বিপাকে " ॥
মাসে মাসে যথা শাস্ত্র করি পিণ্ড দান।
বর্ষ শেষে সপিণ্ডীকরণ অনুষ্ঠান ॥
সব সারি ভাবে শেষে পাগল কবীর।
কেমনে গয়ায় পিণ্ড দিব জননীর ॥
একদা স্বজাতি এক ধনীর সন্তান।
তীর্থাদি দর্শন জন্য গয়া কাশী যান ॥
কবীর তাহারে গিয়া কহিল বিনয়ে।
সঙ্গে যদি লয়ে যান রব ভৃত্য হ'য়ে ॥
ধনী দেন অনুমতি চলিল কবীর।
ফিরিব না দেশে আর করিল সে স্থির ॥
ভদ্রাসন সহ তার বেচিল কুটীর।
গয়াধামে গিয়া পিণ্ড দিল জননীর ॥
বাপ, ভাই আদি বংশে যত মৃত ছিল।
বিষ্ণু পদে সকলের পিণ্ড সমর্পিল ॥
গয়া কার্য্য সারিয়া সে আসিল কাশীতে।
বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা পাইল দেখিতে ॥
পাগল সপ্তাহ কাল কাশীধামে ছিল।
সামান্য পীড়ায় শেষে জীবন ত্যজিল ॥
শাস্ত্রে উক্তি, মাতৃভক্তি মুক্তির কারণ।
মূর্খ কবীরের মোক্ষ কে করে বারণ ॥
শান্তিপুরে ধনী, মানী, জ্ঞানী বহুজন।
কবীর পাগলে আজো করে স্মরণ ॥
বলেন সকলে হেন সরল পরাণ।
সুদুর্লভ মর্ত্তধামে পুত্র ভক্তিমান ॥
হায়! আমি শিক্ষিত, পড়েছি কত বই।
নিরক্ষর কবীরের সমকক্ষ নই ॥



কবীর যে ভাবে সেবা করিয়াছে মার।
করি নাই শতাংশের একাংশও তার ॥
তার মত পাগলের দেখা যদি পাই।
পায়ে ধরি বিন্দু মাত্র ভক্তি ভিক্ষা চাই * ॥

শ্রীঃ—

# সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্।

[ ২ ]

তাঞ্জোর ষ্টেসনে পঁহুছিয়া শুনিলাম আচারী ব্রাহ্মণের রন্ধন, প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন পাওয়া যায়। কৌতুহলী হইয়া ঐ সন্ধানে গেলাম। জিজ্ঞাসা করায় একজন ব্রাহ্মণ বলিল, গাড়ীকে আগে বলিয়া দিতে হয় তবে আমরা প্রস্তুত করি। " হালুয়া " লোকে কিনিয়া খাইতেছে। মান্দ্রাজ বিভাগের হালুয়া বিধাতার সৃষ্টির একটি রহস্য। মিষ্টতা ত নাই-ই, আছে পেঁয়াজ মিশান ও তস্য রস মিশান। দুর্গন্ধ ও তাতে কোনও স্বাদ নাই। যে সকল বাঙ্গালী আস্বাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারা একবারে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিলেন। আর লঙ্কার ছড়াছড়ি, সবই ঝাল। দধিতে পর্য্যন্ত লঙ্কা।

আহারের কোন উপায় নাই, লুচী সন্দেশ মিষ্টান্ন সে ত স্বপ্নের কথা, কেবল মিলিতেছে কদলী। দগ্ধানলে কদলী ( অবশ্য দগ্ধ কদলী নহে ) দিলাম। হঠাৎ মনে হইল নামিয়া সহর দেখি। গাড়ী তখন ছাড়ে

* মূর্খ পুত্রের মাতৃ ভক্তির দৃষ্টান্ত বঙ্গে বিরল নহে। গত ১৩১৪ সালে অর্দ্ধোদয় যোগের সময়ে এক দরিদ্র কৃষক চলৎশক্তিরহিতা জননী গঙ্গা স্নানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অর্থাভাবে যান সংগ্রহ করিতে না পারায় মাকে স্কন্ধে লইয়া কয়েক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া ত্রিবেণীর ঘাটে আসিয়াছিল মুগ্ধ দর্শক এই কথা সেই সময়ে " বঙ্গবাসী " তে পত্রস্থ করিয়াছিলেন।
লেখক।

ছাড়ে। তাড়াতাড়ি জিনিষ পত্র নামাইয়া লইলাম ও ষ্টেসনের বাহিরে একটি হিন্দু হোটেলে গিয়া বাসা লইলাম। তাহারা অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিতে অস্বীকার করিল। বলিল, এ বেলার রান্না শেষ হইয়াছে, আবার সন্ধ্যার পর একবার রান্না হইবে। নিকটস্থ দুই একটি হোটেলে অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু সকল ছাগলের সেই এক রা। জলযোগ করিবার উপায় নাই। যাহা কিছু আছে সবই আমাদের পক্ষে অখাদ্য, আর সেই শ্রীমান হালুয়া পিতলের থালে স্বকীয় শোভা বিস্তার করিতেছেন, সুতরাং অগত্যা জিনিষ পত্র হোটেলে রাখিয়া অনশনে—অনশনে বই কি, দুই চারিটা কদলী আর কি করিবে?—সহর ভ্রমণে বাহির হইলাম। ঘোড়ার একা না পাওয়ায় গরুর একা অগত্যা লইতে বাধ্য হইলাম। একা ছাড়িল —আমরা তিন প্রাণী একার কুক্ষিগত হইলাম।

সহরের রাস্তাগুলি খুব বড় বড়, কিন্তু লোকের বাস অল্প বলিয়াই বোধ হইল। যে রাস্তায় গিয়াছিলাম সেইটিতে সাহেবদের ক্লব বাড়ী প্রভৃতি দেখিলাম। যেন সহরটি মৃত—অথবা নিদ্রিত, কোন গোলযোগ নাই। লোকে পথ চলিতেছে কিন্তু কথা কহে না। যেন ইন্দ্রজালের প্রভাবে কাহারও কথা কহিবার শক্তি নাই। খানিক দূরে গিয়া টেম্পল বা মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। দক্ষিণ ভারতবর্ষের মন্দির এই প্রথম দেখিলাম। ইহার বর্ণনা করিতে গেলে পূর্ণিমার কলেবরে কুলাইবে না। তবে যতটুকু পারি —এক নিশ্বাসে রামায়ণ স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

মন্দিরটি এত বড় যে ভিতরে অনায়াসে একটি বড় গ্রাম থাকিতে পারে। ইহা মন্দিরকে মন্দির, কেল্লা কে কেল্লা। চতুর্দ্দিকে গড়খাদ, জলপূর্ণ হইলে একটি ছোট খাট নদী। গড়ের উপরই প্রাচীর—পাথরের। তাহাতে কাল কাল গোলার দাগও রহিয়াছে। পরস্পর বিপরীত দিকে দুইটি তোরণ বা সিংহ দ্বার। আমরা যেটি দিয়া প্রবেশ করি সেটিতে পর পর ৫টি বড় দরজা আছে (৫ কি, ভুলিয়াছি) ৫ দেউড়ী আর কি। এই ৫ দেউড়ীর উপর একটি ২০।তোলা উচ্চ রথ। পাথরের গাঁথনী—রথের আকারে। ইহাই অস্ত্রাগার ছিল ও এইখান হইতেই যুদ্ধের সময় গোলন্দাজ সৈন্য অস্ত্রযুদ্ধ করিত। বন্দুক, কামান, তীর প্রভৃতি ছুড়িবার সব পথ রহিয়াছে। যোদ্ধার



লুকাইবার স্থানও আছে। এই সকল তোরণের গাত্রে নানা দেব দেবীর ছবি। ৫ দেউড়ীর পর আমাদের জুতা খুলিয়া যাইতে হইল। সমস্ত মন্দিরের তলা পাথর দিয়া বাঁধান।

মন্দিরের মধ্যে ছোট ছোট মন্দির অনেক। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন দেব মূর্ত্তি সব আছে। মন্দিরে বড় বাগান আছে, বৈঠকখানা আছে, আবাস স্থান আছে। যাহারা মন্দিরের দেবতার নিকট নৃত্য গীত করে তাহাদিগকে দেবদাসী বলে। তাহারা দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত—তাহারা বিবাহ করিতে পায় না—তাহারা চিরকুমারী। মন্দিরে দেবদাসীগণের বাসস্থান আছে। আর প্রকাণ্ড নাট মন্দির প্রত্যেক দেব মন্দিরের সম্মুখে আছে—সেখানে বৈঠক হয়, মজলিস মাইকেল হয়, গান বাজনা, ধর্ম্মকথা, বসা-দাঁড়া এই সবও হয়। সব আসবাব আছে, বিছানা, মাদুর, তাকিয়া, লণ্ঠন, ছবি। আমরা সমস্ত মন্দির ভ্রমণ করিতে সাবকাশ পাই নাই।

প্রথমেই খানিকদূর আসিয়া একটি উচ্চ বেদীর উপর একটি প্রস্তরের ষাঁড় দেখিলাম। ইহারই নাম সাহেবেরা রাখিয়াছেন Sacred Bull of Tanjore. ইনি জগৎ বিখ্যাত। আকৃতিতে বসিয়া আছেন। জিহ্বা দিয়া উপরের ওষ্ঠ চাটিতেছেন, তাহাতে নাসিকার গোলে জিভ আসিয়া পঁহুছিয়াছে। অত বড় ব্যাপার কিন্তু এমনই কৌশলে নির্ম্মিত যে দেখিলে যেন জীবন্ত বা স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। কেবল শরীরটি কৃষ্ণ পাথরের একটি ব্লক বা টুকরা বা খণ্ড নহে, বেদী প্রভৃতি সমস্তই একটি ব্লক। ষাঁড়ের ওজন কত ভুলিয়া গিয়াছি—রেলওয়ে গাইডে পাইতে পারেন। ওজন কিছু কম ৮০০ টন। আটশত টন। এক টন অর্থাৎ সাতাইশ মণ। ব্যাপারটা কি বুঝুন। এ ব্যাপার ভারতে এক সময়ে নিত্য কর্ম্মের মধ্যে ছিল। এরূপ ইঞ্জিনিয়ারিং যেখানে সেখানে। ষাঁড়ের গাত্র মসৃণ—তৈল সাহায্যে এই মসৃণতা সম্পাদিত হয়। ঐখানে আর একটি ব্যাপার আছে—একটি বৃহৎ পিতলের দোদুল্যমান ঘণ্টা।

আমরা যখন হাঁ করিয়া ষণ্ড দেখিতেছিলাম, তখন তথা আসিলেন এক দল সাহেব বিবি। ইঁহাদের দেশ আমেরিকা বা মার্কিণ মুলুক। আমাদের এ অঞ্চলে সদা সর্ব্বদা ভ্রমণকারী দেখা যায় না, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ-

কারীর দল সর্ব্বদা দেখা যায়। ইহারা আসেন য়ুরোপ বা আমেরিকা হইতে, অষ্ট্রেলিয়া বা জাপান হইতে। রেল কোং ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য অনেক বন্দোবস্ত করিয়াছেন। বড় বড় ষ্টেসনে আহারের ব্যবস্থা ত আছেই, তা ছাড়া শয়নের ব্যবস্থাও আছে। সাহেবদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট, আর চাই কি? আর আমাদের কপালে হালুয়া ও লঙ্কা।

আমাদের পথ প্রদর্শক আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া মার্কিণ মুলুকের মানুষদের সঙ্গে জুটিয়া গেল। তাহারা অবলীলাক্রমে জুতা পায়ে দিয়া চলিল। আর আমরা গালে হাত দিয়া শুধু পায়ে অদৃষ্ট ভাবিতে লাগিলাম। পরে দূর হইতে শ্রীযুক্ত ভূপেন বসু মহাশয় ও তাঁহার দলকে দেখিয়া তারস্বরে জুতা খুলিতে নিবারণ করিলাম। তাঁহারা জুতা না খুলিয়াই আসিলেন। আমাদের কতকটা রাগ পড়িল। আমাদের বৃদ্ধ দাদাটি মার্কিণ মহিলাগণের সহিত খুব মিশিয়া গেলেন ও হাত মুখ নাড়িয়া কত কথা বুঝাইতে লাগিলেন। আর মধ্যম দাদাটি ও আমি একটি দেবালয় দেখিয়া আর একটি দেবালয় দেখিতে গেলাম। দেবালয় দেখিতে হইলে বা দেব দর্শন করিতে হইলে জুতা খুলিয়া যাইতে হয় কি না? আমরা এমনই করিয়া জুতা খোলাটা কাজে লাগাইয়া দিলাম। আমরা ছোট দেবালয়ের সুমুখের লাট মন্দিরে গিয়া দেখিলাম, একটা ময়ূর বসিয়া আছে। সে আমাদিগকে সমালোচন করিল বটে, কিন্তু ত্যাগ করিল না। আমরা অবাক্ হইয়া দেখিলাম প্রাচীর গাত্রে লিখিত তাঞ্জোর রাজাবলীর প্রতিকৃতি। প্রত্যেক ছবির নিম্নে এত সাল হইতে এত সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব—এই সাল ইংরাজী ও তামিল ভাষায় লিখিত।

বৈঠকখানার বর্ণনা আর করিব না। বোধ হয় সব স্বদেশী। ভূপেন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবদাসীর দর্শন পাইয়াছেন" আমি শিরশ্চালনে 'না' বলিলাম, বলিলাম, দুপুর বেলা তাঁরা আসেন না। রজনীতে ঠাকুরের শিঙ্গার বেশ হইলে, তাঁহারা নৃত্য গীত করিয়া বাবা ভোলানাথকে সন্তুষ্ট করেন। বলিতে ভুলিয়াছি, ক্রমাগত বৃষ্টি হইতেছিল, তাহাতে মন্দিরের উঠানের পাথরে পিছল হওয়ায় চলা ফেরার বড়ই অসুবিধা হইতেছিল। ক্রমে জল বেশী আসিল, আর ভেজা অনুচিত মনে করিয়া তোরণে ফিরিয়া



আসিলাম। তখন গাইড মহাশয় মার্কিণ-মহিলা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়া তোরণগাত্রে বস্ত্রহরণের খোদিত লীলা দেখাইলেন। আমরা দেখিয়া নিতান্ত আশ্চর্য্য হইলাম। এ দিকে শ্রীরামের প্রাধান্য ও শ্রীসদাশিবের প্রাধান্য। শ্রীকৃষ্ণ ব্যাপার খুবই কম। তুলনায় রামানুজের ব্যাপার খুবই কম। তাই আশ্চর্য্য হইলাম। নরসিংহ মূর্ত্তির ও যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপারই সব ছবিতে প্রকাশ। নূতন ভাবের ব্যাপার মধুর রসের ব্রজ লীলার বস্ত্র হরণ কি করিয়া এখানে আসিল তাই ভাবিতে লাগিলাম। জিজ্ঞাসায় জানিলাম শ্রীকৃষ্ণের লীলার আর কোন ব্যাপার মন্দিরের কোথাও নাই। তবে কি ওটা বস্ত্রহরণ ব্যাপার নহে?—ইহাও আমাদের মনে জাগিয়াছিল। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ ইহার কোনরূপ মীমাংসা করিতে পারেন ত করিবেন—আমরা কিন্তু অপারগ।

মন্দির ত্যাগ করিবার সময় দেখিলাম অযোধ্যার বৃদ্ধ গঙ্গাপ্রসাদ—এডভোকেট পত্রের সম্পাদক ও ডাক্তার ভালচন্দ্র। আরও অনেক লোক তখন বুঝিলাম, হিন্দুয়ানীর দল তাঞ্জোরে নামিয়া আমাদের মত আহারের ব্যাপারে ঠকিয়াছেন। কাহারও কাহারও মুখে এমনও শুনিলাম "ভ্রমণ করিতে হইলে— হিন্দুয়ানী চলে না।" কথাটা একেবারে সত্য নয় কি করিয়া বলিব? যখন ষ্টেসনে এক গ্লাস পানীয় জল পর্য্যন্ত পাইবার যো নাই। কেহ কাহারও ছোঁয়া জল খায় না, খাবার খায় না, তাই ষ্টেসনে খাবারও পাওয়া যায় না। আর পানী পাঁড়ের বালাই নাই। ব্রহ্মের ন্যায় কেবল "হালুয়া" মান্দ্রাজ জগৎ ব্যাপিয়া আছেন।

মন্দির ত্যাগ করিয়া ভিজিতে ভিজিতে রাজ-প্রাসাদ অভিমুখে চলিলাম। মল্লার গাহিতে নাচিতে নাচিতে আমাদের একা অগ্রসর হইতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সহরটি যেন ঘুমাইতেছে। জীবনী শক্তির বিকাশের কোন চিহ্ন নাই, লোকই দেখা যায় না। তবে মানুষ যে আছে বুঝা যাইতেছে—দুই পাশে দোকানে Happy New Year, new year, Welcome প্রভৃতি লেখা। সে দিন ১লা জানুয়ারি। এক স্থানে লেখা Post Office. কই সেখানেও ত ভিড় নাই। শুনিলাম একটি হোটেল—গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম খাবার কোন যোগাড় হইতে পারে। অম্লান বদনে বলিল "না"।

মনে করিলাম এ সব বেশ—হোটেল বটে, অথচ খাবার দেয় না। যাহা হউক এই সকল বিষয় তর্ক করিতে করিতে রাজ-প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইটা শেষ রাজার দরবার, এইটা বড় রাজার দরবার ছিল, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন "হল" সাজান রহিয়াছে। রাজা যখন দরবার করিতেন, তখন যেরূপে বসিতেন, সেই ভাবটা দেখান হইয়াছে। তবে পুরাতন জিনিষের সঙ্গে এখনকার নূতন জিনিষও স্থান পাইয়াছে। আমরা এইরূপ ৩। ৪টি দরবার গৃহ দেখিয়া ও অস্ত্রাগার দেখিয়া, একটি স্বতন্ত্র দরবার ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এটি খুব বড়। বলিতে ভুলিয়াছি, এক একটি স্বতন্ত্র বাড়ীতে এক একটি দরবার ভবন। হলে রাজাদের প্রমাণ ছবিগুলি রহিয়াছে। মন্দিরে যে সকল রাজাদের নাম ও রাজত্ব কাল পাইয়াছিলাম এখানে তাঁহারাই বিরাজ করিতেছেন। অনেক দিন হইল, আমি রাজাদের নাম গুলি ভুলিয়া গিয়াছি। পাঠক মহাশয় ইতিহাস খুলিলেই পাইতে পারেন। শিবাজী বংশের একটি শাখা এই তাঞ্জোরে রাজত্ব করেন। শিবাজীর পিতা হইতে আরম্ভ করিয়া মনে হয় সাত জন রাজার ছবি দেখিয়াছিলাম। একজন রক্ষক আমাদিগকে খুব সম্মানের সহিত আহ্বান করিয়া একটি বড় কাটের আলমারির নিকট লইয়া গেল। আলমারি খুলিয়া দুইটি মনুষ্যের নর-কঙ্কাল দেখাইল। আমরা চমকাইয়া উঠিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপার কি? নর কঙ্কাল দুইটি সম্পূর্ণ—কোথাও কোন অস্থির অভাব নাই, আপদ মস্তক সব ঠিক আছে, রক্ষক বলিল, ইহার একটি স্ত্রী মূর্ত্তি, অপরটি পুং মূর্ত্তি। ইহারা স্ত্রী পুরুষ। বাল্য কালে শিবাজী ঐ স্ত্রী-লোকের স্তন্য পান করিতেন। কি মনে করিয়া বলা যায় না, শিবাজী স্বীয় ধাত্রীর ও তাহার স্বামীর নর কঙ্কাল রক্ষা করিতে আদেশ দেন। সেই আদেশ অনুসারেই এ নর কঙ্কাল দুইটি সযতনে রক্ষিত হইয়াছে। ইতিহাসে একথা প্রকাশ আছে কি না জানি না। তবে চক্ষে যাহা দেখিয়াছি ও কর্ণে যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। প্রত্নতত্ত্ববিদের ন্যায় বা ইতিহাস লেখকের চক্ষে খুঁটি নাটী করিয়া দেখি নাই, তবে মোটামুটি দেখিয়াছিলাম। শেষ রাজা ইংরেজের হস্তে রাজ্য ভার দিয়া নিজে পেন্সন লইতে স্বীকার করেন। তাঞ্জোরের নাম দক্ষিণ ভারতবর্ষের উদ্যান। রাজা



কি কারণে এই উদ্যান ত্যাগ করিলেন, তাহার অর্থ বিধিই জানেন। এক্ষণে রাণীজীরা আছেন ও নাবালক পুত্র একটি আছেন। তাঁহাদের রাজ-বংশ বজায় রাখিয়াছেন—লোপ হইতে দেন নাই। এই রাজবংশীয়েরা এই বাটীতেই বাস করেন, তবে তাঁহাদের আবাস-খণ্ড একটি স্বতন্ত্র বাটী। তাঁহারা বৃটিস রাজের নিকট রাজনৈতিক পেন্সন পান ও তাহাতেই তাঁহাদের দিন গুজরান হয়। শুনিলাম একটি সাহেব ম্যানেজার আছেন, তাহাতে বোধ হয় জমীদারীও আছে। আর একটি সাহেব রাজপুত্রকে শিক্ষা দান করেন। এই রাজপুত্রের পিতার নাম কি ছিল, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

আমরা যখন দেখিতেছিলাম সেই সময়ে মার্কিন ভ্রমণকারীরদল আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাদের অত্যন্ত সমাদর দেখিলাম।

নগর ভ্রমণ করিয়া আমরা আমাদের বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। তাঞ্জোর দেখিয়া তৃপ্তি হইল না।

এইবার দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে মন দিলাম। শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

# কাব্যে ইতিহাস।

## পরবর্ত্তী যুগ। *

[ ষোড়শ—অষ্টাদশ শতাব্দী। ]

রাজ্যের কথা;—

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম কাব্য কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল। চণ্ডীকাব্য যখন লিখিত হয়, তখন বাঙ্গালায় মানসিংহ রাজত্ব করিতেছেন। তাঁহার সময়ে মামুদ সরিপ নামে একজন 'ডিহিদার' ছিলেন। তাঁহার উৎপীড়নে দেশের লোক বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এ কথায় আমরা এমন বলিতেছি না, যে প্রত্যেক মুসলমান নৃপতিই—দেশীয় লোকের প্রতি অত্যাচার করিতেন, কিন্তু সাধারণতঃ মুসলমান অধিকারে হিন্দুর অন্ন সংস্থান ক্রমে নষ্ট হইয়া আসিতেছিল, ও উৎপীড়নে দেশশুদ্ধ আতঙ্ক জন্মিয়াছিল; এবং ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের শিখা নিবিয়া আসিতেছিল।

*. কবিকঙ্কণ, রামেশ্বর, ঘনরাম, কাশীদাস, ভারতচন্দ্র।

রাজদরবারে,—দেওয়ান, আমীন, বক্সী, মুনসী, দপ্তরী, খাজাঞ্জী, মুহুরি, চোপদার, ঘড়িয়াল প্রভৃতির নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

ঘড়িয়াল ঠন্ ঠন্ বাজাইছে ঘড়ি।
চোপদার সুমুখে দাঁড়ায় লয়ে ছড়ি॥
দেওয়ান আমীন বক্সী মুনসী দপ্তরি।
খাজাঞ্জী নিযুক্ত কৈলা বিবেচনা করি॥
সহবতী হিসাব নিকাশ বাজে দফা।
মুহুরির রাখিল হিসাব করি রফা॥
ফরমান মত সব সনন্দ লিখিয়া।
মফস্বলে নায়েব দিলেন পাঠাইয়া॥—পৃঃ ১৫৩ অ ম

পাত্র মিত্র সভাসদ বসিয়া সভায়।
ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মৌরছল্ল।
গোলাম গদ্দিসে খাড়া পোলাম সকল॥
পাঠক কথক কবি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য গুরু পুরোহিত॥
সমুখে সব কাতার কাতার।
যোড়হাত বুকে ধরে ঢাল তলোয়ার॥
ঘড়িয়াল দুইপাশে বাজাইছে ঘড়ি।
সারি সারি চোপদার হাথে হেমছড়ী॥
মুসাহেব বসিয়া সকল বরাবর।
মুনসী বখশী বৈদ্য কানগোই কাজী।
নটী কালোয়াত গান গায় নানা রঙ্গে॥
ভাঁড়ে করে ভাঁড়াই নর্ত্তকে নাচে গায়।
নকীব সেলাম গাহে সেলাম জানায়॥
উজ্জ্বল কজ্জল বাস হাবসী জল্লাদ।
আশাওল মল্ল ঢালী চেলা খানে বাদ॥
সমুখে ফিরায় ঘোড়া চাবুক সোয়ার।
মাহুত হাতীর কাঁধে জানায় জোহার॥—১১৭ অ ম



মায়েবই মফস্বলে রাজার ন্যায় কার্য্য করিতেন; তাঁহার অধীনে কোটালাদি সকলকেই থাকিতে হইত।

কর সংগ্রহাদি,—

কর সংগ্রহের কাজ ডিহিদার করিতেন। ডিহিদার মাত্রেই যেন একটু অত্যাচারী। কোন স্থানে কর আদায় না হইলেই সেই স্থানে ডিহিদার প্রেরিত হইত, এবং খাজনা 'বকেয়া' পড়িলে গৃহস্থের বাড়ী পর্য্যন্ত দখল হইত।

খন্দে নাহি দিব বাড়ী, রহে বসে দিহ কড়ি,
ডিহিদার নাহি দিব দেশে॥—৮৪ ক, ক, চ

খাজনা প্রতি মাসের প্রথমেই দিতে হইত *;— না দিতে পারিলে অতিশয় কষ্টভোগ করিতে হইত। এমন কি কোটালের নিকট বন্দী থাকিতে হইত;

বুলান মণ্ডল বলে শুন মোর ভাই।
হাজিল ক্ষেতের শস্য তাহে না ডরাই॥
মসীল করিবে রাজা দিয়া হাতে দড়ি।
প্রথম মাসেতে চাহি এক তেহাই কড়ি॥—৮৩ ক, ক, চ

সুতরাং খাজনা আদায়ের দুই প্রকার প্রথা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে:— এক প্রতি মাসেই দিতে হইত;—আর এক তিন মাস অন্তর দিতে হইত।

ক্ষেত্রে ভাল ধান হইলে, সেই ধানের কিছু অংশ রাজাকে দিতে হইত; কখনও কখনও রাজা স্বয়ং সেই ধানগুলি বিক্রয় করিয়া লব্ধ টাকা আত্মসাৎ করিতেন।

যত বেচ ভাল ধান তার না লইব দান,
অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে॥—৮৪ ক, ক, চ,
গরিবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা।
বাব ক'রে সকল বেচিয়া লয় রাজা॥—৬৮ শিবায়ন।

গ্রামগুলি তালুকে বিভক্ত থাকিত। এই তালুকদারগণ 'নিয়োগী' 'চৌধুরী' প্রভৃতি উপাধি পাইতেন। তালুকের খাজনা আদায়, ছোট ছোট দোষের বিচার, আবশ্যক হইলে গুরুতর দোষের জন্য দোষীকে গ্রেপ্তার প্রভৃতি কার্য্য করিবার ক্ষমতা জমিদারের থাকিত। তিনি সময়ে সময়ে সুবাদারের সহিত

* মাসে মাসে বেবাক পাঠাবে হরশাল।—ধ, ম, পৃঃ ৪১

পরামর্শ করিয়া কাজ করিতেন। এখনকার জমিদার বলিলে যাহা বুঝায় তখনকার জমিদার বলিলে তাহা বুঝাইত না। তখন জমিদারগণ অধীনস্থ রাজার ন্যায় চলিতেন, এবং টোডারমল্লের কর সংগ্রহের আইন করিবার পূর্ব্বে, তাঁহারা সম্রাটকে নিজেদের ইচ্ছামত কর দিতেন। তাঁহাদের রাজধানীকে 'সহর' বলিত; এবং তাঁহারা গড়বেষ্টিত হইয়া বাস করিতেন। এই যুগে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার, সহর, ও গড়ে বাঙ্গালা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কবিকঙ্কণে গোপীনাথ নন্দী এইরূপ জমিদার ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগকে অনেক নিষ্কর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সময়েই বোধ হয় টোডারমল্লের কর সংগ্রহের আইন প্রচলিত হয় *। তাঁহার খাজনা দিতে বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া ডিহিদার মামুদ সরিপের হস্তে বন্দী হন। রায়জাদা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের নিষ্কর ভূমি কাড়িয়া লইলেন বলিয়া কবির নিকট "ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি" এইরূপ আখ্যা পাইলেন।

পুলিশ,—

মুসলমান সময়ে পুলিশের অত্যাচার অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠিয়াছিল; তাহাদের দৌরাত্ম্যে লোকে যার পর নাই উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হয় ত এমন হইয়াছে, যে পুলিশ কোন লোককে এরূপ ভাবে প্রহার করিতেছে, যে তাহা দেখিয়া লোকে স্থির থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রাণের দায়ে লোককে তাহাও সহ্য করিতে হইত:—

ঠড় ঠড়ি হাড়ির কোড়ার পট পটী।
চর্ম্ম উড়ে চর্ম্ম পাদুকার চট চটী॥
কেহ বা দোহাই দেয় কেহ বলে হায়।
কেহ বলে বাপ বাপ মরি প্রাণ যায়॥
কোটালের ভয়ে কেহ নাহি করে দয়া॥—পৃ ৭৮ অ, ম,

আবার এমনও হইত, যে পুলিশ স্বয়ং চুরি ডাকাতি করিয়া দেশের লোককে উত্যক্ত করিত;—আপনি ডাকাতি করি প্রজার সর্ব্বস্ব হরি,
হয়েছিস দ্বিতীয় ধনেশ।—১০৮ অ, ম,

কোথাও চুরি হইলে প্রথমে কোটালেরা দেখিত সেখানে কোন সন্ন্যাসী,

* ১৫৭৫—১৫৮৩ খৃঃ অব্দ—Vide Ayin Akbari pp 351-352.



সওদাগর বা ছাত্র আছে কিনা; যদি থাকে তবে প্রথমে তাহাদিগকে অত্যন্ত কষ্ট দিত, পরে অন্যের কথা;—

উদাসীন বেপারী বিদেশী যারে পায়।
লুটে লয়ে বেড়ি দিয়া আটকে ফেলায়॥
বিশেষতঃ পড়ো যদি দেখিবারে পায়।
খুঙ্গী পুথি লইয়া ফাটকে আটকায়॥—১১০ অ, ম,
প্রবাসী পুরুষ আজি পাব যার ঘরে।
না দেখি নিস্তার তার রাজার হুকুম॥—৪১৭ ধ, ম,

এই গেল অত্যাচার ও পুলিশের বিচারের কথা। তার পর পুলিশের ঘুষ লওয়ার কথা। পুলিশ ঘুষ লইয়া দোষীকে ছাড়িয়া দিত;—

ধুতি খায়্যা বুল বেটা কোটাল আমার। ৯২ ক, ক, চ,
ধুতি খেয়ে ছেড়ে দিল মালিনী পলায়॥—১১৮ অ, ম,

রাজধানীতে পুলিশের এইরূপ উপদ্রব। তুলনায় বুঝিতেই পারা যাইতেছে মফস্বলে কিরূপ; সেখানে যথেচ্ছ ব্যবহার করিত:—

হাতে কড়ি পায়ে বেড়ি তোক দড়ি গলে।
প্রজারে না পালি পীড়া দাও মফস্বলে॥—৪০ ধ, ম,

যুদ্ধ বিগ্রহ, শান্তি অশান্তি;—

ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, যে আকবর প্রথমে এদেশে যুদ্ধে কামান ব্যবহার করেন। তিনি ষোড়শ শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। আমাদের ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম কাব্য কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে প্রথম কামানের উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহার পূর্ব্বে আর কোন কাব্যে কামানের উল্লেখ লক্ষিত হয় না।

শত শত মত্ত হাতী, লৈয়া আইসে সেনাপতি,
শুণ্ডে বান্ধা লোহার মুদ্গরে।
মাহুত হাতীর পিঠে, শেল সাবল জাঠে,
গগণ পুরয়ে আড়ম্বরে॥
ভিন্দিপাল খরশান, তবক বেলক বাণ,
ভুষণ্ডী ডাঙ্গস গদাধারী॥—৯৪ ক, ক, চ,

তবক বেলক কাছে কামান কৃপাণ।
পৃষ্ঠদেশে তূণেতে পূর্ণিত কৈল বাণ॥—৯৫ ক, ক, চ

যুদ্ধযাত্রায় ধর্ম্মমঙ্গল—রায় রেঁয়া বার ভুঁয়া মীর মিয়াগণে।
তুরগী তুরঙ্গে কেহ এরাগী বারণে॥
হাতী ঘোড়া উঠ গাড়ী সিপাই ফরিক।
ধানুকী বন্দুকী পলি পাইক পদাতিক॥
তিন লক্ষ তাজাতাজি তুরগী তুরঙ্গ।
উন লক্ষ রণদক্ষ জুবারু মাতঙ্গ॥
অপর টাঙ্গন টাটু ঢালী ফরিকার।
একাযুত বেলদার বেগারি আগে ধায়।
উঁচু নীচু কুপথ সুপথ করে যায়॥
তবে তাঁবু কানাৎ তৈলাত চলে ডেরা।
চলিল হাতীর পৃষ্ঠে, নিশান নাগরা—৫৭-৫৮ পৃঃ ধ, ম,
হুড় হুড় হুড় হুড় রণে ছুটিল কামান।—৭৬৮ ধ, ম
ঘোড়া উঠ হাতী পিঠে নাগরা নিশান।
গাড়ীতে কামান চলে বান চন্দ্রবাণ॥
হাতীর আসারী ঘরে বসিয়া আমীর।
আপন লস্করে লয়ে হইল বাহির॥
আগে চলে লাল পোশ খাসবরদার।
সিপাই সকল চলে কাতার কাতার॥
তবকী ধানুকী ঢালী যায় বেঁশে মাল।
দফাদার জমাদার চলে সদাগাল॥
আগে পাছে হাজারীর হাজার হাজার।
নটী নট হরকরা উরুত্ বাজার॥
শানাই কর্ণাল বাজে রাগ আলাপিয়া।
ভাট পড়ে বার বার যশ বর্ণাইয়া॥
ধাড়ী গায় কড়খা ভাঁড়াই করে ভাঁড়।
মালে করে মালাম চোয়ড়ে লোকে কাঁড়॥



যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া;—থানা দিলা চারিদিকে মুরুচা করিয়া॥
শিষ্টাচার মত আগে দিলা সমাচার।
পাঠাইয়া ফরমান, বেড়ী তলবার॥—১০১ অ, ম,

মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বেড়ী তলবার পাঠাইলেন; প্রতাপ, তলবার লইয়া বেড়ী ফিরাইয়া দিলেন। এইরূপ যুদ্ধের পর অধিকৃত দেশে বিজেতা রাজার নিশান প্রোথিত করা হইত।

গড়ে গাড়ে গৌড় পতি রাজার নিশান।—৬৯১ ধ, ম,

এই গেল যুদ্ধের কথা। হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার মুসলমান রাজার রাজ্যের প্রারম্ভ হইতেই সমান ভাবে চলিয়াছিল। হিন্দুর জাতি লওয়া মুসলমানদের একটী অতি গৌরবের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। হিন্দুর প্রতি মুসলমানের অত্যাচারে রাজারাও যোগ দিতেন। মুসলমান রাজার একটী আইন ছিল এইরূপ;—"যদি হিন্দু প্রজা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর দিতে অশক্ত হন, তবে মুসলমান শাসনকর্ত্তা ইচ্ছা করিলে তাহার মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতে পারেন; এবং ইসলাম ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য হিন্দু প্রজা ঘৃণা না করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য *"—ইত্যাদি আইন দ্বারা কত হিন্দুর যে ধর্ম্মনাশ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এইরূপ অত্যাচারের কাহিনী প্রাচীন সাহিত্য ভাণ্ডারে প্রচুর পরিমাণেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের উপর অধিক পরিমাণে অত্যাচার করা হইত। দেবতার মন্দির ভাঙ্গিয়া নানামতে অনাচার করিয়া হিন্দুদিগকে অতিশয় ব্যতিব্যস্ত করা হইত;—

* When the collector of the Dewan asks them ( the Hindus ) to pay the tax, they should pay it with all humility and submission and if the Collector wishes to spit into their mouths, they should open their mouths without the slightest fear of contamination, so that the Collector may do so. ( Vide Neors Akbor. )

ভারতচন্দ্রের কাব্যেও এইরূপ নিষ্ঠীবন ত্যাগের কথা দেখিতে পাওয়া যায়—

ন হয় সুন্নত দেকে, কলমা পড়াও লেকে,
জাতি লেউ খেলায়ে থুক।—১৩৯

যত দেবতার মঠ, ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ,
নানামতে করে অনাচার।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পায়, থুথু দেয় তার গায়,
পৈতা ছেঁড়া ফোঁটা মোছে আর॥—১৩৯ অ, ম,
জাউ যায় জাতি যদি যজায় যবনে।—৪১৯ ধ, ম,

এতদ্ভিন্ন মুকুন্দরামের কাব্যে ডিহিদারের যেরূপ উৎপীড়ন বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করিলে শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়;—

উজীর হল্য রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া,
নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥
সরকার হৈলা কাল, খিলভূমি লেখে লাল,
বিনা উপকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হইল যম, টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি॥
ডিহিদার অবোজ খোজ, কড়ি দিলে নাহি রোজ,
ধান্য গরু কেহ নাহি কিনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইলা বন্দী,
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে॥
পেয়াদা সবার কাছে, প্রজারা পলায় পাছে,
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজা হৈল ব্যাকুলী, বেচে ঘরের কুড়ালী,
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা॥—৬পৃঃ ক, ক, চ

এইরূপ অত্যাচারে কত গৃহস্থের বাস উঠিয়াছে, কত রমণীর, কত হিন্দুর জাতি গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। দেশময় এইরূপ অশান্তি অত্যাচার নিয়তই বিরাজমান ছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

243-1, Upper Circular Road,

আষাঢ়, ১৩১৬।

# সমাজের উপর সাহিত্যের প্রভাব। *

[১]

এত দিনে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি স্থায়ী ভাণ্ডার হইয়াছে। এই সাহিত্য-ভাণ্ডারের অধিকাংশ রত্নই প্রাচীন ও আধুনিক কতকগুলি কাব্য এবং আজকালকার বহুবিধ উপন্যাস ও নাটক। ইতিহাস, জীবনী প্রভৃতি পুস্তক এখনও সাহিত্যক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে দেখা দেয় নাই; আর দেখিতেছি ভাণ্ডারের সকল সামগ্রীর মধ্যে, উপন্যাসের সংখ্যাই অধিক। বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঙ্গালা উপন্যাসের জীবনদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; আর বঙ্কিম বাবুই প্রথমে পাশ্চাত্যভাবে, বিদেশী আদর্শে উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। সেই বঙ্কিম বাবুর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত যত উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সকল গুলিই বিদেশী ছাঁচে ঢালা, বিলাতী ঢঙ্গে প্রস্তুত, বৈদেশিক ভাবপ্রাণতায় (Sentimentality) পূর্ণ,—কেমন এক বিলাতী সুরে বাঁধা।

বাঙ্গালায় ঐতিহাসিক উপন্যাস একখানিও নাই বলিলেই হয়। অধিকাংশ উপন্যাসই সামাজিক ও কাল্পনিক ঘটনাবলীতে জড়িত। এই কয়েক প্রকার উপন্যাস ভিন্ন, ইদানীং ডিটেক্টিভ উপন্যাস নামে আর এক প্রকার ভয়াবহ আগাছা সাহিত্যক্ষেত্রে শিকড় নামাইয়াছে। তাহারা সমাজের মধ্যে কিরূপ প্রতিপত্তি বিস্তার করিতেছে, সে সকল কথার আলোচনা না করিয়া, বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকের লেখনিপ্রসূত উপন্যাসের ঘটনাবলী, সমাজে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহারই আলোচনা করিব।

পারিবারিক ঔপন্যাসিক, তাঁহার সাহিত্যের অধিকাংশ উপকরণই সমাজ হইতে সংগ্রহ করেন। প্রতিদিন সমাজ মধ্যে আমাদের চক্ষের সম্মুখে বৈচিত্রময় কত শত ঘটনা ঘটিতেছে,—আমরা সে সকল দেখিয়াও দেখিতেছি না। কিন্তু সাহিত্যসেবীর দৃষ্টি বড় তীব্র, তিনি বড় সূক্ষ্মদর্শী। তাই তাঁহার চ'খের উপর কোন ঘটনা ঘটিবামাত্র—তাহা তাঁহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া যায় এবং যথাসময়ে তাঁহারই সাহিত্যদর্পণে সেই ঘটনার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়।

* চুঁচুড়া হিন্দুসমিতির ৯ই জ্যৈষ্ঠের অধিবেশনে, সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত।

তাই বলিয়া কি, প্রত্যহ দুই বেলা আমাদের চ'খের সম্মুখে, সমাজ মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে—ভাল মন্দ বিচার না করিয়া, সেই গুলিকে সাহিত্যে স্থান দিতে হইবে? কখনই না। মন্দ ঘটনা লোককে যত কম শুনাইবে, পাপের ছবি লোকের সম্মুখে যত কম ধরিবে, ততই দেশের ও সমাজের পক্ষে মঙ্গল। তোমরা বলিতে পার, পাপের ছবি চ'খে না পড়িলে, অশান্তির চিত্রে নজর না পড়িলে, লোমহর্ষ কাহিনী কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ না করিলে, জন সাধারণের চেতনা হইবে কেন, তাহাদের মোহ কাটিবে কেন?

আমরা বলি, লোকের মোহ কাটাইতে হইলে, চক্ষু ফুটাইতে হইলে, পাপের চিত্র, অশান্তির ছবি দেখাইবার কোন আবশ্যক নাই। চিন্তা করিয়া দেখ, জ্ঞানত একটু আধটু পাপ প্রতিদিনই আমরা করিতেছি। আমরা বিলক্ষণ জানি যে এই সকল কার্য্য করা অতীব অন্যায়, এই সকল কার্য্য করিয়া আমরা ক্রমেই ধর্ম্মের পথ হইতে স্খলিত হইয়া পাপে ডুবিতেছি। এইরূপ অনেক কার্য্যকে অনেকে পাপ বলিয়া জানে, কিন্তু তবুও তাহারা সেই সকল কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় না। কেন হয় না? সেই সকল কার্য্যকে পাপ বলিয়া বিবেচনা করে না বলিয়া যে নিবৃত্ত হয় না, এমন নহে,—তাহারা স্পষ্টত সেই গুলিকে পাপ বলিয়া জানে—সেই পাপের পরিণাম কি তাহাও তাহারা বিশেষরূপে অবগত আছে, কিন্তু তথাপি যে তাহারা সেই সকল পাপ করিতে ক্ষান্ত হয় না তাহার কারণ—পাপের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার মত তাহাদের শক্তি নাই। আমাদের এমন সামর্থ নাই যে পাপের প্রলোভনে বিমুগ্ধ না হই, চরিত্রের এমন প্রভাব নাই যে সয়তানের ফাঁদে না পড়িয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি, মনে এমন জোর নাই যে পাপের কুহকে না মজিয়া পুণ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারি। সুতরাং পাপকে পাপ বলিয়া বুঝিতে পারিলেই, তাহার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেই, তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব না। পাপের কবল হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায়—চরিত্রের বল, মনের বিশ্বাস, হৃদয়ের শক্তি।

পাপের হাত হইতে মুক্ত হইতে হইলে, প্রলোভনের ফাঁদ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে—পাপের সংস্পর্শে না আসাই শ্রেয়ঃ পাপের ছবি না দেখাই ভাল, পাপ চিন্তা মনে স্থান না দেওয়াই উচিত। চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত না হইলে তোমার সাধ্য কি যে তুমি পাপের চক্ষে ধূলা দিয়া পলাইয়া যাইবে। আর এই চরিত্রের উৎকর্ষ সম্পাদন করিবার জন্য কোন আদর্শ চরিত্রকে লক্ষ্য করিয়া জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, অচিরে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। যে আজীবন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আলোক যাহার দৃষ্টিপথে কখনও পতিত হয় নাই, সে ব্যক্তি কিরূপে বুঝিবে যে আলোকে যাইতে পারিলে—সে সুখী হইবে? যে ব্যক্তি পাপপঙ্কে ডুবিয়া হাবুডুবু খাইতেছে, সে নির্ম্মল আদর্শ চরিত্ররূপ যষ্টির উপর ভর দিতে না পারিলে, কি উপায়ে পাপপঙ্ক হইতে নিজেকে উদ্ধার করিবে? প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করিলেও তুমি কুজ্ঝটিকাকে বিদূরিত করিতে পারিবে না, কিন্তু কুয়াসা হইতে অল্প ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিলেই, তুমি উহার কবল হইতে নিস্তার পাইবে,—সেইরূপ পাপে নিমজ্জিত থাকিয়া আজীবন পাপের সহিত যুদ্ধ করিলেও, তাহার হাত হইতে নিস্তার পাইবে না। কিন্তু পাপ হইতে অল্প ঊর্দ্ধে উঠ অর্থাৎ ধীরে ধীরে নির্ম্মল সাত্বিক চরিত্র লাভ করিবার চেষ্টা কর, দেখিবে পাপ ভয়ে তোমার নিকট হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে, তুমিও ভগবানের নিকট অগ্রসর হইয়াছ। কাজেই সাহিত্যে অশান্তির চিত্র কমাইয়া দিয়া, শান্তির চিত্র বাড়াইতে হইবে, আর সেই সঙ্গে পাপের ছবি কমিয়া গিয়া পুণ্যের চিত্র ফুটিয়া উঠিবে।

সহিষ্ণুতা ও সংযম একই জিনিষ, দুইদিক দিয়া দেখা মাত্র। হৃদয়ে থাকিবে সহিষ্ণুতা, আচরণে থাকিবে সংযম—ইহাই হইল হিন্দুর ধর্ম্ম ও হিন্দুর শিক্ষা। এই শিক্ষার ত্রুটি হওয়াতে হিন্দু হিন্দুত্ব ভুলিতে বসিয়াছে। সহিষ্ণুতা ও সংযম হিন্দুর সাধারণ ধর্ম্ম,—স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই ধর্ম্ম। এই যে ভারত-নারীর সতীত্ব, যাহার গৌরব আমরা এখনও জগতের সমক্ষে করিয়া থাকি—সেই সতীত্বও কেবল সহিষ্ণুতা ও সংযম। হিন্দু নারীকে যদি কিছু শিক্ষা দিতে হয়, তবে তাহা এই সংযমের ও সহিষ্ণুতার। কাব্য, নাটক ও উপন্যাস শিক্ষার উপাদান। উপন্যাস-প্রবণ বাঙ্গলায়—সংযম ও সহিষ্ণুতা শিক্ষার বড় বিড়ম্বনা হইতেছে। বঙ্কিম বাবুর অনেকগুলি উপন্যাসে, রবীন্দ্রনাথের

সেদিনকার 'নৌকাডুবিতে,' শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারায়,' এই সহিষ্ণুতার নিতান্ত অভাব,—আর কত লেখকের নাম করিব? প্রধান লেখক বঙ্কিম বাবুর কতকগুলি উপন্যাস লইয়া এই কথাটা আমরা বিস্তারিত-রূপে আলোচনা করিতেছি।

পাপের ছবি দেখাইয়া, পাপীর মোহ কাটান যায় না—তাহাকে উদ্ধার করিতে হইলে তাহার সম্মুখে আদর্শ পুণ্য চরিত্রের চিত্র ধরিতেই হইবে, নতুবা তাহার গতি নাই—এত বড় কথাটা বঙ্কিম বাবু উপন্যাস লিখিবার সময়ে যেন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাই পাপের চিত্রে তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাস পরিপূর্ণ। এই প্রবন্ধে কেবল মাত্র একটি মহাপাপের কথা উল্লেখ করিব—সেই মহাপাপ আত্মহত্যা। হিন্দুর চক্ষে, হিন্দুর পক্ষে আত্মহত্যা যে একটা মহাপাপ—সে পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত নাই—একথা ব্রাহ্মণ সন্তান, হিন্দু-কুলতিলক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণ ছিল না, নতুবা আত্মহত্যার কাহিনী বর্ণনা করিয়া, তিনি তাঁহার অমূল্য উপন্যাসগুলি কলঙ্কিত করিতেন না।

প্রেমের প্রতিদান না পাইয়া অভিমানে হিন্দু বিধবা রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দিল;—সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া মারা গিয়াছেন মনে করিয়া শোকে দুঃখে নগেন্দ্রনাথ আপনার হস্তদ্বারা কণ্ঠরোধ করিতেছেন দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—"তুমি পাগল—মরিলে কি সূর্য্যমুখীকে পাইবে";—দেবেন্দ্র হীরাকে পদাঘাত করিয়া দূর করিয়া দিলে, হীরা নিজে অভিমানে বিষপান করিতে গিয়াছিল, কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, সে নিজে বিষ না খাইয়া কুন্দনন্দিনীকে বিষপান করিতে প্রলোভিত করিল,—হীরার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল—কুন্দ বিষ খাইল, পরে মৃত্যুর কোলে শয়ন করিয়া "কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া কুন্দ বলিয়া ডাকিতে—কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনি করিয়া বসিতে—তবে আমি মরিতাম না"—প্রভৃতি অভিমানভরা কথাগুলি নগেন্দ্রকে বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল;—আদর্শ সতীর, থুড়ি, প্রেমিকার অভিমানের বহর দেখ!—প্রেমিক প্রেমিকা প্রতাপ-শৈবলিনী কৈশোরে প্রেমের খেলা খেলিতে খেলিতে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে গেল—প্রতাপ ডুবিল, শৈবলিনী



ডুবিল না;—তাহার পর যৌবনে নজরা হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গঙ্গাবক্ষে উষার আলোকে উভয়ে যখন সাঁতার দিতেছিল, তখন দুঃখে ক্ষোভে, প্রতাপ পুনরায় জলে ডুবিল;—অন্ধ কুলওয়ালী রজনী, হীরালাল কর্ত্তৃক চরে পরিত্যক্তা হইয়া আত্মহত্যা করিবার উদ্দেশ্যে জলে ডুবিল; কল্যাণীর কন্যা সুকুমারী বিষের কৌটা লইয়া খেলা করিতে করিতে, বিষের বড়ী মুখে পূরিল। বটিকা বালিকার মুখ হইতে বাহির করিয়া লইয়া কল্যাণী স্বামীকে বলিলেন,—"আর দেখ কি? যে পথে দেবতারা ডাকিয়াছে, সেই পথে সুকুমারী চলিল—আমাকেও যাইতে হইবে।" এই বলিয়া কল্যাণী বিষের বড়ী মুখে ফেলিয়া দিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে গিলিয়া ফেলিল। পরে ভবানন্দ কল্যাণীকে জীবিত করিলে, কল্যাণী বলিলেন—"স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মের সহায় বটে। ছোট ছোট ধর্ম্মে। বড় বড় ধর্ম্মে কণ্টক। আমি বিষ কণ্টকের দ্বারা তাঁহার অধর্ম্ম কণ্টক উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। ছি দুরাচার পামর—ব্রহ্মচারি! এ প্রাণ তুমি ফিরাইয়া দিলে কেন?—সুতরাং কল্যাণীর বিষ পান মার্জ্জনীয়। মৃণালিনী গিরিজায়ার নিকট প্রতিজ্ঞা করিল—"যদি তাঁহার (স্বামী) নিজমুখে শুনি যে তিনি কুলটা ভাবিয়া ত্যাগ করিলেন, তবে এ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারি"; আবার অভিসারিকা ইন্দিরা অজ্ঞাতবাসে নিজের স্বামীকে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—"ইনি আমায় স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবেন—নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করিব।" এইরূপে বঙ্কিম বাবুর প্রায় সকল উপন্যাসেই, হয় তাঁহার আদর্শ নায়িকাগণ আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, না হয় অভিমানে গ্রীবা বাঁকাইয়া, ওষ্ঠ কাঁপাইয়া আত্মহত্যা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহাদুরী লইয়াছেন।

সাহিত্যে আত্মহত্যার চিত্র, আমরা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। সংস্কৃত সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমাদের প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের কোন স্থানেই আত্মহত্যার উল্লেখ দেখিতে পাই না। দময়ন্তী, সাবিত্রী, বেহুলা, খুল্লনা—ইহারা ত কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে আত্মহত্যা করিব। তবে বঙ্কিম বাবু এ ভাব কোথা হইতে পাইলেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার ভাব সম্পূর্ণ বিদেশী, কেবল বিদেশী ভাবপ্রাণতায় তাঁহার উপন্যাসগুলি পূর্ণ।

আমাদের মহিলাগণ আজকাল নভেল পড়িয়া শিক্ষিতা। সকলেই অল্প বিস্তর বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগুলি হজম করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা সীতাসাবিত্রীর চরিত্র ভুলিয়া গেলেন, বেহুলা, খুল্লনার চরিত্র কখন পাঠ করিলেন না, কেবল উপন্যাসের মানিনী নায়িকার চরিত্র আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যখনই আদর্শ নায়িকাদিগের মানের মানদণ্ড একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তখনই তাঁহারা হয় বিষ খাইয়া, না হয় জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়া এই নশ্বর দেহ পাত করিয়াছেন। তাই আজ সমাজ মধ্যে আত্মহত্যা একটা সখের সামগ্রী হইয়াছে,—তাই আজ ঘরে ঘরে এত অশান্তি।

আজকাল এমনি হাওয়া উঠিয়াছে যে, শিক্ষিতা অশিক্ষিতা সকল মহিলাই, তাঁহাদের মানের পান হইতে একটু চুণ খসিলেই, অভিমানে আত্মহারা হন,—পাপীয়সী হীরা, কুন্দনন্দিনীকে বিষ খাইতে প্রলোভিত করিবার সময় যেরূপ বলিয়াছিল—"আমার মত যদি তোমাকে সহিতে হইত তবে এত দিনে তুমি আত্মহত্যা করিতে"—সেইরূপ উপন্যাসে পঠিত আত্মহত্যার কাহিনী তাঁহাদের মনে পড়িয়া যায়, হীরার অন্য কথা কুন্দ যেমন শুনিতে পাইল না, কেবল "আত্মহত্যা" শব্দ কুন্দের কাণে বাজিতেছিল—সেইরূপ তখন তাঁহারা অন্য উপদেশাদি শুনিতে পান না, কেবল আত্মহত্যার কথা কর্ণে ধ্বনিত হইতে থাকে—যেন ভূতে তাঁহাদের কাণে কাণে বলিতেছে—"তুমি আত্মঘাতিনী হইতে পারিবে? এ যন্ত্রনা সহা ভাল, না মরা ভাল?"—এমনি করিয়া দুই একদিনে সয়তানেরই জয় হয়—মানিনীরা আত্মঘাতিনী হন।

তাই আজ ঘরে ঘরে শোকের ঝড় বহিতেছে, দ্বারে দ্বারে মহা অশান্তি বিরাজ করিতেছে। তাই সেদিন সদাপ্রস্ফুটিতা কলিকা, নব বিবাহিতা বধূ, পরমারাধ্য পতির বুকে শেল হানিয়া, গুরুজনদিগকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া, নিজের সংসারকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া, অভিমানে মর্ত্ত্যলোক হইতে চলিয়া গেল।

এই সকল আত্মহত্যাজনিত সমাজ-বিপ্লবের কারণ কি? একমাত্র কারণ আজ কালকার বাঙ্গালার দূষিত সাহিত্য। পুরাণ বা ভাগবত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ বা কাশীদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী বা ভারতচন্দ্রের



অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি পুস্তকে আত্মহত্যার কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু নব্য মহিলারা ঐ সকল গ্রন্থ প্রায়ই আলোচনা করেন না; আমাদের ঔপন্যাসিকগণ সমাজ মধ্যে যে অহিন্দু বিলাতী ভাব প্রবেশ করাইয়াছেন, তাঁহারা তাহাই নাড়া চাড়া করেন। তাই ফলও অতি বিষময় হইতেছে। হীরা আত্মহত্যার কথা স্মরণ করাইয়া না দিলে, কুন্দ কিছুতেই আত্মহত্যা করিত না, সেইরূপ বাঙ্গালার দূষিত সাহিত্য প্রবল না হইলে, বঙ্গমহিলাগণ এইরূপে আপদমস্তক বিলাতী ভাবপ্রাণতায় ডুবিয়া না থাকিলে, তাঁহারা নভেল হইতে প্রতিদিন আত্মহত্যার কাহিনী পড়িতে না পাইলে—আজ তাঁহারা মানভরে তাঁহাদের মূল্যবান জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আত্মঘাতিনী হইতেন না, সমাজ মধ্যে নিত্য এইরূপ বজ্রাঘাত হইত না, সতী সাধ্বী হিন্দুরমণী এইরূপ ঘোর অহিন্দু আচরণ করিয়া চিরদিন নরকযন্ত্রনা ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইত না। সুতরাং এই সকল অনর্থের দায়ী আমাদের বাঙ্গালার ঔপন্যাসিকগণ।

এইরূপে সমাজের সহিত সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। সাহিত্য মার্জ্জিত না হইলে, সাহিত্য হইতে পাপের চিত্র, অশান্তির ছবি কমিয়া না গেলে, জনসাধারণের চক্ষের উপর পুণ্যের চিত্র জ্বল্ জ্বল্ করিয়া শোভা না পাইলে, সমাজ-সংস্কার হইবে না। পাপ কমাইবার ইচ্ছা থাকিলে—পাপের চিত্র অঙ্কিত করিলে কোন ইষ্ট হইবে না বরং সমূহ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। পুণ্য ফুটাইতে হইলে, কাব্যে পাপের চিত্রের প্রয়োজন বটে। কিন্তু যখনই পাপকে আসরে নামাইবে, তখনই যেন পাপকে ঘৃণা হয়, ত্রাস হয়। রাবণ অতি প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন, তাঁহার সদ্‌গুণ অনেক ছিল, সেই রাবণ কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সীতা হরণ করিল, তখনই আমাদের অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, আমরা সন্ত্রস্ত হইলাম। কাজেই আমরা ঐরূপ পাপ হইতে বিরত থাকিতে ইচ্ছা করি। অভিমানের কার্য্য অসহিষ্ণুতার ফল, উহাতে কেবল সংযমের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুর চক্ষে অভিমান পাপ। এই অভিমানের চিত্র যখন কাব্যে প্রতিফলিত হইবে, তখন যেন সেই চিত্র দেখিয়া আমাদের অভিমান বর্জ্জন করিতে ইচ্ছা হয়। সূর্য্যমুখী না বলিয়া, নগেন্দ্র নাথের গৃহ হইতে, দত্তকুল হইতে যখন বাহির হইয়া গেলেন, তখন যেন

'কুলটা' বলিয়া আমরা তাঁহাকে বুঝিতে পারি। যদি লেখকের গুণে বা দোষে তাহা না পারি, তাহা হইলে কাব্যের যে মূল কথা—সৌন্দর্য্যের দ্বারা আকর্ষণ ও কদর্য্যের দ্বারা কদর্য্য হইতে দূরে গমন—সেই মূল কথা নষ্ট হইল, কাব্য আত্মঘাতী হইল।

এইরূপ পুণ্য ফুটাইতে পারিলে, পুণ্যের চিত্র প্রকাশিত করিলে, পুণ্যের কাহিনী গান করিলে, পুণ্যের বন্যা আসিবে, তবে ত পাপের বাঁধ ভাসিয়া যাইবে—নতুবা পাপের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। সমাজে আত্মহত্যা কমাইবার চেষ্টা করিতে হইলে, আত্মহত্যা যে মহাপাপ সাহিত্যে তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে এবং সাহিত্যে আয়েসার ন্যায় চরিত্রের বহুল গঠন করিতে হইবে। সেই আদর্শ হিন্দু নারী যেন মুসলমানী আয়েসার ন্যায় বলিতে পারে "এই রস পান করিয়া এখনই সকল তৃষা নিবারণ করিতে পারি; কিন্তু এই কাজের জন্যই কি বিধাতা আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন? যদি এ যন্ত্রনা সহিতে না পারিলাম, তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন?" এবং পরিখা জলে নিক্ষিপ্ত গরলাধার অঙ্গুরীয়ের ন্যায় প্রলোভনকে বিদূরিত করিতে পারে।

সাহিত্যের সংস্কার না করিলে, সমাজ সংস্কৃত হইবে না। সাহিত্য হইতে পাপের চিত্র কমাইয়া দাও, পুণ্যের চিত্র ফুটাইবার চেষ্টা কর, আবার অশান্তি দূর হইয়া, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

চুঁচুড়া কদমতলা। শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার।

---

# কাব্যে ইতিহাস।

[৩]

জায়গিরি ব্যবস্থা;—

রাজকর্ম্মচারীদিগকে বেতন দেওয়া হইত না; এক খণ্ড ভূমি দেওয়া হইত, এবং তাহাতেই তাহারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এই ভূমি প্রদানই 'জায়গিরি' প্রদান নামে অভিহিত:—

রাজা বলে কোটালিয়া খাও বৃত্তিভূমি। ৯২ ক,ক চ,

কর্ম্মচারীকে, "—নিজহস্তে লিখিয়া পরয়ানা।

জায়গিরি করিয়া দিল দক্ষিণ ময়না॥—৪৫০ ধ,ম,

ফরমান;—

সম্রাট কোন দেশীয় ব্যক্তিকে ভুঞারাজা বলিয়া স্বীকার করিলে, তিনি আপন রাজ্যে স্বাধীন রাজার ন্যায় চলিতে পারিতেন; সম্রাট এইরূপ স্বীকার করিলে, তাঁহাকে (দেশীয় ব্যক্তিকে) ফরমান, খেলাত দেওয়া হইত;—

মজুন্দার রাজাই পাইল ফরমান।

খেলাত কাটার ঘড়ী নাগরা নিশান॥—১৪৪ অ, ম,

নাগরা নিশান দিল লিখন পরয়ানা॥—৪১ ধ,ম,

নৃপতিগণ ও বিভবশালী দেশীয় ব্যক্তিগণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। রাজ সভায় পণ্ডিত, কবি, ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক প্রভৃতি বহুবিধ বিদ্বানগণ উপস্থিত থাকিতেন। রাজার বা ধনীব্যক্তির অবকাশ কাল কাব্যালোচনায় অতিবাহিত হইত। কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, ঘনরাম, রামেশ্বর, কাশীদাস, প্রভৃতি সকল প্রাচীন কবিই এইরূপ কোন না কোন রাজার অধীনে বাস করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কাব্য গীত হইত। মনসার ভাসান, চণ্ডীর গান, ধর্ম্মের গান, অন্নদার গান, শিবের গান, প্রভৃতি বহুবিধ পাঁচালী দেশময় প্রচলিত ছিল। তখনকার লোকে রস বুঝিত, আমোদ করিতে জানিত, গুণগ্রাহী ছিল। এই সমস্ত পাঁচালী অষ্টাহব্যাপক গানে গীত

হইত। এখন প্রায় সব লোপ পাইতে বসিয়াছে। কিন্তু দূর পল্লীগ্রামে এখনও চণ্ডীর গান, মনসার গান, ধর্ম্মের গান প্রভৃতি চলিত আছে। কিন্তু বোধ হয় আর অধিক দিন থাকিবে না। এই সমস্ত পাঁচালীতে 'ধানশ্রী,' 'নটনারায়ণ' 'গুর্জ্জরি,' প্রভৃতি কঠিন কঠিন রাগ রাগিনীতে সঙ্গীতের চর্চ্চা হইত; এবং কি ইতর কি ভদ্র সকল লোকই তাহার রস উপভোগ করিতে পারিত। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় তৎকালে প্রচুর পরিমাণে সঙ্গীতের অনুশীলন হইত।

শিক্ষা দিক্ষা;—

বাঙ্গালী নিজের সংসার ও নিজের প্রতিবেশীদিগের উন্নতি কামনা করিত। বাঙ্গালীর শিক্ষা অতি মহৎ;—

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব গুরু, ব্রহ্মা বাঞ্ছা কল্পতরু,
পূজিব পালিব বাপমায়।—ধ,ম,পৃঃ ২৫৪

এই ক্ষুদ্র ও অতি মহৎ উপদেশ প্রতি বাঙ্গালীর হৃদয়েই জাগরূক ছিল; এবং সকলেই এইরূপ কার্য্য করিত। আমাদের অতি গৌরবের বিষয় যে তৎকালে মুসলমান কর্ত্তৃক অতিশয় অকথ্যভাবে উৎপীড়িত হইয়াও বাঙ্গালী হিন্দু আপনার চরিত্রবল ও মনের দৃঢ়তা হারায় নাই। কবিকঙ্কণের কাব্যে দেখিতে পাই, যখন অগাধ সমুদ্রে কমলে-কামিনীর কাহিনী শুনিয়া সিংহলরাজ তাহা দেখিবার জন্য সাজিয়া আসিলেন, এবং দেখিতে না পাইয়া অতিশয় যাতনা দেওয়ার পর যখন ধনপতি নাবিকদিগকে সাক্ষী মানিল, তখন নাবিকগণ (তাহারা কমলে-কামিনী দেখিতে পায় নাই) সে কথা স্বীকার করিল না; তাহারা বুঝিয়াছিল যে তাহাদের এক কথায় তাহারা নিজে, তাহাদের প্রভু ও তাহাদের সম্পত্তি সকলই নষ্ট হইবে, কিন্তু সে সকল রক্ষা করিবার জন্য তাহারা একটী মিথ্যা কথা বলিল না। নাবিকদিগের ন্যায় নিম্ন শ্রেণীর লোকের এরূপ হৃদয়বল দেখিয়া উচ্চ শ্রেণীর কথা সহজেই অনুমিত হয়। হিন্দু পিতামাতার প্রতি একান্ত ভক্তিমান, রাজভক্ত এবং আপনাদের স্ব স্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিল। কবিকঙ্কণে দেখিতে পাই ব্যাধ ধর্ম্মকেতু যখন স্বীয় বনিতার সহিত তীর্থ যাত্রা করিলেন, তখন ব্যাধ, কালকেতু "মাসে মাসে যোগায় সম্বল।" ব্যাধ জাতির মধ্যে যখন এইরূপ ভক্তি



এইরূপ ধর্ম্মবল, তখন উন্নত শ্রেণীর মধ্যে প্রকৃত উচ্চ আদর্শ লক্ষিত হইত।

হিন্দু চিরকালই ধর্ম্মপ্রাণ। কোন অমঙ্গল চিহ্ন হইলে ব্রাহ্মণকে দান দিলেই তাহা ঘুচিয়া যাইবে, ইহা তাহাদের ধারনা ছিল। ব্রাহ্মণদের এইরূপ প্রতিপত্তি সমাজের সকল জাতির মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কোন শুভ কর্ম্মে, বা কোন লাভ হইলে, বা কোন অমঙ্গল হইলে ব্রাহ্মণদের দান করিত;—

দিনে দিনে টুটে নীর, দেখি রাজা সুস্থির
দ্বিজগণে দিল নানা ধন॥—৮৭ ক, ক, চ

প্রতি কর্ম্মেই শুভ দিন বা শুভ সময় দেখাইয়া করা হইত; সুতরাং দৈবজ্ঞেরও আদর ছিল।

তখনকার হিন্দুসমাজে তন্ত্র মন্ত্রের কাজ চলিত। এখনও আমরা যেমন শুনিতে পাই,—পল্লীগ্রামে "ডাইনী" আছে, তাহারা নানারূপ অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়াকলাপ করিয়া থাকে,—ইত্যাদি। তৎকালেও ঐরূপ তন্ত্র মন্ত্রের প্রচলন ছিল। "আগুণভারা' "নিচুটীলাগান," প্রভৃতি মন্ত্রের কথা প্রাচীন কাব্য সমূহে দেখিতে পাই;—

ভারিলে (পোড়ান) সাবল হয় পানী।—১৮২ ক, ক,চ
নিচুটী লাগান।—ধ, ম, ১৬৯; ৭৪৪,
ভেলকিতে কত ভাত ঘুঁটে হয় সোনা।—৬৮ অ,ম,

তখন প্রায় প্রতি নগরে নগরে, প্রতি গ্রামে গ্রামে 'কুস্তীর আখড়া' ছিল। এবং সকলেই এই শাস্ত্রে শিক্ষিত ছিল। এ বিষয়ে ডোমজাতির প্রতিপত্তিই অধিক। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মল্ল বিদ্যার বর্ণনা দৃষ্ট হয় তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে তিনিও নিজে ঐ বিদ্যায় শিক্ষিত ছিলেন। লাঠী, তীর, ধনু লইয়া মল্লগণ যে আশ্চর্য্যজনক ক্রিয়াদি করিত, তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। তখন সমাজে বল ছিল বীর্য্য ছিল।

তুলিয়া আখড়া ঘরে মল্ল যুদ্ধ কেহ করে,
মালবিদ্যা গুলী চাপগারী।
লইয়া দাণ্ডা ঝাড়া, কেহ করে তোলাপাড়া,
পশু বধে কেহ বা শিকারী॥—৮৭ ক, ক, চ

মল্লযুদ্ধ বর্ণনা ;—ধর্ম্ম মঙ্গল —১৯৩ ; ২৫২ পৃঃ।

মল্লের অলঙ্কার ;—

দুকানে কনক কড়ি বড়ি শোভা পায়।
বিনোদ বলয় করে বীর বৃদ্ধ কায়॥
মল্লডোর মণ্ডিত মাথায় বীর টুপি।—১৯১ ধ,ম

কোন মল্ল যুদ্ধার্থ আসিলে প্রথমতঃ তাঁহার পরাক্রম পরীক্ষা করা হইত।—কতকগুলি সরিষা লইয়া তাঁহাকে সেই সরিষাগুলি হইতে তৈল বাহির করিতে হইত। *

যুদ্ধে কোন মল্ল পরাজিত হইলে তাহার 'মল্লডোর' কাড়িয়া লওয়া হইত।

মল্লডোর ফলায় বান্ধিল মহাশয়।—ধ,ম ২৫৭ পৃঃ

গৃহস্থালী সংসার;—

সংসারের রাণী গৃহকর্ত্রী। তিনি যাহাকে যাহা বলিবেন, সে তাহাই করিতে বাধ্য। তখনকার বাঙ্গালী হিন্দুর অন্তঃপুর ছিল পুণ্যময় অমরার এক খানি ক্ষুদ্র চিত্র। সে সংসারে দয়ার, করুণার, ভক্তির, প্রেমের, পাতিব্রত্যের জলন্ত মূর্ত্তি বিরাজ করিত। তখনকার হিন্দুর অন্তঃপুরে সীতা, সাবিত্রী, অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইত। সেই দূরবর্ত্তী যুগেই বাঙ্গালী হিন্দুর মেয়ে 'দ্রোপদীর মতন রাঁধুনী হব', 'পৃথিবীর মত শান্ত হব' ইত্যাদি মহিমাময়ী বাণী কণ্ঠস্থ করিয়া তদুপযোগী কার্য্য করিতে যত্নবতী ছিল। এখন যেমন আমরা শুনিতে পাই,—

'সকাল বেলা ছড়া ঝাঁট সন্ধ্যাবেলা বাতি।
মা লক্ষ্মী বলেন আমার সেই ঘরে বসতি॥"

এরূপ উপদেশ, সেই দূরবর্ত্তী যুগেই অনুষ্ঠিত হইত। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া হিন্দুর বধূ 'ছড়া ঝাঁট' হইতে সমস্ত গৃহকর্ম্ম করিতে ব্যস্ত থাকিতেন। † হিন্দুর মেয়ে রাঁধিয়া দশজনকে খাওয়াইতে পারিলেই কৃতকৃতার্থ হইত। তাই আমরা কাব্য সমূহে দেখিতে পাই, যে বড় বড় সমারোহে হিন্দুর অন্তঃপুরেই সমস্ত রন্ধন কার্য্য শেষ হইল।

* মুঠা করি সরিষা বাহির করে তেল। ১৯৭ ধ, ম,

† উষঃকালে সতি সতীজনার হৈল নিদ্রাভঙ্গ।—২৮৮ ধ,ম



তখনকার মেয়েরা 'বাঘ ভল্লুক' অপেক্ষা সপত্নীকে অধিক ভয় খাইত। এবং যাহাতে সতিনী না হয় তজ্জন্য নানাবিধ ব্রত নিয়মাদি করিত। হিন্দুর মেয়ে বরং বিধবা হইয়া থাকিতেও সম্মত ছিল, কিন্তু সতিনীর সহিত স্বামীসেবা করিতে নিতান্তই অসম্মত ছিল ;—

দারুণ সতিনী ভুখিল বাঘিনী,
কেবল যমের যন্ত্রণা॥—১৪০ ক, ক,চ
বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সহা যায়।
সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায়।—৬৯ অ,ম,
যে ঘরে সতিনী বৈসে সেই দুঃখে ভাঙ্গা।—৮৩৩ ধ,ম,

আজকালও আমরা যেমন দেখিতে পাই, মেয়েদের সন্তানাদি জন্মাইতে বিলম্ব হইলে, মাতা কত ঔষধ কত তন্ত্র মন্ত্র কত 'ভারাবাঁধা' প্রভৃতির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন ; তৎকালে এইটী প্রচুর পরিমাণেই হইত ;—

কত গুণী গুর্ব্বিণী করিল কত খান।
মাসে মাসে ঔষধ অপত্য-আশে খান॥
শিবাচ্চলা শান্তি কত ব্রত উপবাসে।
কঠোর করেন কত পুত্র অভিলাষে॥
ষষ্ঠী দেবী পূজি রামা বর মাগে কেন্দে।
পুত্র হলে চিত্র করি তলা দিব বেন্ধে॥
কত ঠাঁই বাচা বান্ধে করিয়া মানান।
হবে কিনা জানিতে জানের বাড়ী যান॥
ভাল কোরে দৈবজ্ঞ দেখান ডেকে হাত।
কত পিঁড়া উঠানে মেয়ের পড়ে যাত॥—৮৭ ধ, ম,

বশীকরণ কার্য্য প্রচুর পরিমাণে চলিত ;—বিশেষতঃ বিবাহের সময়। বরকে কন্যার বশে রাখিবার জন্য যে সকল কার্য্য করা হইত, এখনও কিছু কিছু হয়—তাহার তুলনা বোধ হয় অন্য কোন দেশে নাই। এইরূপ স্বামী বশীকরণ, পুত্র বশীকরণ, প্রভৃতি কত প্রকার বশীকরণ, যে ছিল, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন।

পড়া তৈল মুখে মাখি, পড়া ফুল চুলে রাখি,

নানা মন্ত্রে সিন্দুর পাড়না ॥
পরি পড়া গন্ধ চুয়া, মুখে পড়া পান গুয়া,
লাগে বেশ নাপান ঝাপান।—১৫০ অ, ম,

উক্তরূপে পুত্রকেও ঔষধ করা হইত ;—

ঔষধ করিয়া রাখ আপন নন্দন।
গুয়া পানে মাখাইয়া ঔষধের গুড়ি ॥—২৪৫ ধ, ম,

এতদ্ভিন্ন কবিকঙ্কণের নানাস্থানে বশীকরণ প্রথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

রন্ধন ;—

নিমে শীমে বেগুণে রান্ধিয়া দিবে তিত।
বেশম মাখিয়া রান্ধ সরিষার শাক।
কটু তৈলে বেথুয়া করিবে দৃঢ় পাক ॥
আমড়া সংযোগে গোরী রান্ধিবে পালঙ্গ।
খণ্ডে মুগের সূপ উতার ডাবরে।
আচ্ছাদন থালাথালি তাহার উপরে ॥
কুরুনীতে কুরিয়া আনিবে নারিকেল।
পিঠালী মিশায়্যা তথি দিবে কিছু জল ॥
ঘন কাটি খর জালে রান্ধিবে ভাল ঘণ্ট।—৩০ পৃঃ ক, ক,চ

বাইগুণ কুমড়া কড়া, কাঁচকলা দিয়া শাড়া,
বেশর পিঠালী ঘন কাঠি
ঘৃতে সন্তোলিল তথি, হিঙ্গু জীরা দিয়া মেথি,
শুক্তা রন্ধন পরিপাটী ॥
ঘৃতে ভাজা পলাকড়ি, নৈটা শাকে ফুল বড়ি,
চিঙ্গড়ি কাঁঠাল বিচি দিয়া।
ঘৃতে নালিতার শাক, তৈলে বাস্তক পাক,
খণ্ডে বড়ি ফেলিল ভাজিয়া ॥
দুধে লাউ দিয়া খণ্ড, জ্বাল দিল দুই দণ্ড,
সন্তোলিল মহুরীর বাসে।



মুগ সূপে ইক্ষুরস, কৈ ভাজে পন দশ,
মরিচ গুড়িয়া আদা-রসে ॥
মসূরি মিশ্রিত মাস, সূপ রান্ধে রস বাস,
হিঙ্গু জীরা বাসে সুবাসিত।
ভাজে চিতলের কোল, রোহিত মৎস্যের ঝোল,
মান বড়ি মরিচে ভূষিত ॥
বোদালি হেলেঞ্চা শাক, কাঠি দিয়া কৈল পাক,
ঘন বেনার সন্তোলন তৈলে।
কিছু ভাজে রাই খড়া, চিঙ্গড়ির তোলে বড়া,
খরসোলা পুজী দশ তোলে ॥
করিয়া কণ্টক হীন, আম্রে শকুল মীন,
খর লোন দিয়া ঘন কাঠি।
রান্ধিল পাঁকাল ঝষ, দিয়া তেঁতুলের রস,
ক্ষীর রান্ধে জাল করি ভাঁটি ॥
কলাবড়ী মুগ সাউলী, ক্ষীর মোননা ক্ষীরপুলি,
নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে ॥—১৫৭ ক, ক, চ

মন্দ মন্দ জ্বালে ঝালে বসে ভাজে ভাজা।
কদলী পটল ওল ব্যঞ্জনের রাজা ॥
কুটে রাখে নায়িকা লবণ মাখি থালে।
নির্জ্জল করিয়া রামা তপ্ত ঘৃতে ঢালে ॥
মানকচু কুন্দরকী হবিষ্যান্ন সব।
ফল মূল ভাজি কত ঘৃতে জব জব ॥
ভাজিল বেগুন সীম নিম দিয়া ফোড়।
মূল আদা বটিকা করলা গর্ভ থোড় ॥
সঝাল বক্কাল কত মিছরি মিশাইয়া
দুগ্ধ মারি ক্ষীর করি রাখে জুড়াইয়া ॥
উড়ি চেলে গুঁড়ি কুটি সাজাইল পিঠা।
ক্ষীর খণ্ড ছানা ননী পুর দিয়া মিঠা ॥

ঘৃতপক্ক লুচি পুরী নাগর উদ্দেশে।
অপূর্ব্ব উড়ির অন্ন রান্ধে অবশেষে॥—৩৮৯ ধ, ম,
শড়শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক।
ডালি রান্ধে ঘনতর ছোলা অরহরে॥
দুধ থোড় ডালি শুক্তানি ঘণ্ট ভাজা॥
কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা কোল।
সীক পোড়া ঝুরী কাঁটালের বীজে ঝোল॥
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই।
কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন তাজে কই॥
রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈল শাক।
মাছের ডিম্বের বড়া মৃতে দেয় ডাক॥
সুমাছ বাছের বাছ আড় মাছ যত।
ঝাল ঝোলে চড় চড়ি ভাজা কৈল কত॥
কচি ছাগ মৃগ মাংসে ঝাল ঝোল রসা।
কালিয়া দোলমা বালা সেকচী সমস্যা॥
অন্য মাংস শিকপোড়া কাবাব করিয়া।
রান্ধিলেন মূড়া আগে মসলা পূরিয়া॥
বড়া হ'ল আশিকা পীযূষী পুরী পুলী।
চুটী রুটী রামরোট মুগের শামুলী॥
কলাবড়া ঘিয়র পাপর ভাজা পুলি।
সুধারুচি মুচি মুচি লুচি কতগুলি।
পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা॥ ইত্যাদি—১৫৪ অ, ম

খাবার ;—

লাড়ু কলা চিনি ফেলি ক্ষীরখণ্ড দই॥
মজা মত্তমান মিছরি খাসা ক্ষীরখণ্ডা।
মনোহরা মতিচুর খাসামৃত মণ্ড॥—৩৩৫ ধ, ম

দেখিতে পাওয়া যায়, যে বাঙ্গালীরা তৎকালে মাংস অধিক খাইত। কবিকঙ্কণে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যাধ কালকেতু পশু মারিয়া আনে, আর



তাহার স্ত্রী হাটে, এবং পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া মাংস বেচিয়া থাকে। সমাজের সকল লোকেই—এমন কি ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত—সেই মাংস ক্রয় করে, আবার ধনপতির দাসী দুর্ব্বলা হাটে গিয়া শশ, জরঠ, খাসি ইত্যাদি ক্রয় করিল ; এবং তাহাই ভক্ষিত হইল।—

মূলদিয়া পনদশ, কিনিল জীয়ন্ত শশ,
জরঠ, কমঠ কিনে রুই।—১৫৬ ক, ক, চ

এতদ্ভিন্ন সকল গৃহস্থই প্রায় ছাগল পুষিত। কবিকঙ্কণে ধনপতির ন্যায় লক্ষপতির ন্যায় লক্ষপতি ব্যক্তিও ছাগল রক্ষা করেন ; ধর্ম্মমঙ্গলে দেখিতে পাই :— 'অজা অজি রাখে কেহ কেহ রাখে হয়।—৩৬৩

শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

---

# হরিদ্বার।

এই ত সে হরিদ্বার—পুরাণ-বর্ণিত—
হিমালয়-পাদমূলে, যেথা কল্লোলিত
পুণ্যতোয়া ভাগীরথী সগর-সন্তানে
উদ্ধারিতে অবতরি, ক্লিন্ন বিশ্ব-প্রাণে
ঢালিলেন শান্তিধারা ; আজো যাহা স্মরি'
সংসারের তাপ-দগ্ধ-হিয়া নরনারী
সংসার-অতীত এই চির-শান্তি ঠাঁই
চির-বিশ্রামের তরে যাচিছে আশ্রয়!
এই সেই পুণ্যস্থান, যেথা তটভূমে
মিশিল উদাত্ত স্বর শত যজ্ঞভূমে ;
প্রশান্ত কঠোর তপা কত যোগীবর
উন্মুক্ত করিল যেথা রুদ্ধমোক্ষ-দ্বার!
—আমারি সে 'মায়া' মোরে টানে শতবার
তাই রুদ্ধ মোরি কাছে 'হরির দুয়ার'!

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

# গঙ্গাই পুরুৎ।

## [ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

### নবম পরিচ্ছেদ।

অতি প্রত্যুষে আমরা প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া "জয় কালী" "জয় রাম প্রসাদ" বলিয়া বজরা ছাড়িলাম। গঙ্গা বক্ষে ঈষৎ পাতলা কুজ্ঝটিকা ভাসিয়া বেড়াইতেছে—যেন বৃক্ষ, বাটী, ভূমি প্রভৃতির নিকট আশ্রয় ভিক্ষায় বিফল মনোরথ হইয়া এক্ষণে সুরধুনীর শরণাগত। প্রাতঃসমীর যেন সর্ সর্ করিয়া বুঝাইতেছে এখনই সূর্য্যদেবের উদয় হইবে—ঐ দেখ পূর্ব্ব গগণে অরুণের রক্তাভ রথ প্রস্তুত—তোমার গতি তখন কি হইবে এখনই তুমি পলায়ন কর—মানে মানে যাওয়াই ভাল। কুজ্ঝটিকা ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিতে না পারিয়া একবার এদিক একবার ওদিক করিতেছে। দূরে জালিকেরা পাশাপাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিঙ্গীগুলি এক রজ্জুতে বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে—ভাঁটার স্রোতে নৌকাগুলি ভাসিয়া চলিয়াছে—আর জালিকেরা আপনার কার্য্যে তৎপর হইয়া সারিয়া লইতেছে। গঙ্গাতটে—ঘাটের পার্শ্বে মৎস্যজীবীদের রমণীর সম্প্রদায় বিশেষ বৃক্ষপত্র ও মৎস্যাধার লইয়া জালিকের নৌকার তটাগমন অপেক্ষা করিতেছে। ঘাটে বর্ষীয়সী রমণীগণ স্নানাহ্নিক করিতেছে—কেহবা তটে বসিয়া গঙ্গা মৃত্তিকায় সদ্য গঠিত শিবলিঙ্গের পূজা করিতেছে। বধূগণ অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে সম-বয়স্কা স্নানার্থিনীর সহিত অতি সঙ্গোপনে কতক বা ইঙ্গিতে মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে, ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠ করিতেছেন—কেহ বা তর্পণ মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন—কেহ বা গঙ্গাস্তব পাঠ করিতেছেন, কেহ বা নারায়ণের স্তব পাঠ করিতেছেন। ঘাটে ঘাটে এইরূপ দেখিতে দেখিতে আমরা গঙ্গাবক্ষে উত্তর মুখ হইয়া গড়াইয়া চলিলাম। কুজ্ঝটিকা আমরা ব্যঙ্গ করিতেছি মনে করিয়া নদী বক্ষে গড়াইয়া গড়াইয়া মনোরাগে সরিয়া যাইতে লাগিল।

আমি দেখিতে দেখিতে কত কি ভাবিতে লাগিলাম, ভাবিলাম কোথা দেশ, আর কোথা আসিয়াছি। কি কার্য্যে ছিলাম, আর কি কার্য্যে ব্রতী



হইয়াছি। অতি দুরূহ কার্য্য—সফল হইবে কি? একজন ম্লেচ্ছ ত বটে—হবে কি? বন্ধু ত আশ্বাস দেন। তাঁর অসীম ক্ষমতা এটাও বুঝিয়াছি—কিন্তু আমার অদৃষ্টে হইবে কি? যখন হরিদাসের কথা অনেকবার শুনিয়াছি, কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে তাঁহার ব্রাহ্মণ বীর্য্যে জন্ম হইয়াছিল। যে সকল ম্লেচ্ছ সাধনায় সাফল্য পাইয়াছেন তাঁহারা সকলেই কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—আমার মত বিদেশী কেহই নহেন। এই সকল ভাবিয়া আমার মন সেদিন ক্রমশ খারাপ হইতে লাগিল। মুখ ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল। আমি যেন কোন দুষ্কার্য্য করিতেছি, প্রচ্ছন্নভাবে হইলেও করিতেছি, এইরূপ চিন্তায় আমি ক্রমেই সঙ্কুচিত হইতে লাগিলাম। কেবল মাত্র মনের সঙ্কোচ নহে, শরীরের সঙ্কোচও বটে; জড়সড় হইয়া যাইতে লাগিলাম। হালিসহরে যাইতেছি—কেন? আমার কি উপকার হইবে? আমি ত আর কিছু আধ্যাত্মিক ব্যাপার দেখিতে পাইব না। এই সকল দুশ্চিন্তায় আমার মন দুলিতে লাগিল। আমি নিতান্ত অপ্রসন্ন-চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

বন্ধুবর আপনার চিন্তায় আপনি ভোর হইয়াছিলেন। সহসা আমার প্রতি বার বার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। বোধ হইল যেন দুই এক নিমিষেই আমার বহর মাপিয়া ফেলিলেন—যেন একটু ভাবিয়া ইতি-কর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া লইলেন—আমার দিকে ফিরিয়া বসিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে একটি ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া বলিলেন "ব্রাহ্মণ যে মন্ত্রপাঠ করিতেছেন, তাহা মনঃসংযোগে শ্রবণ করুন"। আমি মনঃসংযোগে শ্রবণ করিলাম। ব্রাহ্মণ গঙ্গা স্তব পাঠ করিতেছেন—

সুরধুনী মুনি-কন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং,
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিং তে মহত্ত্বম্।
যদি চ গতি-বিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং,
তদিহ তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্॥

আমি শ্রবণ করিলে বন্ধু বলিলেন, অদ্ভুতে বিশ্বাস না করিয়া আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার যো নাই, যে কোন ধর্ম্ম দেখ কত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প আছে। এগুলি বিশ্বাস করিয়া লইতে হয়—পরে যখন আধ্যাত্মিক উন্নতিরও

উচ্চতর বা উচ্চতম সোপানে সাধক আরোহণ করিবে তখন অদ্ভুত ব্যাপারের প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারিবে। এই যে ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্তব পাঠ করিলেন, উহা দরাফ খাঁ নামক একজন মুসলমানের রচিত গঙ্গাস্তবের শেষ চারি ছত্র। স্তবটি নিতান্ত ছোট নয়। পরে আপনাকে শুনাইব।

আমার স্তবটি শুনিবার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু বন্ধুর কথায় প্রতিবাদ করিতে সাহস বা প্রবৃত্তি হইল না। বন্ধু আমার মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন—স্তবটি আমি যথাস্থানে পাঠ করিব—আমি দরাফ খাঁর আস্তানা আপনাকে দেখাইব। সেই সময় স্তব পাঠের প্রকৃত সময় বলিয়া বিবেচনা করি।

বন্ধুর মুখে দরাফের যে পরিচয় শুনিয়াছিলাম তাহা সকলেই জানেন বোধ হয়। যদি কেহ অজ্ঞ থাকেন তাঁহারই জন্য সংক্ষেপে বলি।

দরাফ খাঁ ত্রিবেণীতে কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে রাখাল ছিল। একদা বৈশাখের অপরাহ্ণে অতিশয় ঝড় বৃষ্টি হয়। বালক তখন এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছিল। ঝড়ও থামে না বৃষ্টিও থামে না, এদিকে ক্রমে সন্ধ্যার ছায়া গাছ পালায় আবির্ভূত হইল। বালক বাড়ী যাইবার জন্য নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। এমন সময় সহসা যে বৃক্ষোপরি কথোপকথন শুনিতে পাইল। একটা স্ত্রীলোকের স্বর—অপরটি পুরুষের স্বর। স্ত্রী স্বর বলিতেছে, আমি আর এখানে থাকিতে পারি না। সঙ্গীর অভাব।

পুরুষ।—একটু অপেক্ষা কর না, এখনই একজন সঙ্গী মিলিবে।

স্ত্রী—কে সে?

পু—অমুক ব্রাহ্মণের চাকর। এখনই ব্রাহ্মণের বৃষ তাহার চাকরকে গুঁতাইয়া মারিবে, মাঠ হইতে বৃষ্টিতে ভিজিয়া গরু চঞ্চল হইয়া আসিবে। চাকরটা গোহালে বৃষকে বাঁধিতে যাইবে। গোহালের কোনে সর্প দেখিয়া বৃষ কোন মতে থাকিতে পারিবে না। চাকরটা সর্প না দেখিতে পাইয়া জোর করিয়া বৃষকে বাঁধিবার চেষ্টা করিবে, অবশেষে বৃষ রাগত হইয়া চাকরকে গুঁতাইয়া মারিয়া বাহিরে আনিবে। চাকরটা কর্ম্মফলে অপঘাত মৃত্যুর জন্য প্রেত হইবে। এখনই সে আমাদের সঙ্গী হইবে। একটু অপেক্ষা কর না।

বালক দরাফ এই কথা শুনিয়া ভীত হইলেও সাহসে ভর করিয়া সে



সেস্থানে শেষ কি হয় দেখিবার জন্য রহিয়া গেল। প্রেত দম্পতীও চুপ করিল, কিছুকাল পরে বালক শুনিল

স্ত্রী।—কই প্রেত ত হইল না, চাকরের আত্মা ত রথে চড়িয়া স্বর্গে গেল।

পুরুষ। হাঁ প্রেত হইল না। বৃষ শৃঙ্গদ্বারা গঙ্গা মৃত্তিকা খনন করিয়াছিল। বৃষের শৃঙ্গে সেই গঙ্গামৃত্তিকার কতকাংশ লাগিয়াছিল। বৃষ যখন চাকরটাকে গুঁতাইয়া মারে তখন সেই গঙ্গামৃত্তিকার খানিকটা চাকরের শরীরে লাগিয়া যায়। মৃত্যুকালে গঙ্গামৃত্তিকা সংস্পর্শ হওয়ায় চাকরের সদ্গতি হইল। সে আর প্রেত হইল না। সকলই অদৃষ্টের ফল। কোথা প্রেত হইবে, না কোথা স্বর্গে চলিয়া গেল।

স্ত্রী—তবে চল আমরা এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাই।

প্রেত দম্পতি চলিয়া গেল। বালক দরাফ তাহাদের আর কোন কথোপকথন শুনিতে পাইলনা। বালক দরাফ সেইখানে বসিয়াই আপনার কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লইল। সে সেই দিন হইতে গঙ্গাভক্ত হইল। চাকরী ছাড়িয়া দিল। ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ ও অহর্নিশি গঙ্গার আরাধনা ইহা ভিন্ন বালকের আর অপর কার্য্য রহিল না। এখন যে স্থানে দরাফের আস্তানা বা গাজীর কুড়ুল আছে সেই স্থানে বসিয়াই বালক তপস্যা আরম্ভ করিল। বালকের নিষ্পাপ দেহ মন, তারপর ঈপ্সিতার্থে-স্থির-নিশ্চয়-মনের আগ্রহ ও একাগ্রতা প্রগাঢ় ভক্তি মা কি আর স্থির থাকিতে পারেন, যথা সময়ে মকরবাহিনী চতুর্ভুজা মূর্ত্তিতে সাধক-বালককে দর্শন দিলেন। কেহ কেহ বলেন, নিরাশার কুহকে পড়িয়া দরাফ যখন গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে যাইতেছিল, তখনই মা গঙ্গা দরাফকে দর্শন দিয়াছিলেন। আর সেই সময়ে অনক্ষর বালক মুসলমানের মুখ হইতে যে গঙ্গার উদ্দেশে সংস্কৃত স্তব নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহাই দরাফকৃত গঙ্গাস্তব।

বন্ধুমুখে দরাফের গল্প শেষ হইলে বন্ধু আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন "মুসলমান বালক বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ হইয়াও কেবল ভক্তি ও উপাসনার জোরে হিন্দুর দেবীর প্রসাদ ভাজন হইয়াছিল।"

বন্ধুর বাক্য শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমারই প্রশ্নের উত্তর হইতেছে। আমি ত ম্লেচ্ছ, আমি ত বিধর্ম্মী—দরাফ খাঁর গল্পটি তবে আমারই জন্য।

তবে আমার নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। আমি ধরিয়া থাকি —ছাড়িব না—যাহাহৌক একটা কিছু হইবে। আর এতদূর অগ্রসর হইয়াও ত আমার পশ্চাৎপদ হওয়া উচিৎ নহে—আমি যে অনেক সহ্য করিয়াছি। আমি যে অনেক বলিদান দিয়াছি। তাহার ফল একটা আছে। স্বল্প ধর্ম্মও ত মনুষ্যকে মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করে। তবে এখন ধরিয়া থাকি। রামপ্রসাদ যেমন বলিয়াছেন, সেই বাক্যই আমার মন্ত্র হোক।

"বসে থাক মন, ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা।

যখন আস্‌বে জোয়ার উজয়ে যাবে, ভাঁটিয়ে যাবে ভাঁটার বেলা।"

এইরূপে মনকে বুঝাইলাম; মনও বেশ বুঝিল। একটু শান্তিও হৃদয়ে আসিল কিন্তু সহসা মনে হইল, দরাফ ত কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। আর আমার জন্ম সুদূর ইতালী দেশে, কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে ত আর আমার জন্ম হয় নাই, তখন আমার পক্ষে এ নিয়ম খাটিবে কি না তাহাই চিন্তার বিষয়। এই ভাব মনে উদয় হইলে আমি অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্ট হইয়া বিষাদ-ছায়ায় বসিয়া রহিলাম। তারপর মনে হইল এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। তখন কেন ভাবিয়া মরি। যখন এখন কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইতে পারিতেছি না, তখন আর বাঁজা ভাবনা ভাবিয়া হৃদয়, মন, মস্তিষ্ক কলুষিত করিবার আবশ্যকতা কি? তারপর এই বন্ধু ইনি যতই কেন গোপন করুন না, বেশ বুঝা যাইতেছে—ইনি একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, যোগী ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ। ইনি, ইহাও বেশ বুঝা যাইতেছে, আমার ভার লইয়াছেন। তবে আমার ভার আর আমি কেন বহিয়া মরি। উঁহারই স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া বসিয়া থাকি। শিষ্য ত গুরুর উপর সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া বসিয়া থাকে। আমার এ ভার বহিবার যখন লোক রহিয়াছে তখন আমার ভাবনা কি? গুরুদেব ভার লইলে সাধকের আর কোন ভাবনাই থাকে না। সাধকের ভার তখন গুরুর ভার—সাধকের ভাবনা তখন গুরুর ভাবনা। সাধকের বিপদ সম্পদ তখন গুরুদেবের বিপদ সম্পদ। শুনিয়াছি গুরুদেবকে শিষ্যের পাপের অংশও গ্রহণ করিতে হয়। যাঁহার ভাবনা তিনি বুঝিবেন। এজন্মে না হয় পরজন্মেও তাঁহাকে শিষ্যের উদ্ধার-সাধন করিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্র।



ঠিক এই সময়ে দূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় একটি সঙ্গীত ধ্বনি আমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। সুস্বরে সুরলয়ে গীত সেই গান আমার হৃদয়ে যেন শান্তি-সুধা ঢালিয়া দিল, যেন স্বভাব আমার দুঃখে কাতর হইয়া আমার দুঃখ অপনোদনর জন্য এই স্বর্গীয় আশ্বাস বাণী দৈববাণীর ন্যায় আমাকে শুনাইতে বসিয়াছেন। যে গানটি কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল সেটি এই।—

রাগিনী মূলতান। তাল একতালা।

কাল মেঘ উদয় হল অন্তর অম্বরে।
নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে॥
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধারা ধরে।
তাহে প্রেমানন্দে মন্দ হাসি তড়িৎ শোভা করে॥
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ চাতকের তৃষাভয় ঘুচিলে সত্বরে।
ইহজন্ম পরজন্ম বহু জন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম, হবে না জঠরে॥

মনে মনে বুঝিলাম, এসকলই বন্ধুর কার্য্য। আমার প্রশ্নের এমন বিশদ প্রাঞ্জল উত্তর এখনই আর কে দিতে সমর্থ। তারপর চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বলিতেছেন—

ইহজন্ম পরজন্ম বহু জন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম হবে না জঠরে॥

উঃ কতটা বিশ্বাসের বলে দেব রাম প্রসাদ এই গান গাহিয়াছিলেন। আর আমরা আনুবিক্ষণিক একটু বিশ্বাস লইয়া সাধনা জগতে রহস্য করিতে বসিয়াছি!! আর না—ঠিক হইয়াছে—আমার শান্তি ও তৃপ্তি—উভয়ই হইয়াছে। গুরুদেবের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। বাহিরে পা দুটা জড়াইয়া ধরিতে পারিলাম না—কেমন একটা লজ্জা আসিল কিন্তু মনে মনে গুরুর প্রণাম পাঠ করিয়া মানসে প্রণাম করিলাম এবং চক্ষু মুদিয়া যেন দেখিতে পাইলাম, বন্ধুবর হাত তুলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

বন্ধু যে মাঝিকে দরাফের আস্তানায় আসিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আমি জানিতাম না। আমি জানিতাম হালিসহরে যাইতেছি।

এই আসা পূর্ব্বকার বন্দোবস্ত বা পথিমধ্যে কৃত বন্দোবস্ত অনুসারে তাহা আমি জানি না ও কখনও জানিতে চেষ্টা করি নাই। একটি মেটে ঘাটে নৌকা লাগিল। দুই পার্শ্বে বন মধ্যস্থলে সরু বনপথ। এই জঙ্গল ভাঙ্গিয়া আমরা একটি রাস্তা দেখিলাম। রাস্তাটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা—বাঁশবেড়িয়া হইতে ত্রিবেণী গিয়াছে। রাস্তার পারেই আস্তানা—৪টি ধাপ দিয়া পশ্চিম মুখে উঠিয়া আমরা একটি সমতল ক্ষেত্রে দাঁড়াইলাম। আমাদের ডান দিকে একটি বিস্তৃত, দক্ষিণ মুখো ঘর, পাথরের ঘর দেখিলাম। ছাদ নাই। গঙ্গা এখানে উত্তর দক্ষিণে লম্বা। বন্ধুবর সমতল ক্ষেত্রে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া ভাবের ঘোরে এই স্তব পাঠ করিলেন।

দরাফ্ খাঁকৃত গঙ্গাষ্টক।

যত্ত্যক্তং জননী-গণৈর্যদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্বান্ধবৈর্যন্মন্
পান্থ দৃগন্ত-সন্নিপতিতে তৈঃ স্মর্য্যতে শ্রীহরিঃ।
স্বাঙ্গে ন্যস্য তদীদৃশং বপুরহো স্বীক্রীয়তে পৌরুষং,
ত্বং তাবৎ করুণা-পরায়ণপরা মাতাসি ভাগীরথি ॥ ১
অচ্যুত-চরণ-তরঙ্গিণি গঙ্গে শশি-শেখর-মৌলি-মালতীমালে
ত্বয়ি তনু বিতরণ-সময়ে দেয়া হরতা ন মে হরিতা ॥ ২
শূন্যীভূতা শমন-নগরী নীরবা রৌরবাদ্যা,
যাতায়াতৈঃ প্রতিদিনমহো ভেদ্যমানা বিমানাঃ।
সিদ্ধৈঃ সার্দ্ধং দিবি দিবিষদঃ সার্ঘ্যপাত্রৈক-হস্তা,
মাতর্গঙ্গে যদবধি তব প্রাদুরাসীৎ প্রবাহ ॥ ৩
পয়ো হি গাঙ্গং ত্যজতামিহাঙ্গং,
পুনর্নবাঙ্গং যদি বাপি চাঙ্গম্।
চরে রথাঙ্গং শয়নে ভুজঙ্গং,
যানে বিহঙ্গং চরণে চ গাঙ্গম্ ॥ ৪
কত্যক্ষীণি করোটয়ঃ কতি কতি দ্বীপিদ্বিপানাং ত্বচঃ,
কাকোলাঃ কতি পন্নগাঃ কতি সুধাধাম্নশ্চ খণ্ডাঃ কতি।
কিঞ্চ ত্বঞ্চ কতি ত্রিলোকজননি ত্বং বারিপূরোদরে,
মজ্জজ্জন্তুকদম্বকং সমুদয়ত্যেকৈকমাদায় যৎ ॥ ৫



কুতো বাপি বীচিস্তব যদি গতা লোচনপথং,
ত্বয়া পীতাম্বরপুরনিবাসং বিতরসি।
ত্বদুৎসঙ্গে গঙ্গে মঙ্গে যদি পততি কায়স্তনুভৃতাং,
তদা মাতঃ শাতক্রতপদলাভোঽপ্যতিলঘুঃ ॥ ৬
ত্বমন্তো লোকানামখিলদুরিতান্যেবদহসি,
প্রগল্ভী নিম্নানামপি নয়সি সর্ব্বোপরিগতান্।
স্বয়ং জাতা বিষ্ণোর্জনয়সি মুরারাতি-নিবহা,
অহো মাতর্গঙ্গে কিমিহ চরিতং তে বিজয়তে ॥ ৭
সুরধুনি মুনি-কন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং,
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিং তে মহত্ত্বম্।
যদি চ গতি-বিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং,
তদ্দিহ তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্ ॥

বন্ধুবর স্তব পাঠান্তে সেইখানেই গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং সমাধিস্থ হইলেন। আমিও সেইখানে বসিয়া মকরবাহিনী গঙ্গা মূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিলাম। তাহাতে আমার হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল। সাধারণ ভজনানন্দ অপেক্ষা এ আনন্দ উচ্চতর সোপানের। আমার সাধনা শেষ হইলে আমি এদিক ওদিক দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। বন্ধু কিন্তু সেই সমাধি অবস্থাতেই রহিলেন। আমি দেখিলাম, উত্তর দিকে যে দক্ষিণ মুখো ঘরটির দ্বারে কপাট আদি নাই ও ছাদও নাই—কেবল চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের প্রাচীর। সেই সব বড় বড় পাথর কি করিয়া এই সমতল ভূমিতে আসিল তাহা ভাবিবার কথা বটে, কেন না নিকটে আসেনসোল ভিন্ন পাহাড় নাই, আর সেখানে এরূপ পাথর পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এ সব প্রস্তরে কাজ করিয়া খণ্ড খণ্ড ও চতুষ্কোণ ও মসৃণ করা হইয়াছে। একক একটি প্রস্তর ৬ হাত লম্বা। প্রকোষ্ঠের মধ্যে তিনটি কবর আছে। দেখিলাম, তাহার উপর কে দুধ ঢালিয়া দিয়াছে—সরবৎ দিয়াছে। রাত্রিতে যে প্রদীপ দেওয়া হয় তাহাও বুঝিতে পারিলাম। এই প্রকোষ্ঠের একটী বড় গবাক্ষ দিয়া ভাগীরথী দর্শন করা যায়। এই গবাক্ষের নীচে অর্থাৎ প্রকোষ্ঠের পূর্ব্বদিকের প্রাচীরের গাত্রে বহির্ভাগে একটি ছিদ্র মধ্যে একটি

কুঠার আছে। লোকে তাহাকে গাজীর কুড়ুল বলে। টানিলে খানিকটা বাহির হইয়া আসে, পরে আর কিছুতেই টানা যায় না। এইজন্য এই স্থানে একটি প্রবচন চলিত হইয়াছে "যেন গাজীর কুড়ুল—নড়ে চড়ে পড়ে না।" যাহাহৌক এক প্রকোষ্ঠে পাচীন মন্দিরের ভগ্নাংশ দৃষ্টি গোচর হয়। দ্বিতীয় প্রাঙ্গনের সম্মুখে আর একটি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকটি মন্দিরস্তম্ভও বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। একটির গাত্রে দেবনাগরী অক্ষর পর্য্যন্ত খোদিত রহিয়াছে। আমি এইরূপে চতুর্দ্দিক দেখিয়া ফিরিয়া আসিলে, আবার বন্ধুসহ নৌকায় উঠিলাম, নৌকা হালিসহরে চলিল। তরণী ছাড়িয়া দিলে আমি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হিন্দু মন্দিরের স্তম্ভ ও ভগ্নাংশ, তথা দেবনাগরী অক্ষরে খোদিত স্তম্ভ গাত্র এই সব যে মুসলমানের আস্তানায় দেখিলাম, তাহার অর্থ কি?

বন্ধু বলিলেন, এক সময়ে উড়িষ্যার কেশরী রাজবংশ ত্রিবেণী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সেই বংশের এক রাজা গজপতি মুকুন্দদেব ত্রিবেণীর বর্ত্তমান পুরাতন বাঁধা ঘাটটি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই মুকুন্দ দেব ত্রিবেণীর ও সরস্বতীর তটে অনেক দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই গাজীর দরগা স্থানে একটি বৃহৎ হিন্দু মন্দির ছিল। তারপর মুসলমানেরা ধর্ম্মের খেয়ালে পড়িয়া সেই মন্দির ভাঙ্গিয়া আপনাদের দরগা ও সমাধি স্থান প্রস্তুত করেন।

দরাফ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবাদ চলিত আছে। একটি প্রবাদ এই। পাণ্ডুয়ার নিকট মহানাদে—এই স্থান হইতে ৪ ক্রোশ পশ্চিমে—এক জন হিন্দু রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম মানরাজা। তাঁহার রাজ্যে একজন মুসলমান স্বীয় পুত্রের মঙ্গল কামনায় গোহত্যা করিয়াছিল। রাজা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ঐ মুসলমানের পুত্রের প্রাণবধ করিতে আজ্ঞা দেন অর্থাৎ যেন কেহ তাঁহার রাজ্যে ভবিষ্যতে আর গোহত্যা না করে। পুত্রের নিধনে মুসলমান কাতর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া দিল্লীর সম্রাটের নিকট নালিস করেন।

দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ সা মান নৃপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য এক দল সেনাসহ সাহসুফী ও জাফর খাঁ গাজীকে প্রেরণ করেন। সাহসুফী সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জাফরের ভাগিনেয়। জাফর খাঁ (দরাফ) গাজী যুদ্ধে



মান রাজাকে পরাস্ত করেন। এই বিজয় ঘোষণ করিবার জন্য সাহসুফী পাণ্ডুয়ার বারদোয়ারী ও এক স্তম্ভ (পেঁড়োর মন্দির) নির্ম্মাণ করেন। ইতিহাসজ্ঞ বলেন তাহা ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে। সুফী মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের জন্য হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। মাতুল জাফর ত্রিবেণীতে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব দেখিয়া, মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার জন্য ত্রিবেণীতে আসেন ও এই স্থানের হিন্দুমন্দির হস্তগত করিয়া মুসলমানের আস্তানা নির্ম্মাণ করেন। এই জাফরের সমাধি স্তম্ভ ৭১৩ হিজরীর বা ১২৯৭ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়।

আর এক প্রবাদ মতে জাফর সুফীকে সঙ্গে লইয়া মুকুন্দাবাদের অন্তর্গত মুণ্ডগাঁ হইতে এই স্থানে মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচার জন্য আগমন করেন। তিনি মহানাদের রাজা মানকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। হুগলির রাজা ভূদেব এই জন্য ক্রোধপরবশ হইয়া মান রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে মান-রাজা হত হয়েন। তাঁহার মস্তক পাওয়া যায় নাই মুসলমানেরা কেবল মাত্র দেহ লইয়া ত্রিবেণীতে কবর দেয়। জাফর গাজী খাঁর পুত্র আগোয়ান খাঁ হুগলির রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করেন। রাজাকে সবংশে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন এবং স্বয়ং রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। এই দম্পতীর কবরও ত্রিবেণীতে আছে।

প্রবাদ আছে, হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী হইয়াও শেষে জাফর খাঁ বা দরাফ গাজী—হিন্দুধর্ম্মের মহিমায় আকৃষ্ট হন। ঘোরতর তপস্যা করিয়া তিনি দেবী সুরধুনীকে পরিতুষ্ট করেন, এবং দেবী চতুর্ভুজা মকরবাহিনী মূর্ত্তিতে গঙ্গা সলিল হইতে উত্থিত হইয়া দরাফকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করেন।

বন্ধু শেষে বলিয়াছিলেন, যে প্রবাদই সত্য হোক না কেন, এটা ঠিক যে একজন মুসলমান গঙ্গার তপস্যা করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন এবং তিনি যে শ্লোক সমূহ দ্বারা গঙ্গার স্তব করিয়াছিলেন, তাহাই দরাফকৃত গঙ্গাষ্টক। মুসলমানের উপর হিন্দু দেবীর কৃপা হইয়াছিল, ইহা হিন্দু মুসলমান সকলে স্বীকার করিতেছেন।

আমরা ক্রমে হালিসহরে আসিয়া পঁহুছিলাম।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

# সেতুবন্ধ রামেশ্বরম।

[ ৩ ]

হোটেলে আসিয়া রান্নার অপেক্ষায় রহিলাম—যথা সময়ে রান্না আরম্ভ হইবে। একজন বুড়া মানুষ অতি সমাদরে আমাদিগকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন, যে তিনি কলিকাতার ও ভাগীরথীর উভয় তীরস্থ প্রধান প্রধান নগর ও গ্রামগুলির বিষয় ও তাহাদের অধিবাসীদের বিষয় অবগত আছেন। বলিলেন, তিনি কলিকাতায় হিসাব নিকাস আফিসে চাকরী করিতেন; তিনি হিন্দুস্থানী বলিয়া পরিচয় দিলেন; এখন ছুটীতে আছেন।

তিনি আমাদের অবস্থা দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং হোটেলের কর্ত্তা ও পাচক উভয়কে ডাকিয়া কি রাঁধিতে হইবে ও কি প্রকারে রাঁধিতে হইবে (অর্থাৎ লঙ্কা ও পেঁয়াজের হাত হইতে যাহাতে উদ্ধার পাওয়া যায়) তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দিলেন। উষ্ণ অন্নে একটু গব্য ঘৃতের ব্যবস্থা করিলেন, আহারান্তে শর্করা ও দুগ্ধের ব্যবস্থাও করিলেন। তিনি মান্দ্রাজী ভাষায় কথা কহিয়া অর্থাৎ তামিল ভাষায় কথা কহিয়া সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন। তারপর যখন আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, এইরূপ খাবার ব্যবস্থা হইল, তখন আমরা কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হইলাম। তিনি যখন আমার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তখন আমার কেমন একটা সন্দেহ জন্মিয়াছিল। হিন্দুস্থানী, না হয় কলিকাতায় চাকরীই করেন, তা বলিয়া বাঙ্গালীদের ঘরের খবর এত কি করিয়া জানিলেন। অমুক গ্রামে অমুকের বাটী তাহার অমুক আত্মীয় অমুকের শ্বশুর ও অমুকের জামাই তিনি এখন অমুক স্থানে, তার এত টাকা মাহিনা, প্রথমে সে অমুক চাকরী করিত, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি দেখিয়া শুনিয়া জেরা আরম্ভ করিলাম, চোখ চোখ শরে তাঁহাকে বিঁধিতে লাগিলাম। তিনি বাণাঘাতে জর জর হইয়া পড়িলেন, কথায় কথায় বাঁধুনী শিথিল হইল। কি বলিতে কি বলিয়া ফেলেন, এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমিও জাঠা, শেল মুদ্গর প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলাম। পূর্ণ পরিচয় দিতে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে সংক্ষেপে বলি।—তিনি হঠাৎ "আচ্ছা—



তা আচ্ছা" বলিলেন। যে স্বরে বলিলেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না, যে তিনি বাঙ্গালী। আমি লাফাইয়া উঠিলাম। তিনি আমার হাত ধরিলেন, গোপনে বাঙ্গালায় বলিলেন, "চেঁচাইবেন না এখনই আমাকে পুলিসে ধরিবে। যেমন আছি তেমনিই পরিচয়েই থাকি নহিলে হোটেল-ওয়ালা বেটা ধরাইয়া দিবে—এদেশের কোন শালাকে বিশ্বাস নাই, আর আজ কাল সময় খারাপ জানেনই ত—বাঙ্গালী সাহেবের চক্ষুশূল।"

আমি ও আমার বন্ধুগণ—কৌতূহলী হইয়া তাঁহার পরিচয় চাহিলাম। তিনিও সংক্ষেপে আমাদের কৌতূহলের তৃপ্তি সাধন করিলেন। তাঁহার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিলে কি জানি যদি তাঁহার কোন বিপদ হয়, এই ভয়ে তাঁহার পূর্ণ পরিচয় দিতে পারিলাম না। পাঠক পাঠিকা তজ্জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। সংক্ষেপে তিনি একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ—একজন বড় চাকুরে—বাঙ্গালীর আত্মীয়, লোকটা নির্ভয় স্বাধীন স্বভাবের ও একগুঁয়ে। দ্বারকাতীর্থে, বদরিকাশ্রমে, নীলাচলে কাবেরী—দ্বীপে শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত মঠ আছে। ইহাদের নাম—সারদা মঠ, যোশী মঠ, শৃঙ্গেরী মঠ প্রভৃতি। এই সকল মঠে প্রত্যেকটিতে এক এক জন মোহান্ত আছেন। তিনিই তীর্থগুরু ও রাজা। এইরূপ একজন বড় মোহান্তের ইনি প্রাইবেট সেক্রেটরী। মোহান্ত মহাশয়ের যদি স্থানান্তরে যাইতে হয়, তবে প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তার অনুমতি লইতে হয়। ইনি কোন প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তার (যাঁহার রাজ্য দিয়া মোহান্ত ও তস্য অনুচরগণ যাত্রা করিবেন) অনুমতি আনিতে গিয়াছিলেন। অনুচরবর্গ বড় সোজা নয়। মনে করুন সঙ্গে যাবে ৫০০ উট, ২০০ হাতী, ৩০০ অশ্ব, ১০০০ সন্ন্যাসী, ২০০ নফর ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের দেশে এ সব নাই—পূর্ব্বে দেশে ৺গঙ্গাসাগরে স্নান উপলক্ষে ও ৺জগন্নাথদেব দর্শন আশয়ে এইরূপ জমাৎ মধ্যে মধ্যে আসিত কিন্তু এখন রেল হইয়া ও বালাই আর নাই। মোহান্ত মহারাজ যখন তীর্থ করিতে যান, তখন এইরূপ জমাৎ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যায়। বলাই বাহুল্য সমস্ত খরচাই তাঁহার। ঐ সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই।

আমরা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। তিনি আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন। কি করিতে হইবে, কেমন

করিয়া থাকিতে হইবে, কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, ও কি আহার করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার নিকট অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম।

আরও শিখিলাম দ্রব্যের তামিল নাম, নীলু=জল পিলু=দুধ ইত্যাদি ইত্যাদি। রন্ধন শেষ হইলে ব্রাহ্মণ খবর দিল। তিনি নিজে গিয়া স্থান সংস্থান করিয়া আমাদের ভাত বাড়াইলেন, আমরা গিয়া বসিয়া গেলাম। তাঁর কৃপায় উদরে গোটাকত অন্ন গেল। যেন বাঁচিলাম। যেন নিজের বাড়ীতে খাইলাম। অবশ্য "ঠিক যেন" নহে, তবে "যেন"। সকলেরই তৃপ্তি হইল। পান তামাকের পর তাঁহার নিকট নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বেও বিদায় লইয়া আমরা তাঞ্জোর ষ্টেসনে আসিয়া রাত্রি ১০৷৷০ সাড়ে দশটার সময় অপর রেলে চাপিলাম। এমন ভিড় কেহ কখনও দেখে নাই। আমরা ফাষ্ট ক্লাসে চাপিলাম। ত্রিচিনপল্লীতে আমাদিগকে নামিতে দিল না, সুতরাং মেলা দেখা হইল না। তিন ক্রোশ আগে আর এক ষ্টেসন আছে। সেখান হইতে কাবেরী দ্বীপে শ্রীরঙ্গম্ মন্দির নিকটে হয়। জনকয়েক বাঙ্গালী সেইখানে নামিয়া যাইবেন মনস্থ করিলেন। সেখানে যাইবার অগ্রে তাড়িত বার্ত্তা গেল। কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়া দিল যেন কাহাকেও সেখানে নামিতে না দেওয়া হয়। সুতরাং যাঁহারা নামিয়াছিলেন, বিফল মনোরথ হইয়া আবার ফিরিয়া আসার পুনর্মূষিক হইলেন।

ত্রিচিনপল্লী প্রকাণ্ড সহর। দক্ষিণ ভারতবর্ষের রেলওয়ের (South Indian Railway) ইহা হাবড়া। অনেক বড় বড় সদাগরী আফিষ আছে। তীর্থযাত্রীরও দেখিবার অনেক জিনিষ আছে। শুনিয়াছি খুব বড় একটা পুকুর আছে। আর গোপনে শুনিয়াছিলাম ত্রিচি হইতে খানিক দূরে একটি মণি মুক্তার পাহাড় আছে। এখানকার লোকে অত বড় নাম উচ্চারণ না করিয়া ত্রিচিনপল্লীকে "ট্রীচী" বলে। এখান হইতে অনেক রেল লাইন বাহির হইয়াছে ও আসিয়া মিলিয়াছে। এ সবই শুনা কথা চক্ষে দেখি নাই। অদৃষ্টে না থাকিলে হয় না। হিসাব বিভাগে কাজ করেন এমন কয়েকজন বাঙ্গালী বাবু ত্রীচীতে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন তাঁহাদের নামও শুনিলাম। তাঞ্জোর হইতে ১ম শ্রেণীতে আমাদের সঙ্গে



যাঁরা আসিয়াছিলেন তাঁহারা এইখানে নামিয়া গেলেন। একজন দক্ষিণ-আমেরিকার ভ্রমণকারী ও একজন গোখ্‌লে প্রতিষ্ঠিত ভারতসেবক সমিতির Servant of India) একজন সভ্য। এখান হইতে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইলাম। সেখানেও বড় ভিড়। বাক্স পেটরা সাজাইয়া বিছানা করিয়া শুইলাম। নীচে উপরে এরূপ স্থানাভাব। যাহাহৌক এইরূপ কষ্টে একটুও নিদ্রা হইল না। রাত্রি ৪টার আমলে মাদুরায় আসিয়া পঁহুছিলাম ও ট্রেন বদল করিতে হইল। মূলপত্র ধরিয়া যে ট্রেনে আসিলাম সে ট্রেন তুতীকরিণ যাত্রা করিল। আমরা অন্য পথ দিয়া মাল্‌টাপাল অর্থাৎ সমুদ্রের উপকূল ষ্টেসনে যাইব। যে সমুদ্রের উপকূলে ঐ ষ্টেসন সাধারণ তীর্থযাত্রী তাহাকে বলে "হর বোলার খাঁড়ি"। একজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী, বোধ হইল পর্তুগীজ বা পর্তুগীজ-সঙ্কর তনয় আমাদের মোট ঘাট লইয়া গিয়া আমাদিগকে একটি দ্বিতীয় শ্রেণী গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আমরা সুখী হইয়াছি কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা 'হাঁ' বলিবা মাত্র হস্ত পাতিলেন। কথার আভাসে বুঝিলাম, তাম্রখণ্ডে কুলাইবে না—রৌপ্যখণ্ডের দরকার। তখন 'না' করিলাম। কর্ম্মচারী চলিয়া গেলেন। আমরাও বিছানা পাতিয়া শয়ন করিলাম।

যেমন শয়ন করিয়াছি অমনই কর্ম্মচারী মহাশয় আসিয়া বলিলেন—সেই পরিচিত কর্ম্মচারী—আপনাদিগকে এ গাড়ী ত্যাগ করিয়া অন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইতে হইবে। "কেন" জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন—যে এ গাড়ী মাল্‌টাপান যাইবে না—এখানে কাটিয়া রাখা হইবে। আমরা ত শুনিয়া অবাক্। প্রশ্ন হইল তবে কেন আপনি এ গাড়ীতে আমাদের উঠাইলেন। উত্তর হইল—তখন মনে করিয়াছিলাম এই গাড়ী যাইবে। তখন রাগ করিয়া বলিলাম, ঘুষ না পাওয়ায় আপনি অনর্থক কষ্ট দিতেছেন—আমরা নামিব না। কর্ম্মচারী চলিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে ষ্টেসন মাষ্টারকে লইয়া আসিলেন। তিনি আমাদিগকে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে বলিলেন। আমরাও সব কথা খুলিয়া বলিলাম। ষ্টেসন মাষ্টার মহাশয় ঘুষের ভাগীদার কি না জানি না, কিন্তু তিনি বলিলেন, এ গাড়ী যাইবে না, আপনাদিগকে পড়িয়া থাকিতে হইবে। আমরা এ গাড়ী এখনই কাটিয়া সাইডীং লইয়া

যাইব। তখন আমি বলিলাম "যে মুটে ভাড়া বড় বেশী, আট আনার কম লয় না, সে খরচা কে দিবে ?"—ষ্টেসন মাষ্টার বলিলেন, সে খরচা লাগিবে না। আমার কুলীরা আপনাদের মাল বহিয়া দিবে। তখন অগত্যা অপর গাড়ীতে যাইতে হইল। সেখানে দেখি, আলো নাই, অতি অপ্রশস্থ এক গাড়ী তাহা আবার যাত্রীতে পূর্ণ—বসিবার স্থান নাই। মোটেতে ঘর পুরিয়া গেল। আমরা কর্ম্মচারীকে শুনাইয়া শুনাইয়া গালি পাড়িতে লাগিলাম। কিন্তু উপায় নাই। তাহাতে আবার ঘরে জল নাই—আতান্তর। ষ্টেসন মাষ্টারের নিকট যাইয়া সব বলিলাম, তিনি কথাই কন না। রিপোর্ট করিব বলিয়া ভয় দেখাইলে, তিনি বলিলেন, গাড়ী ছাড়িবার আগে জল পাইবেন।

প্রত্যুষে গাড়ী ছাড়িল, ষ্টেসন মাষ্টার সত্যরক্ষা করিয়া এক বাল্‌তী মাত্র জল ছাদের গর্ভে ঢালিয়া দিলেন—তাহার আবার কতক পড়িয়া গেল। অতি প্রত্যুষে গাড়ী ছাড়িল, জয়গুরু বলিয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিলাম। একটু আলো হইলে দেখিলাম একজন কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ বসিয়া আছেন। পরিচয়ে জানিলাম তিনি সিংহল দ্বীপবাসী হিন্দু সন্তান—তীর্থ করিতে ভারতে আসিয়াছেন। সিংহল দেশের অনেক কথা, রাবণের বাড়ী ঘর, মধুবন ইত্যাদি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে সব অনেক কথা। তাঁহার সহিত বেশ ভাব হইল।

মাদুরা ছাড়িবার সময় মাদুরার অসংখ্য নারিকেল বৃক্ষ দেখিলাম। ছোট ছোট চারা গাছের বাগান। মাদুরা প্রকাণ্ড সহর। এখন বিদায় হইলাম, ইচ্ছা ফিরিবার সময় দেখিব। কত নদী পার হইলাম তার সংখ্যা নাই। ময়দানের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া নূতন নূতন ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম। প্রথমেই নজরে পড়িল শ্রীমান ওল। চসা জমীতে ওল ক্ষেতের পর ক্ষেত চসিয়া গিয়াছে—বক্ষে ধরিয়া আছে ওল গাছ—বুঝিলাম, এখানে ওলের চাস হয়। তারপর দেখিলাম আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার—বকফুলের গাছের চাষ। বড় বড় বক গাছ দাঁড়াইয়া আছে। বক বৃক্ষের তলায় পানের বরোজ। আমাদের দেশে যেমন বরোজ করে ঠিক তেমনি করিয়া ঢাকা, তবে বাঁশের বদলে বকগাছ অবলম্বন। বকগাছে অনেক পান গাছ



উঠিয়াছে। কি তাল গাছের সৃষ্টি—অনেক তাল গাছ। তবে যতই দক্ষিণে যাইতে লাগিলাম, ততই নারিকেল গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কলা বাগানও দেখিলাম। আর এক ব্যাপার দেখিলাম, গ্রামের প্রান্তভাগে —মাটীর কি কাঠের জানি না, বোধ হয় যেন মৃত্তিকার গঠন ঘোড়সোয়ার মূর্ত্তি, হস্তী, উট, যোদ্ধা, সব মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। তীর, ধনু, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে মূর্ত্তিগণ সুসজ্জিত। কখনও বা মাত্র একটি দল; কখনও বা যুদ্ধার্থী দুই দল পরস্পর সম্মুখে অবস্থিত। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার সদুত্তর পাই নাই।

আমার মনে হয় এ এক প্রকার কিণ্ডারগার্টেন—গ্রামের বালক ও যুবকদিগের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত। ঠিক কিণ্ডারগার্টেন জানিয়া সংস্থাপিত না করিলেও, দেখিয়া বোধ হয় সেই উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য মূর্ত্তিগণের সৃষ্টি। বৃক্ষাদি আমাদের দেশের ন্যায়, খেজুর, আম, তেঁতুল যথেষ্ট, বাব্‌লাও ততোধিক। অশ্বত্থ বটের ত কথাই নাই। যেখানে রাস্তা তাহার দুই পার্শ্বে অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষের ঘন সন্নিবিষ্ট শ্রেণী দূর বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। হিন্দু রাজাগণ পান্থজনের ক্লেশ নিবারণ জন্য প্রথমে বৃক্ষ রোপণ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তারপর সেই প্রথাই চলিয়া আসিয়াছে। আমাদের দেশে বড় রাস্তার ধারে সরকার এখন আর অশ্বত্থ, বট রোপণ করেন না। সের সার রাস্তার পাশে (গ্রাণ্ড ট্রঙ্করোড) দেখিতে পাই আম কাঁটাল রোপিত হইতেছে। ইহা অপেক্ষা বট, অশ্বত্থ, গয়া, পাকুড়, খেজুর, জাম, বাব্‌লা রোপণ অধিক উপকারের সম্ভাবনা। যাহাহৌক বোধ হয় একদিন সুবুদ্ধি ফিরিয়া আসিবে।

ষ্টেসনগুলি সবই এক প্রকারের। খাবার কিছুই পাওয়া যায় না। বেলা দশটার সময় কোন কোন ষ্টেসনে থালা আসনে আসিলেন শ্রীমান হালুয়া। আমরা দূর হইতে সভয়ে নমস্কার করিলাম। কেবল মালায়া পড়ম্‌ খরিদ করিয়াছিলাম অর্থাৎ কদলী—বা পহারিয়া কদলী। সারা রাস্তাটা জল জল করিয়া প্রাণ বাহির করিলাম। গাড়ীতে দিনের বেলায় দেখিলাম, আর চারি জন বাঙ্গালী আছেন, তাঁহারা আমাদের নিকট জল আছে কি না জানিতে আসিয়াছিলেন। আমাদের গাড়ী গর্ভ-ভারাক্রান্তা

আসন্ন-প্রসবা রমণীর ন্যায় ধীরে মন্থরে—কখনও বা ধীর মন্থরে গমন করিতেছেন। রাস্তা আর ফুরায় না, তাল গাছ আর ফুরায় না। তিন সহস্র তাল গাছ একত্রে কখনও কি দেখিয়াছেন। "রামনাদ" ষ্টেসনের নিকট তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই রামনাদে একজন রাজা আছেন। তাঁহার নাম রামনাদ—রাজা। ইঁহার গাত্রে ১৮৯৪ সালে অনেক হীরক দেখিয়াছিলাম। সেবার মান্দ্রাজে কংগ্রেস হইয়াছিল, হয় এই রাজা কি ইঁহার পিতা কংগ্রেস দেখিতে গিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের কার্য্যে যোগ-দান করিয়াছিলেন। সে যাহাহৌক দুই একটা ষ্টেসন বাদে তাঁতিরা এক প্রকার জরীদার কাপড় বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। অনেকে কাপড় কিনিলেন। আমি দর করিয়াছিলাম। অগ্নি মূল্য বলিয়া ফেরৎ দিলাম। আমাদের সর্ব্বশেষ ষ্টেসনের নাম মাণ্টাপান Mantapan। এই নাম হইতে কি মর্ত্তমান রম্ভার নাম হইয়াছে, ইহা ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। কাহারও কাহারও মতে Martaban নাম হইতে মর্ত্তমান রম্ভার নাম করণ হইয়াছে। সে যাহাহৌক মর্ত্তমান চক্ষে দেখিবার যো নাই। যাহা পাওয়া যায় তাহার নাম মালায়া পাড়ম্—সে সেই একঘেয়ে কলা। আর দাম কি এক পয়সায় একটা। ক্রমে রেল ঘুরিয়া যেন নীচু জমীতে যাইতে লাগিল। একটি গ্রামও নয়নে পড়িল। আমরা গ্রামের মধ্য স্থান দিয়াই যাইতে লাগিলাম। ক্রমে ও কি? দূরে—দূরে যেন নীল জলরাশি ফুলিয়া উঁচু হইয়া উঠিয়া আকাশকে চুম্বন করিতেছে—দূরে দূরে আকাশে সমুদ্রে মিশিয়া গিয়া কেবল একটি রেখার ন্যায় দিঙ্মণ্ডলে দেখা যাইতেছে। রেলের গাড়ীর এ পাশে যাহা দেখিলাম রেলের গাড়ীর ও পাশেও ঢুকিয়া গিয়া তাহাই দেখিলাম। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে যেমন অপর দিকে শকট—শকট গবাক্ষ দিয়া মুখ বাহির করিব অমনই কোথা হইতে বসন্তের মলয় মারুৎ আসিয়া সোৎসাহে প্রেমের আবেগে গৌরবে আমার গাত্রে ঘন ঘন চুম্বন প্রদান করিল। আমি অনিলের সোহাগে অনল হইয়া উঠিলাম। আমার অনিদ্রা, অতৃপ্তি, অনশন, অনাহার এক ফুৎকারে উড়িয়া গেল, আমি যেন আর একটা মানুষ হইয়া গেলাম। মলয় মারুৎ যেন আমায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। এতক্ষণ পায় নাই, এইবার সে দেখা পাইয়াছে কোই



আবেগ ভরে ফর্ ফর্ সর্ সর্ করিয়া কত কি কথা আমার কর্ণ কুহরে ঢালিয়া দিল। আমি অমৃত সিঞ্চনে অভিসিক্ত হইয়া সুখের শায়ারে ডুবিয়া গেলাম —আর জলমগ্ন ব্যক্তির মৃত্যুকালীন আ-বাল্য জীবনচ্ছবি চিত্রপটে অঙ্কিত দর্শনের ন্যায় আমার আবাল্য জীবনচ্ছবি সুমুখ দিয়া বায়স্কোপের মত ভাসিয়া গেল। বহুকাল হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পোষিত বাসনা-লতা আজ আমার ফলবতী। আজ সত্য সত্যই আমি সেতুবন্ধ রামেশ্বর দেখিতে আসিয়া সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত। আমি হিন্দু—আমার আজ সুখের দিন। তখন মনে হইল আমি কিন্তু একা। সুখের ভাগ দিবার জন্য আপনার লোক কেহ সঙ্গে নাই। আমি গুরুদেবকে প্রণাম করিলাম। তাঁহারই ইচ্ছা।

ক্রমে ধীরে অতি ধীরে বায়স্কোপ যন্ত্র কালিয়াডোস্‌কোপ যন্ত্রে পরিণত হইল। মনে হইল কোথা উত্তর কোশল, কোথা বা অযোধ্যাপুরী, আর কোথা বা সিংহলে রাবণ। কোথা অযোধ্যা আর কোথা লঙ্কা। সেই দিনে কি করিয়া জনকনন্দিনী সীতা দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া দণ্ডকারণ্য পর্য্যন্ত—পঞ্চবটী পর্য্যন্ত কেবল মাত্র পদদ্বয়ের সাহায্যে আসিয়াছিলেন, বরং রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ক্ষত্রিয় সন্তান, যোদ্ধা। পুরুষের দশ দশা বলিয়া সবই সহ্য করিতে পারেন। কিন্তু ননীর পুতলী সেই সীতা দেবী কি করিয়া সরযু তীর হইতে গোদাবরী তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাই অবাক হইয়া ভাবিবার কথা। অথবা ভুলিতেছি সতীর পক্ষে সকলই সম্ভব।

যে সতী পতির জন্য সহাস্য বদনে মৃত পতির চিতায় অনল কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া পড়ে তাঁহার পক্ষে তুচ্ছ ভ্রমণের ক্লেশ কি আর ক্লেশ? কেবল মাত্র পর পুরুষ স্পর্শ ভয়ে হনুমানের পৃষ্ঠাবলম্বনে লঙ্কার অশোক বন ত্যাগ করিয়া রাম শিবিরে আসিতে জনকনন্দিনী নারাজ হইয়াছিলেন। এদিকে সীতার এই আদর্শ চরিত্র আবার তাহার উপর দেব চরিত্র লক্ষ্মণের ভ্রাতৃ-বৎসল লক্ষ্মণ কেবল সৌভ্রাত্রের খাতিরে রাজ্য সুখ তুচ্ছ করিয়া স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া বনে আসিয়াছিলেন। তাই কি শেষ তাই কি সব? চতুর্দ্দশ বৎসর অনাহার, অনিদ্রা, ছায়ার ন্যায় সঙ্গে থাকিয়া সীতা দেবীকে রক্ষা করিতেন অথচ সীতার মুখ দেখেন নাই। কোথায় ত্রেতা আর কোথায় আজ কলি। একদিন এই স্থান বানর কটকের কোলাহলে মুখরিত ছিল। এক

দিন এইস্থানে নর বানরের সঙ্গে রাক্ষসদিগের মহা সমর হইয়াছিল, তাহাতে রক্তের নদী বহিয়াছিল। সমুদ্রের নীল জল রক্তবর্ণ হইয়াছিল। সহস্র সহস্র রাক্ষস বানর কাতর আর্ত্তনাদ সহকারে জীবন ত্যাগ করিয়াছিল। আর আজ স্থানটি যেন ঘুমাইয়া রহিয়াছে। কেবল কলের শব্দ আর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। একদিন রাবণের পুষ্পক রথ এই সমুদ্র অবলীলাক্রমে পার হইয়া লঙ্কায় গমন করিত, আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে বোধ হয় দেখিব জর্ম্মান কাউণ্ট জ্যাপেলিনের বা অন্য কাহারও নির্ম্মিত আকাশ-যান অনায়াসে ভারত হইতে আকাশ পথে সিংহলে যাত্রী লইয়া গমনাগন করিতেছে। রাবণের পুষ্পক রথ তোমরা এতদিন অবিশ্বাস করিয়াছিলে—কিন্তু আর পার কি? বিশ্বাসের কথাটা যখন উঠিল তখন কথা প্রসঙ্গে ভাই পাঠক একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; এখন গীতা-যুগ সকলেই গীতা পড়েন গীতা মানেন, গীতা বিশ্বাস করেন, অনেকে গীতা মুখস্থ বলিতে পারেন। এমন গীতা শ্রীভগবানের মুখনিস্থত বাণী--গীতার কথা বিশ্বাস করেন কি? ভগবান বলিয়াছেন, আমিই বাসুকী, আমিই অনন্ত, আমিই অশ্বত্থ বৃক্ষ ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন এ কথা বিশ্বাস করেন কি? হিন্দুয়ানীর খানিক বাদ দিব আর খানিক বিশ্বাস করিব—ইহা চলে না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সেই বিপদে পড়িয়া রামচন্দ্রের বানর কটককে দাক্ষিণাত্যের লোক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহার কথা স্বতন্ত্র—কেন না তিনি কৃশ্চন ছিলেন। স্বধর্ম্মত্যাগী কৃশ্চন যাহা খুসী তাহাই করিতে পারেন, যাহা খুসী তাহাই বলিতে পারেন। নহিলে তিনি ইন্দ্রজিৎকে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন দিবেন কেন?

এমন সময় বৃদ্ধ দাদা মহাশয় আমাকে হস্ত ধরিয়া টানিলেন—আমার ভাবের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বলিলেন, "ওরা স্নান করিতেছে—স্নান করিয়া লইবে?—সমুদ্র স্নান বড় ভাল।"

আমি দেখিলাম অপর বাঙ্গালী বাবুরা গাম্‌চা লোটা লইয়া সমুদ্র তটে উপস্থিত—একখণ্ড প্রস্তরে বসিয়া ক্ষিপ্রহস্তে স্নান-কার্য্য সারিতেছেন। যেমন দেখা অমনই উঠা। আমরাও তিন জনে একে একে স্নান করিয়া লইলাম। জলে নামিতে সাহস হইল না—বড় ঢেউ হইতেছিল, তাহার



উপর সমুদ্র সেখানে কত গভীর জানা নাই, কাহাকেও শুধাইবার যো নাই—ভাষা বিভ্রাট। সুতরাং পাথরে বসিয়াই বায়স-স্নান হইল। তৃপ্তি হইল না, বালিতে গা পূর্ণ হইয়া গেল। কোন মতে স্নান সারিয়া গাড়ীতে আসিয়া মোট ঘাট গুছাইতে লাগিলাম ও জাহাজের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। জাহাজে রামেশ্বর দ্বীপ হইতে যাত্রী লইয়া আসিবে, যাত্রীদের নামাইয়া দিয়া আবার যাত্রী লইয়া—আমাদিগকে লইয়া আবার রামেশ্বর দ্বীপে যাইবে। এখানে জাহাজে উঠিবার জন্য একটি জেঠি আছে। আমাদের বাম দিকে দূরে দেখিলাম, জলের উপর কাল কাল পাথরের একটি রেখা চলিয়া গিয়াছে। ঠিক যেন পাথরগুলি জলে ভাসিতেছে। এইটিই রাম চন্দ্রের নির্ম্মিত সেতু—সিংহল পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহাই সাহেবদের Adam's Bridge—আদমের সেতু। তবু ভাল, সেতু পর্য্যন্ত স্বীকার; তবে রামচন্দ্র না করিয়া আদম করিয়াছেন। ভাল ভাল। এখন এই সেতুর দুই স্থান বিচ্ছিন্ন। রামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া যখন অযোধ্যা যাইবার অয়োজন করিতেছিলেন তখন সমুদ্র আসিয়া করযোড়ে বলিলেন, "প্রভো আমার দশা কি হইবে—আমি কি এমনই অবস্থায় থাকিব? তাহা হইলে ত শৃগাল কুক্কুরে আমাকে উল্লঙ্ঘন করিবে—আমার উপায় করুন।" সমুদ্রের নালিশ সঙ্গত মনে করিয়া অথচ সেতুবন্ধ কীর্ত্তি বজায় রাখিবার জন্য, উভয় দিক বজায় করিবার জন্য রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে অনুমতি প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ স্বীয় ধনুকের হুল দিয়া সেতুর দুই স্থান কাটিয়া দিলেন। এখন শৃগাল কুকুর কেন—মানুষেরও সেতু দিয়া পার হওয়া অসম্ভব। লক্ষ্মণ ধনুকের হুল দিয়া যে দুই স্থান কাটিয়া দিয়াছিলেন, তাহার একটি রামেশ্বরম্ দ্বীপের এক প্রান্তে। এখানে একটি তীর্থ হইয়াছে—নাম "ধনুষ কোটি"। লক্ষ্মণের ধনুর কোটি দিয়া কর্ত্তিত হইয়াছিল, এই কথা স্মরণ করাইবার জন্যই বোধ হয় তীর্থের নাম "ধনুষ কোটি"। এখন এই স্থান এই তীর্থ পর্য্যন্ত রেল গিয়াছে। অর্থাৎ মাল্‌টাপানে রেল গাড়ী হইতে নামিয়া জাহাজে চাপিতে হয়। জাহাজ ঘণ্টা দুই পরে রামেশ্বরম্ দ্বীপে যাত্রীগণকে নামাইয়া দেয়। যাত্রী নামিয়া দেখেন একখানি রেল গাড়ী সজ্জিত—তিনি সেই গাড়ীতে আরোহণ করেন। এক স্থানে ষ্টেসন আছে, তাহার নাম রামে-

শ্বরম্। এখানে নামিয়া রামেশ্বর মন্দিরে যাইতে হয়। মন্দিরটি সমুদ্র কিনারে অবস্থিত, সুতরাং পল্লীটিও বটে। মন্দির ষ্টেসন হইতে প্রায় দুই মাইল রাস্তা হইবে, কি কিছু কম। যাঁহারা এখানে না নামিয়া একেবারে রেল প্রান্তে যান তাঁহারাও সমুদ্র তটে গিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানেই তীর্থ—ধনুষ কোটি তীর্থ। কবে কোন্ ত্রেতা যুগে লক্ষ্মণ ধনুকের হুল দিয়া সেতু কাটিয়া দিয়াছিলেন—আজিও আমরা সেই কথা স্মরণ করিবার জন্য "ধনুষ কোটি" নাম মুখে উচ্চারণ করিতেছি। এই ধনুষকোটি তীর্থে যাত্রীগণের বিশেষ কষ্ট—আহারীয় দ্রব্যাদি কিছুই পাওয়া যায় না। তাহার উপর মশার অত্যাচার। কোনরূপে ডুবটি দিয়া চলিয়া আসিতে হয়। গাড়ীও নাই। আজ একখানি কাল একখানি—কষ্টের অবধি নাই, থাকিবার স্থানও নাই। এইবার বোধ হয় ভাল হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্
প্রাপ্ত ১৩.. সাল

# মেঘদূতে মেঘের পথ।

## ( রামগিরি )

মেঘদূতের বিরহি যক্ষের নির্ব্বাসন স্থান "রামগিরি"র পুণ্যাশ্রম। মহাকবির বর্ণনায় আছে জনকরাজ-নন্দিনী রামপ্রিয়া সীতাদেবী এখানকার আশ্রম জলাশয়ে স্নান করিয়া সরোবরগুলিকে পুণ্যতোয় করিয়াছিলেন। মেঘদূতের গল্পটি খুব ছোট। কুবেরের অনুচর জনৈক যক্ষ কোন কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা করাতে, যক্ষাধিপতি তাহাকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন যে সে এক বৎসর কাল প্রিয়াবিরহিত হইয়া রামগিরির আশ্রমে বাস করিবে। এই অনুচর যক্ষের নির্ব্বাসন কাল আটমাস কাটিয়া গিয়াছে। এমন সময় একদিন বর্ষাকালে পর্ব্বতাগ্রে একখণ্ড মেঘ দেখিয়া যক্ষবর প্রিয়াবিরহে বড়ই আকুল হইলেন। আকুলতা বশতঃ মেঘকে কল্পনায় প্রাণ বিশিষ্ট মনে করিয়া, তাহাকে নিজ প্রিয়তমার কাছে দূত করিয়া যক্ষ রাজধানী অলকায় পাঠাইবার কল্পনা করিতেছেন। তিনি মেঘকে বলিয়া দিলেন "উত্তর দিকে এই এই পথে নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া অলকায় যাইবে এবং পুরী মধ্যে আমার বাসগৃহ দেখিবে। সেখানে পতিবিরহবিধুরা মৎপত্নীকে দেখিয়া তাঁহাকে বলিবে যে আমি বাঁচিয়া আছি এবং আরো বলিবে আর চারিমাস মাত্র কষ্টে কাটাও, শাপান্তে আমাদের পুনর্মিলন হইবে"। মেঘদূত দুই খণ্ডে বিভক্ত; পূর্ব্বমেঘ ও উত্তরমেঘ। পূর্ব্বমেঘে মেঘের পথের বর্ণনা আছে; এবং উত্তরমেঘে অলকার বর্ণনা, যক্ষের নিজের গৃহের বর্ণনা এবং তাঁহার বিরহাবস্থা ও মনোভাবের সুনিপুন বর্ণনা আছে। কাব্যাংশে এই বর্ণনা জগতে অতুলনীয়। সে বিষয়ে এ প্রবন্ধে কিছুই বলা হইবে না। পূর্ব্বমেঘে পথের যে বর্ণনা আছে তাহাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। মেঘ অনেক দেশ দেশান্তর পর্ব্বত, নদী, বন, ভাঙ্গিয়া তবে অলকায় পঁহুছিবেন। এই বর্ণনা হইতে ভারতবর্ষের উত্তর ভাগের তৎকালীন ভূগোল বৃত্তান্ত কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারা যায়।

এই মেঘের পথ রামগিরি হইতে অলকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যে যে

সকল নদ নদী-উপবন জনপদাদির বর্ণনা আছে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মহাকবি তৎসংসৃষ্ট এক আধটুক ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাঁহার কাব্য আরো মধুর করিয়াছেন। এই বর্ণনায় শুধু ভৌগলিক নয় কিয়ৎ পরিমাণে ঐতিহাসিক তত্ত্বও পাওয়া যায়। রামগিরি মেঘের পথের এক প্রান্ত বলিয়া, রামগিরির স্থান নির্দ্দেশ অতি প্রয়োজনীয়। এক্ষণে দেখা যাক্ রামগিরি কোথায়।

"পূর্ব্বমেঘে"র বর্ণনান্তে রামগিরির পরেই উচ্চমান্ ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। তাহার পরই আম্রকূট পর্ব্বত এবং রেবা অথবা নর্ম্মদা নদীর এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের বর্ণনা। এই বর্ণনা হইতে বেশ বোঝা যায় রামগিরি বিন্ধ্য-পর্ব্বতের সন্নিহিত এবং নর্ম্মদার উৎপত্তি স্থানের নিকটবর্ত্তী। বিন্ধ্যপর্ব্বত ও নর্ম্মদা নদীর সন্নিহিত বলিয়া আম্রকূট পর্ব্বতকে বর্ত্তমান অমরাকণ্টক পর্ব্বত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্র দেখিলেই ইহা বেশ প্রতীয়মান হইবে। আম্রকূট বিন্ধ্যপর্ব্বতের এক রকম পূর্ব্বভাগ। মেঘের গতি মালভূমি হইতে কিঞ্চিৎ পশ্চিম হইয়া উত্তর-বাহিনী হইয়াছে। তারপর মেঘের পথ প্রথমে আম্রকূট, পরে নর্ম্মদা ও তৎপরে বিন্ধ্য হইয়া। ইহার পর দশার্ণ দেশ ও বেত্রবতী নদী। তৎপরে মেঘের পথ কিঞ্চিৎ বক্র হইয়া উজ্জয়িনী নগরে গিয়াছে। পুনরায় মেঘের উত্তর বাহী বরাবর সোজা অলকা পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহা হইতে খুব স্পষ্ট বুঝা যায় রামগিরি বিন্ধ্যপর্ব্বতের অতি নিকট-সংলগ্ন কোন পর্ব্বত অথবা কিয়দ্দক্ষিণস্থিত কোন ভিন্ন গিরি। মল্লিনাথ তাঁহার সঞ্জীবনী ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন রামগিরি চিত্রকূট পর্ব্বত। কেহ কেহ বলেন মল্লিনাথের এই ব্যাখ্যা ভুল। তাঁহারা বলেন, রামগিরি চিত্রকূট হইতে পারে না, যেহেতু চিত্রকূট পর্ব্বত বিন্ধ্যগিরির উত্তরে। রামায়ণের মতে চিত্রকূট প্রয়াগ অথবা এলাহাবাদ হইতে মাত্র দশক্রোশ দক্ষিণে। এদিকে কাব্যের বর্ণনানুসারে রামগিরি বিন্ধ্যের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহারা আর একটি স্থানকে রামগিরি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বিন্ধ্যগিরির অনেক দক্ষিণে এবং নাগপুরের উত্তরে এক পর্ব্বত পাওয়া যায়। তাহার নাম রামটেক্ বা রামটিকি। মহারাষ্ট্র ভাষায় অনুবাদ করিলে এই শব্দের অর্থ হয় রামগিরি। বর্ত্তমানকালে এই



স্থান রামনামপূতও বটে। কাজেই অনেকে অনুমান করেন মহাকবি কালিদাস এই রামটেক্‌কে মনে করিয়াই রামগিরির উল্লেখ করিয়াছেন। আজকাল-কার কলেজের ছেলেদের জন্য মেঘদূতের যে সকল Edition বাহির হইয়াছে তাহাতেও ব্যাখ্যাকারকেরা কেহ কেহ বলেন যে নানাপ্রকার গবেষণায় ঠিক হইয়া গিয়াছে যে নাগপুরের কাছে "রামটেক"ই রামগিরি এবং এইমত অভ্রান্ত। একখানি Edition এ ইংরাজিতে এইরূপ লেখা আছে; Mallinath takes Ramgiri to be the Chitrakuta, a mountain in Bundelkhand. Modern researches determine the position of Ramgiri in the vicinity of Nagpur. It appears therefore that Ramgiri is the modern Ramteka. এই সকল Edition হইতে বুঝিবার যো নাই Modern Research টা কি এবং কেনই বা এই মত অভ্রান্ত। তবে *therefore* এবং অভ্রান্ততা এইরূপ কথার উপর খুব জোর দেওয়া আছে। Modern Research কি তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ Wilson সাহেবকৃত "মেঘদূতে"র সুমধুর ইংরাজী অনুবাদের টীকায় পাওয়া যায়। তাহা এই :—

Ramgiri.—Is a compound term signifying the mountain of Rama and may be applied to any of those hills in which the hero resided during his exile or peregrinations. His first and most celebrated residence was the mountain *Chitracuta* in *Bundelkhand*, now known by the name of *Comptah*, and still a place of sanctity and pilgrimage. We find that tradition has assigned to another mountain, a part of the *Kimoor* range, the honour of affording him and his companions, *Sita* and *Lacshmana*, a temporary asylum upon his progress to the South, and it is consequently held in veneration by the neighbouring villagers; see Capt Blunt's Journey from *Chunargur* to Sertnagoodum, Asiatic Researches, 760. An account of a journey from *Mirzapore* to *Nagpore*, however in the Asiatic Annual Register for 1806 has determined the situation of the scene of the present poem, to be in the vicinity of the latter city the modern

name of the Mountain is there stated to be *Ramtic* ; it is marked n the map Ramtege, but I understand the proper word is *Ramtinci*, which in the Mahratta language has probably the some import as Ramgiri, the hill of *Rama*. It is situated but a short distance to the north of Nagpore, and is covered wtth buildings consecrated to *Rama* and his associates, which receive the periodical visits of numerous and devout pilgrims."

উপরিদ্ধৃত কথা হইতে বুঝা যাইতেছে Wilson সাহেবের মতে রামগিরি চিত্রকূটও হইতে পারে এবং রামটেকও হইতে পারে।

আসল কথা এই রামায়ণের একটি বিবরণ হইতে পণ্ডিতদের মনে হঠাৎ একটু খট্‌কা লাগে। রাম বনবাসের পথ বর্ণনা উপলক্ষে, রামায়ণে, চিত্রকূটের বর্ণনা আছে। রামায়ণের মতে চিত্রকূট প্রয়াগতীর্থ সন্নিহিত ভরদ্বাজাশ্রম হইতে মোটে দশ ক্রোশ দূরে।

"দশক্রোশ ইতস্তাত গিরির্যস্মিন্ নিবৎস্যসি।<br>
মহর্ষি সেবিতঃ পুণ্যঃ সর্ব্বতঃ শুভদর্শনঃ॥<br>
বনালাঙ্গুলানুচরিতো বানরর্ক্ষ নিষেবিতঃ।<br>
চিত্রকূট ইতি খ্যাতো গন্ধমাদন সন্নিভঃ॥

অযোধ্যাকাণ্ড ৫৪ সর্গ ২৮৩২৯ শ্লোক।

প্রয়াগতীর্থ প্রাচীনকালে যেখানে ছিল এখনো সেইখানে আছে। এই প্রয়াগের ১০ ক্রোশ দক্ষিণে চিত্রকূট হইলে এই পর্ব্বত বিন্ধ্যের অনেক উত্তরে হইয়া পড়ে। এই জন্য কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন রামগিরি চিত্রকূট হইতে পারে না। আর হাতের কাছে রামটেক বলিয়া একটা রামনামপূত এবং তীর্থে পরিণত পর্ব্বত পাওয়া যাইতেছে। অতএব সোজা সিদ্ধান্ত 'রামটেক'ই রামগিরি।

এই সিদ্ধান্তের মধ্যে যে ভুল আছে তাহা প্রদর্শন করা এবং চিত্রকূটই যে রামগিরি তাহা প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। যে সকল পণ্ডিতেরা চিত্রকূট প্রয়াগের দশ ক্রোশ দূরে এই বর্ণনা পড়িয়া পিছাইয়া গিয়াছেন তাঁহারা রামায়ণের পরবর্ত্তী কাণ্ডগুলিতে চিত্রকূট



সম্বন্ধে কি কি কথা আছে তাহা আর ভাল করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। চিত্রকূটে ভগবান্ রামচন্দ্র অনেক দিন অনেক বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন এবং রামায়ণের অসংখ্য স্থানে চিত্রকূটের প্রসিদ্ধি এবং বিখ্যাতির বর্ণনা আছে। সেইগুলি আলোচনা করিয়া এবং অন্য প্রমাণ প্রয়োগ আমরা দেখাইব যে চিত্রকূটই রামগিরি এবং মহাকবি চিত্রকূট মনে করিয়াই রামগিরির উল্লেখ করিয়াছেন।

কালিদাস মহাকবি ছিলেন। তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য লিখিয়াছেন, ভূগোল বা ইতিহাস লেখেন নাই। কাব্যের সত্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার জন্য তিনি ইতিহাস বা ভূগোলের সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বাধ্য নহেন। এই কথা বলিলেই তাঁহার "রামগিরি" চিত্রকূট হইতে পারে। তবে তিনি "বক্র পন্থা" ইত্যাদি বলিয়া, যখন উজ্জয়িনীর প্রকৃত স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন বোধ হয় তিনি তাঁহার সময়ের জনপদ নদ নদী প্রভৃতির ভৌগলিক অবস্থিতি বেশ যথাযথ জানিতেন এবং সেই জন্য তাঁহার ভুল করিবার তত সম্ভাবনা ছিল না। এইজন্য অধুনাতন টীকাকারেরা কেবল মল্লিনাথের ভুল বলিয়া কালিদাসকে বাঁচাইতে চাহেন। তাঁহারা বলেন কালিদাস "রামটেককে" মনে করিয়াই "রামগিরি"র উল্লেখ করিয়াছেন। এখন কে বলিয়া দিবে মহাকবির মনে "রামটেক" ছিল কি চিত্রকূট ছিল ?

কালিদাস প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে অন্তর্হিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রকৃত মনের ভাব জানিবার কোন উপায় নাই। তবে তাঁহার অমর কাব্য মধ্যে কিছু আভ্যন্তরীণ প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে এবং তাহা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে প্রকৃত অবস্থা অনুমিত হইতে পারে।

কালিদাসের মহারত্ন কাব্যগুলি বিশেষ অনুধাবন করিয়া পড়িলে এবং তৎসঙ্গে কবিগুরু বাল্মীকির অমর মহাকাব্য রামায়ণ পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় 'রামায়ণ' কালিদাসের বড় প্রিয় গ্রন্থ ছিল এবং তিনি এই অপূর্ব্ব রাম চরিত তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছিলেন। এমন কি তিনি রামায়ণের অনেক শ্লোকের সুললিত শব্দাবলী নিজের মহীয়সী প্রতিভা বলে কখনো পরিবর্ত্তিত করিয়া কখনো অপরিবর্ত্তিত ভাবে নিজের কাব্যমধ্যে

সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কোন কোন স্থানের সুন্দর ভাব নিচয়ও নূতন ভাষায় নূতন করিয়া স্বকীয় কাব্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার রঘুবংশের অনেক কথা ও জনপদাদির ভৌগলিক বিবরণ অবিকল রামায়ণ হইতে গৃহীত। রঘুর ত্রয়োদশ সর্গে রাম ও সীতার অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তনের বর্ণনা রামায়ণের রামের বনবাস পথের বর্ণনার সহিত অনেক মিল আছে। সীতা-বিরহিত রামচন্দ্রের বিরহ যক্ষের বিরহের সহিত তুলিত হইতে পারে। ইহা খুব সম্ভবপর যে যক্ষের বিরহ কথা রামবিরহ উপাখ্যান হইতে গৃহীত হইয়াছে। মল্লিনাথও টীকায় লিখিয়াছেন 'সীতাং প্রতি হনুমৎ সন্দেশং মনসি নিধায় মেঘসন্দেশং কবিঃ কৃতবান্‌ইত্যাহুঃ'। এ বিষয়ে এই কাব্যের মধ্যেই উৎকৃষ্ট আভ্যন্তরীণ প্রমাণ আছে। উত্তর মেঘের একটি শ্লোক এইরূপ :—

"ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা
ত্বামুৎকণ্ঠোচ্ছ্বসিতহৃদয়া বীক্ষ্য সম্ভাব্যচৈবং।
শ্রোষ্যত্যস্মাৎ পরমবহিতা সৌম্য সীমন্তিনীনাং
কান্তোদন্তঃ সুহৃদুপনতঃ সঙ্গমাৎ কিঞ্চিদূনঃ॥"

এই শ্লোক পড়িলে মেঘদূতের গল্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ থাকে না। আর এই রামায়ণেরই আর একস্থানে কুবেরের অভিশাপগ্রস্ত এক যক্ষের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। এই জন্য নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে রামায়ণই যক্ষোপাখ্যানের উৎপত্তি স্থল। রামবিরহ এবং রামায়ণ বর্ণিত একটি ক্ষুদ্র যক্ষোপাখ্যান মহাকবির মনে এক সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিল। তাই 'মেঘদূতে' কুবেরাভিশপ্ত যক্ষের উপাখ্যান।

কালিদাস যখন রামায়ণ বিশেষ ভাবে পাঠ করিয়া রামায়ণ হইতেই উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন, তখন রামায়ণেই দেখিতে হইবে রামায়ণ অনুসারে কোন্ পর্ব্বত 'রামগিরি'। সমগ্র রামায়ণের মধ্যে 'রামগিরি' ঠিক এই নামে অভিহিত কোন পর্ব্বত নাই। অতএব রামায়ণ ভাল করিয়া পড়িয়া বুঝিতে হইবে কোন পর্ব্বত 'রামগিরি' হইতে পারে। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস কালে নানা পর্ব্বত, নদ, নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং নানাস্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়া-



ছিলেন। এই সকল পর্ব্বতের যে কোন পর্ব্বতকে রামগিরি বলা যাইতে পারে। কিন্তু একটু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে কোন অপ্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র পর্ব্বত রামগিরি হইতে পারে না। রামনাম যুক্ত হইয়া 'রামগিরি' নামের যোগ্য হইতে হইলে, পর্ব্বতের বিশেষ প্রসিদ্ধির কারণ থাকা আবশ্যক। 'মেঘদূতের' বর্ণনা অনুসারে রামগিরি বিন্ধ্যাচলের অতি সন্নিহিত। অতএব নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে বিন্ধ্যগিরির সন্নিহিত রাম-জানকীর আবাসভূত কোন প্রসিদ্ধ পর্ব্বতই রামগিরি। আমরা পরে দেখাইব চিত্রকূটই এই বর্ণনানুরূপ প্রসিদ্ধ গিরি বলিয়া প্রকৃত রামগিরি।

এক্ষণে দেখা যাক 'রামটেক্' বা অন্য কোন পর্ব্বতের 'রামগিরি' হইবার কোন দাবী আছে কি না। 'রামটেক' বিন্ধ্যগিরির বহু দক্ষিণে এবং নাগপুরের কিঞ্চিৎ উত্তরে। ইহা বর্ত্তমান কালে ভগবান রামচন্দ্রের নামে পূত হইলেও প্রাচীন ইতিহাসে ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। মহাকবি কালিদাসের সময়ও ইহার এমন কোন প্রসিদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায় না, যাহা হইতে বোঝা যাইতে পারে যে কালিদাস প্রসিদ্ধ রামতীর্থ বলিয়া ইহার অস্তিত্বের বিষয় জানিতেন। ইহা সম্ভবপর নয় যে মহাকবি একটি সাধারণের অজ্ঞাত স্থানকে, তাহার প্রকৃত নাম না দিয়া 'রামগিরি' নামে অভিহিত করিবেন। বহুদূরবর্ত্তী 'রামটেক' অমরাকণ্টকের নিকট-বর্ত্তী 'রামগিরি' হইবার দাবী আদৌ করিতে পারে না। আরো একটি ক্ষুদ্র অপ্রসিদ্ধ পর্ব্বতকে পণ্ডিতবর Griffiths সাহেব 'রামগিরি' বলিয়া মনে করেন। শ্রীরামচন্দ্র যখন মহামুনি সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে যাইতেছেন তখন পথিমধ্যে এক বিশাল পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন।

স গত্বা দূরমধ্বানং নদীস্তীর্ত্বা বহূদকাঃ
দদর্শ বিমলং শৈলং মহামেরুমিবোন্নতম্॥

আরণ্যকাণ্ড ৭ম সর্গ ২য় শ্লোক।

এই পর্ব্বতের কোন নাম নাই। ইহার কোন বিশেষ উল্লেখ নাই এবং এই পর্ব্বত রামচন্দ্র মাত্র দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। এখানে তিনি আদৌ বাস করেন নাই। কাজে কাজেই এই বিমলশৈলের 'রাম-গিরি' হইবার দাবি দাওয়া কিছুই নাই। এ কেবল অন্ধকারে একটা ঢিল

ফেলা মাত্র। 'যেহেতু চিত্রকূট 'রামগিরি' নয় অতএব যে কোন পর্ব্বত রামগিরি হইতে পারে' এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিলে, অবশ্য এই সুমেরু সদৃশ মহাপর্ব্বত 'রামগিরি' হইতে পারে।

চিত্রকূটই যে রামগিরি এ বিষয়ে বিশিষ্ট প্রমাণ পরে প্রদর্শিত হইবে। এক্ষণে একটি শ্রেষ্ঠ আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিব, কোন্ পর্ব্বতকে মনে করিয়া মহাকবি রামগিরির উল্লেখ করিয়াছেন।

এই কাব্যের প্রথম বর্ণনাতেই মহাকবি বলিতেছেন, প্রিয়াবিরহিত যক্ষ আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে পর্ব্বত গাত্র সংলগ্ন বপ্রক্রীড়ারত গজের ন্যায় এক খণ্ড কৃষ্ণমেঘ দেখিতে পাইলেন। ইহা একটি অত্যুজ্জ্বল ছবি। বিরহি যক্ষের মনে এই ছবি অত্যন্ত বিরহভাব জাগরিত করিয়াছিল; এবং এই জন্যই তিনি এই মেঘকে দূত কল্পনা করিয়া প্রিয়া সমীপে পাঠাইবার ইচ্ছা করিলেন। বপ্রক্রীড়াপরিণত গজের সহিত সানুদেশলগ্ন মেঘের তুলনা বড়ই সুন্দর এবং মেঘদরশনে বিরহির আকুলভাব কবিত্বময় চিরপ্রচলিত সত্য। এই সুন্দর উপমা মহাকবি অন্য এক মহাকাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে এই বর্ণনা আছে। বনবাস কালে রামচন্দ্র ও সীতাদেবী যেখানে যেখানে বাস করিয়াছিলেন এবং সীতাবিরহিত হইয়া যেখানে যেখানে সীতার অন্বেষণ করিয়া বিলাপ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, লঙ্কাবিজয়ের পর অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তন কালে সীতার সহিত পুষ্পক বিমানে চড়িয়া সীতাকে সেই সকল স্থান দেখাইতেছেন। বড় মধুর স্মৃতি। যেখানে বহুকষ্টভোগ হইয়াছে সুখের সময় সেই স্থানের দর্শন বড় মধুর ভাব জড়িত। তাই রামচন্দ্র একটি একটি করিয়া সীতাদেবীকে দেখাইতেছেন। কোথাও অত্রিমুনির আশ্রম, কোথাও সুতীক্ষ্ণের তপোবন, কোথাও জনস্থানে মুনিদিগের নবনির্ম্মিত পর্ণশালা, কোথাও মাল্যবান পর্ব্বতের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ, কোথাও বেতস বনপরিবৃত সারস সঙ্কুল পম্পাসরোবর এবং কোথাও মহর্ষি শাতকর্ণির পঞ্চাপ্সর নামক বিহার সরোবর। অতি মধুর বর্ণনা। কাব্যাংশে এ বর্ণনা অতুলনীয়। সমস্ত স্থানগুলিই রামায়ণ হইতে গৃহীত। এমন কি শ্যাম নামক বটের বর্ণনাও রামায়ণে শ্যাম বটের উল্লেখ হইতে গৃহীত। এই বর্ণনার মধ্যে চিত্রকূট পর্ব্বতের বর্ণনা এইরূপ।



"ধারাস্বনোদ্গারিদরীমুখোঽসৌ
শৃঙ্গাগ্রলগ্নাম্বুদ বপ্রপঙ্কঃ।
বধ্নাতি মে বন্ধুরগাত্রি চক্ষু-
র্দৃপ্তঃ ককুদ্মানিব চিত্রকূটঃ॥"

এখানেও সেই মেঘদূতের সুন্দর উপমা বর্ত্তমান। সেই পর্ব্বতগাত্র সংলগ্ন মেঘ এবং সেই বপ্রক্রীড়ারত পঙ্কলিপ্ত কুঞ্জর মহাকবি সেই একই উপমাকে পুনরুক্ত করিয়াছেন। প্রতিভাশালী মহাকবিদের এইরূপ সুন্দর ভাবের বা সুন্দর দৃশ্যের পুনরুক্তি সুপ্রসিদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, স্বয়ং কালিদাস তাঁহার শকুন্তলা ও তাঁহার সখীদের বৃক্ষে জল সেচন রঘুবংশ ও অন্যত্রও পুনরুক্ত করিয়াছেন। "সেকান্তেও মুনিকন্যাভিস্তৎক্ষণোজ্ঝিত-বৃক্ষকম্"। ঠিক যেন শকুন্তলা ও অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদার কথা। এইরূপ পুনরুক্তির কারণ অত্যন্ত সুন্দর ভাব বা দৃশ্য কবিদের মনে অত্যন্ত দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়। এখানে এই চিত্রকূট সংলগ্ন মেঘের সহিত বপ্রক্রীড়ানিরত-গজের উপমা দেখিয়া বোধ হয় মহাকবিস্বয়ং যেন চিত্রকূটে এই দৃশ্য দেখিয়াছিলেন এবং সেই জন্য তাঁহার মনে অত্যন্ত deep impression হইয়াছিল। এই সাদৃশ্য দেখিয়া পাঠকের মনেও একটা দৃঢ়বিশ্বাস হয় যে মেঘদূতের উপমা কালিদাসের স্বয়ং চিত্রকূট দর্শনের ফল এবং সেই একই দৃশ্য স্থানে স্থানে পুনরুক্ত হইয়াছে। রঘুবংশে চিত্রকূটের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। মেঘদূতে তাহা মহাকবির মনে মনে ছিল। মহাকবি যেন রঘুবংশে স্বয়ং ইঙ্গিত করিয়া বুঝাইয়া দিলেন তাঁহার রামগিরি চিত্রকূট ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ শুধু Strange conicidence নহে, ইহা মহাকবির এক মহাসঙ্কেত। এই আভ্যন্তরীন প্রমাণ অত্যন্ত বলবৎ। টীকাকার মল্লিনাথ এইরূপেই মহাকবির মনের ভাব জানিয়া "রামগিরি"র চিত্রকূট ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এক্ষণে ভূগোলের হিসাবে রামগিরি চিত্রকূট হইতে পারে কিনা দেখা যাউক। প্রকৃত প্রমাণ রামায়ণ হইতেই পাওয়া যাইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে রামায়ণের মতে প্রয়াগতীর্থ সন্নিহিত ভরদ্বাজাশ্রম হইতে চিত্রকূট দশক্রোশ দূরে স্থিত। বর্ত্তমান কালে প্রয়াগতীর্থের দশ ক্রোশ দক্ষিণে এরূপ কোন পর্ব্বত নাই যাহাকে চিত্রকূট বলা যাইতে পারে।

কোন একখানি আধুনিক মানচিত্র দেখিলেও ইহা বেশ বুঝা যাইবে। এই জন্য কেহ কেহ বলেন রামায়ণ কথিত ক্রোশ বর্ত্তমানকালের এক ক্রোশের অনেক বেশী। Griffiths সাহেব "ক্রোশে"র অনুবাদে League লিখিয়াছেন। স্বর্গীয় এ, বড়ুয়া মহাশয় বলেন :—

The hill *Chitrakuta* is by the river *Mandakini* or Melini at a distance of 24 miles from the confluence of the rivers Jamuna and Ganges. The distance ( mentioned in the Ramayana ) is too short, as it is 50 miles South-east of Banda which is 95 miles South-west of Allahabad. It is situated on the chor river *Paisuni* which is therefore the *Mandakini* or Melini of old days.

ইহা বর্ত্তমানের চিত্রকূট। যাঁহারা স্বচক্ষে চিত্রকূট দেখিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের বর্ণনায় পাওয়া যায় বর্ত্তমান চিত্রকূট জবলপুর রেলওয়েতে মার্কণ্ড নামক রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে ১২ মাইল। ইহারই একদিকে মন্দাকিনী-নাম্নী একটি নদী প্রবাহিতা। উপরে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর নাম পয়োষ্ণী বা পিণ্ডনী। তীর্থযাত্রীর নিকট ইহা অতি পবিত্র স্থান। ইহার চারিদিকে সমস্ত ভূভাগই রামনামপূত। বনবাসী রামচন্দ্রের ইহাই রাজ্য ছিল। সন্নিহিত প্রত্যেক নদ নদী পর্ব্বত এমন কি বৃক্ষাদি পর্য্যন্তও সীতা ও রামের বনবাস কাহিনীর সহিত বিজড়িত। বৃক্ষের ফলের নামও সীতাফল। কিন্তু এই চিত্রকূট বিন্ধ্যগিরির অতি সন্নিহিত উত্তরে অথবা বিন্ধ্যগিরি সংলগ্ন। কালিদাস যদি এই পর্ব্বতকেও রামগিরি বলিয়া থাকেন তাহা হইলেও কোন ভুল হয় নাই। মেঘদূতের বর্ণনার সহিত মিলাইলে এই স্থান হইতে মেঘ প্রয়াণ আরম্ভ করনা করিলে দোষ হয় না। মেঘ একেবারে সোজা উত্তরে চলে নাই। প্রথমে মেঘের গতি পশ্চিম বাহিনী ছিল এবং একবার বক্রপথগামিনীও ছিল। বর্ত্তমান চিত্রকূট সম্বন্ধে আরো বক্তব্য এই যে ইহার দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া আরো পর্ব্বত শ্রেণী আছে এবং পর্ব্বতের নাম অতি সহজেই লোকে পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে এবং নিকটস্থ পর্ব্বতকে অনেকেই এক নামে অভিহিত করিয়া থাকে। আর বিন্ধ্যগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগই রাম জানকী কীর্ত্তিপূত মহাতীর্থ-ভূমি।



বহুপূর্ব্ব অতীতে এবং বর্ত্তমানে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কেবল নামে সাদৃশ্য দেখিয়া অতীতের কোন প্রসিদ্ধ স্থানের ভৌগলিক অবস্থিতি নির্ণয় করিলে মহাভ্রমে পতিত হইতে হয়। অনেক সময়ে এক নামের দুই বা ততোধিক প্রসিদ্ধ স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। গিরিব্রজ, মৎস্য দেশ প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। এইজন্য বর্ত্তমান চিত্রকূটের অবস্থিতির বিষয় উল্লেখ না করিলেই হইত। তবে ইহাতেও বিশেষ ভুল হয় না এইজন্য ইহার উল্লেখ করিলাম।

এক্ষণে ইহাই বিশেষরূপে অনুধাবনীয়, রামায়ণের মতে চিত্রকূট বিন্ধ্যপর্ব্বতের ঠিক উত্তরে না অন্যত্র ইহার অবস্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই বিষয়ের যথার্থ অবধারণ করিতে হইলে রামায়ণের সমগ্র অযোধ্যাকাণ্ড ও সমগ্র অরণ্যকাণ্ড বিশেষ করিয়া আলোচনা করিতে হইবে।

রামায়ণের মতে চিত্রকূট একটি অতি বিস্তৃত মহাপর্ব্বত। পর্ব্বত মাত্রেই বিস্তৃত। পর্ব্বত একটি ক্ষুদ্র বিন্দু নহে। আর এই চিত্রকূট বহুদূর বিস্তৃত। অনেকগুলি নদী ইহার উপকণ্ঠে প্রবাহিত। মন্দাকিনীর কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রামচন্দ্র চিত্রকূট আশ্রমবাসকালে সীতা দেবীকে মন্দাকিনী নদী দেখাইতেছেন।

"বিচিত্র পুলিনাং রম্যাং হংস সারস সেবিতাম্।
কুসুমৈরুপসম্পন্নাংপশ্য মন্দাকিনীং নদীম"॥

অযোধ্যাকাণ্ড ৯৫ সর্গ ৩য় শ্লোক।

কলিদাসও এই দৃশ্য অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তনকালে সীতাদেবীকে দেখাইতেছেন—

"এষাপ্রসন্নস্তমিতপ্রবাহা
সরিদ্ বিদূরান্তর ভারতন্বী।
মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে
মুক্তাবলী কণ্ঠগতেব ভূমেঃ॥"

এই চিত্রকূটে আরো একটি নদী আছে; তাহার নাম মাল্যবতী। রামায়ণে আছে :—

সুরম্যমাসাদ্য তু চিত্রকূটং
নদীং চতাং মাল্যবতীং সুতীর্থাং।

ননন্দ হৃষ্টো মূলপক্ষিজুষ্টাং
জহৌ চ দুঃখং পুর বিপ্রবাসাৎ॥ ”

অযোধ্যাকাণ্ড ৫৬ সর্গ।

ইহা ছাড়া পয়োষ্ণী বলিয়া আরো একটি নদী এখানে প্রবাহিত। এই সমস্ত বর্ণনা পাঠ করিয়া বেশ বুঝা যায় চিত্রকূট অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। রামায়ণের বর্ণনানুসারেই চিত্রকূট অতি বিস্তৃত। এ কথা পরে আরো প্রস্ফুট হইবে। এক্ষণে রামায়ণের মতে চিত্রকূটের স্থান নির্দ্দেশ করা যাউক।

রামায়ণে জনস্থান এক অতি বিখ্যাত ভূ ভাগ। অরণ্যকাণ্ডের ষষ্ঠ সর্গে এই জনস্থানের উল্লেখ আছে। অযোধ্যাকাণ্ডের ১১৬ অধ্যায়েও জনস্থানের সামান্য উল্লেখ আছে। এই অধ্যায়ের প্রথমেই আছে রামচন্দ্র চিত্রকূট বাসকালে এক সময়ে তত্রত্য তপস্বিগণের মন ভয় ও উদ্বেগপূর্ণ দেখিলেন। তাঁহাদের কুলপতি রামকে বলিলেন ঃ—

“ রাবণাবরজঃ কশ্চিৎ খরো নামেহ রাক্ষসঃ।
উৎপাট্য তাপসান্ সর্ব্বান্ জনস্থান নিবাসিনঃ॥ ”

এখানে ইহ এই কথাটি বিশেষরূপে অনুধাবনীয়। এই কথায় বুঝা যায় জনস্থান এবং চিত্রকূট অতি সন্নিহিত অথবা চিত্রকূটের নিম্নদেশেই জনস্থান। ইহার পর রামচন্দ্র অত্রিমুনির আশ্রমে গমন করেন এবং তথায় সীতা ও ব্রহ্মবাদিনী অনসূয়া অনেক অপূর্ব্ব ধর্ম্মময় কথোপকথন করেন। তাহার পরই অরণ্যকাণ্ডের প্রথম স্বর্গে আমরা দেখিতে পাই রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রথম শ্লোকেই আছে —

প্রবিশ্য তু মহারণ্যং দণ্ডকারণ্যমাত্মবান্।
রামো দদর্শ দুর্দ্ধর্ষস্তাপসাশ্রম মণ্ডলম্॥

এই দণ্ডকারণ্যেই বিরাধ নামক রাক্ষসের সহিত রাম-লক্ষ্মণাদির সংঘর্ষ হয় এবং বিরাধ নিধন সংসাধন এবং তাহার শাপ বিমোচন হয়। এই স্থানের অর্দ্ধযোজন দূরে শরভঙ্গ নামক ঋষির আশ্রম। বিরাধ তাঁহাদিগকে তথায় যাইতে উপদেশ দিতেছেন।

ইতো বসতি ধর্ম্মাত্মা শরভঙ্গঃ প্রতাপবান্।
অধ্যর্দ্ধযোজনে তাত মহর্ষি সূর্য্যসন্নিভঃ॥ অরণ্য, চতুর্থ সর্গ ২০৭ শ্লোক।



রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গেও আছে ঃ—

“ অদঃ শরণ্যং শরভঙ্গ নাম্ন
স্তপোবনং পাবনমাহিতাগ্নেঃ।
চিরায় সন্তর্প্য সমিদ্ভিরগ্নিং
যো মন্ত্রপূতাং তনুমপ্যহৌষীৎ॥ ”

কালিদাসও রামায়ণের অনুসরণ করিয়া চিত্রকূটের পরেই শরভঙ্গের আশ্রম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পর অরণ্যকাণ্ডের পঞ্চম সর্গে, চিত্রকূটের অবস্থান সম্বন্ধে অত্যুৎকৃষ্ট প্রমাণ আছে। শরভঙ্গ ঋষি রামচন্দ্রকে সুতীক্ষ্ণ নামক ঋষির নিকট যাইতে বলিতেছেন। তিনি বলিলেন, “ রাম তুমি বিবিধ-কুসুমবাহিনী এই মন্দাকিনী নাম্নী নদীর স্রোতের বিপরীত দিক্ দিয়া গমন কর তাহা হইলেই সেখানে যাইতে পারিবে ”।

ইমাং মন্দাকিনীং রাম প্রতিস্রোতামনুব্রজ।
নদীং পুষ্পোড়ুপবহাং তত স্তত্র গমিষ্যসি॥ ”

আরণ্য, ৫ম সর্গ, ৩৬ শ্লোক।

এখানে ‘ প্রতিস্রোতাং ’ শব্দটি বিশেষ অনুধাবনীয়।

রঘুবংশের বর্ণনাও এতদনুরূপ।

হবির্ভুজামেধবতাং চতুর্ণাং
মধ্যে ললাটন্তপসপ্তসপ্তিঃ।
অসৌ তপস্যত্যপরস্তপস্বী।
নাম্নাসুতীক্ষ্ণশ্চরিতেন দান্তঃ॥

ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে মন্দাকিনী নদী এখনো ফুরায় নাই এবং চিত্রকূটোপকণ্ঠশোভিতা মন্দাকিনী জনস্থান ও দণ্ডক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। চিত্রকূটও মন্দাকিনীর সহিত বিস্তৃত। বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণ দিক্ পর্য্যন্ত যে চিত্রকূট বিস্তৃত ছিল তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহা হইলেই চিত্রকূটকেই ‘ রামগিরি ’ বলিয়া অনায়াসে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

অরণ্যকাণ্ডের ষষ্ঠ সর্গেও ইহার প্রতিপোষক অনুরূপ কথা আছে। শরভঙ্গ মুনি স্বর্গগত হইলে অন্যান্য মুনিগণ রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাক্ষসগণের অত্যাচার কাহিনী বলিতে লাগিলেন।

তাঁহারা বলিলেন, "পম্পা ও মন্দাকিনী তীরবাসী ও চিত্রকূটবাসী মুনিগণ রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইতেছেন" :—

'পম্পা নদীনিবাসিনামনুমন্দাকিনীমপি।
চিত্রকূটালয়ানাঞ্চ ক্রিয়তে কদনং মহৎ॥'

আরণ্য ৬ সর্গ ১৭ শ্লোক।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, পম্পা মন্দাকিনী চিত্রকূট পর্ব্বত প্রভৃতি পরস্পর সংলগ্নস্থান এবং নিকটবর্ত্তী। পম্পা কিছু দক্ষিণে। যেখানে চিত্রকূট শেষ হইয়াছে সেখান হইতে পম্পা আরম্ভ এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

অরণ্যকাণ্ডের ৭ম সর্গেও এইরূপ কথা আছে। সুতীক্ষ্ণ মুনি তাঁহার আশ্রমাগত রামচন্দ্রকে বলিতেছেন, "তুমি স্বরাজ্য ছাড়িয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতেছ ইহা আমি শুনিয়াছি"।

"চিত্রকূটমুপাদায় রাজ্যভ্রষ্টোঽসি মে শ্রুতঃ"।

আরণ্য ৭ম ৬০ শ্লোক।

রামচন্দ্র সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে চিত্রকূটে বাস করিতেছিলেন। যেখানে যেখানে তিনি ছিলেন তৎ সমস্তস্থানই চিত্রকূটের অংশ বিশেষ। এই সকল বর্ণনা হইতে বেশ বুঝা যায় চিত্রকূট অতি বিস্তৃত। চিত্রকূটের পরেই দণ্ডকারণ্য। ৮ম সর্গে রামচন্দ্র সুতীক্ষ্ণ মুনিকে বলিতেছেন "আমরা দণ্ডকারণ্যে যাইব, তজ্জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি"।

"ত্বরামহে বয়ং দ্রষ্টুংকৃৎস্নমাশ্রম মণ্ডলম্।
ঋষীণাং পুণ্যশীলানাং দণ্ডকারণ্য বাসিনাম্॥" ৬ষ্ঠ শ্লোক।

সুতীক্ষ্ণ তাঁহাকে বিদায় দিবার সময় পুনরায় তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে আসিবার জন্য আমন্ত্রিত করিলেন। রামচন্দ্র ক্রমে নানা মুনির নানা আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কোথায় দশমাস, কোথায় এক বৎসর, কোথায় চারি মাস, কোথায় পাঁচ মাস এবং কোন কোন স্থানে সংবৎসরেরও অধিক পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। বনবাসের দশ বৎসরের পর রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পুনরায় সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। সেখানে কিছুকাল বাস করিয়া রামচন্দ্র ভগবান



অগস্ত্য মুনির আশ্রমে যাইতে অভিলাষী হইলেন এবং সুতীক্ষ্ণের নিকট অগস্ত্যাশ্রমের পথ জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"অস্মিন্নরণ্যে ভগবন্নগস্ত্যো মুনি সত্তমঃ।
বসতীতি ময়া নিত্যং কথাঃ কথয়তাং শ্রুতম্॥
ন তু জানামি তং দেশং বনস্যাস্যমহত্তয়া।
কুত্রাশ্রমপদং রম্যং মহর্ষেস্তস্য ধীমতঃ॥
প্রসাদার্থং ভগবতঃ সানুজঃ সহ সীতয়া।
অগস্ত্যমধিগচ্ছেয়ম্ অভিবাদয়িতুং মুনিম্॥
মনোরথো মহানেষঃ হৃদিসম্পরিবর্ত্ততে।
যদহং তং মুনিশ্রেষ্ঠং শুশ্রূষেয়মপি স্বয়ম্॥

আরণ্য ১১শ সর্গ।

এই শ্লোকগুলি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে একই বিস্তৃত অরণ্যে সুতীক্ষ্ণ মুনি ও অগস্ত্যের বাস। সুতীক্ষ্ণ মুনি রামচন্দ্রকে পথের সন্ধান বলিয়া দিলেন এবং দূরত্বেরও নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমের চারি যোজন দক্ষিণে অগস্ত্য মুনির ভ্রাতার আশ্রম।

"যোজনান্ত্যশ্রমাত্তাত যাহি চত্বারি বৈততঃ।
দক্ষিণেন মহান্ শ্রীমান্ অগস্ত্যভ্রাতুরাশ্রমঃ॥"

১১ সর্গ ৩৭ শ্লোকঃ।

সুতীক্ষ্ণ মুনি বলিয়া দিলেন এই আশ্রমের এক যোজনের পর স্বয়ং অগস্ত্য মুনির আশ্রম।

"তত্রাগস্ত্যাশ্রমপদং গত্বা যোজনমন্তরম্।
রমণীয় বনোদ্দেশে বহুপাদপশোভিতে॥"

ইহারই পর সুবিখ্যাত 'পঞ্চবটী' ভূ ভাগ। রামচন্দ্র যথাক্রমে অগস্ত্যভ্রাতা ও স্বয়ং অগস্ত্য মুনির আশ্রমে কিছু দিন বাস করিলেন। তাহার পর অগস্ত্যের নিকট রামচন্দ্র অনায়াসলভ্য সলিল পরিপূর্ণ বহুকাননযুক্ত বাসোপযুক্ত প্রদেশের সন্ধান চাহিলেন। অগস্ত্য মুনি পঞ্চবটীর কথা বলিয়া দিলেন। পঞ্চবটীর দূরত্বের কথাও বলিয়া দিলেন। পঞ্চবটী অগস্ত্যাশ্রম হইতে দুই যোজন দূরে।

'ইতো দ্বিযোজনে তাত বহুমূলফলোদকঃ।
দেশো বহুমৃগঃ শ্রীমান্ পঞ্চবট্যাভিবিশ্রুতঃ'॥

আরণ্য ১৩ সর্গ।

এই 'পঞ্চবটী'কে কেহ কেহ বর্ত্তমান 'নাসিক' বলিয়া মনে করেন। সম্ভবতঃ 'পঞ্চবটী' বর্ত্তমান নাসিক প্রদেশ। "পঞ্চবটী" বর্ত্তমান নাসিক হউক আর না হউক ইহার স্থান নির্দ্দেশের অন্য উপায় আছে। এই 'পঞ্চবটী' গোদাবরীর তীরে।

'অতশ্চত্বামহং ব্রূমি গচ্ছ পঞ্চবটীমিতি।
স হি রম্যো বনোদ্দেশো মৈথিলি তত্র রংস্যতে॥
স দেশঃ শ্লাঘনীয়শ্চ নাতি দূরেচ রাঘব।
গোদাবর্য্যাঃ সমীপে চ মৈথিলী তত্র রংস্যতে॥'

আরণ্য ত্রয়োদশ সর্গ।

গোদাবরীর উৎপত্তি স্থান দক্ষিণ ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্ত। এই উৎপত্তি স্থানের কিয়ৎ দক্ষিণেই পঞ্চবটি। এ বিষয়ে কোন গোলমাল নাই। গোদাবরী দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাহিনী হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। পঞ্চবটী যদি গোদাবরীর উৎপত্তি স্থান হইতে আরো দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই। তাহা হইলে সুতীক্ষ্ণের আশ্রম, অগস্ত্য মুনির আশ্রম প্রভৃতি আরো দক্ষিণে পড়িবে। তাহা হইলে চিত্রকূটও আরো দক্ষিণে হইবে। কিন্তু সেরূপ মনে করিবার কোন আবশ্যক নাই। গোদাবরীর উৎপত্তি স্থানের নাতিদূরেই আমরা পঞ্চবটীর অবস্থান ধরিয়া লইলাম। বর্ত্তমান নাসিকও এইরূপ জায়গায় অবস্থিত। এক্ষণে দেখা যাইতেছে সুতীক্ষ্ণের আশ্রম হইতে অগস্ত্য ভ্রাতার আশ্রম ৪ যোজন এবং তথা হইতে অগস্ত্যাশ্রম ১ যোজন। পুনরায় অগস্ত্যাশ্রম হইতে পঞ্চবটী ২ যোজন। তাহা হইলে মোটের উপর সুতীক্ষ্ণের আশ্রম পঞ্চবটী হইতে ৭ যোজন উত্তরে। এই উত্তর ঠিক সোজা উত্তর না হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে উত্তর পশ্চিম বা উত্তর পূর্ব্বও হইতে পারে। উত্তরপূর্ব্বেই বেশী সম্ভব কারণ রামচন্দ্র প্রয়াগের দিক হইতে আসিতেছেন। যোজন চারি ক্রোশ বা আট মাইল। তাহা হইলে সুতীক্ষ্ণের আশ্রম পঞ্চবটী হইতে ৫৬ মাইল



উত্তরে বা উত্তর পূর্ব্বে। বর্ত্তমান কালের যে কোন মানচিত্র দেখিলে বুঝা যাইবে গোদাবরীর উৎপত্তি স্থানের নিকটবর্ত্তী পঞ্চবটী হইতে ৫৬ মাইল উত্তর বা উত্তরপূর্ব্ব হইলে সে স্থান নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণেই হয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রম মন্দাকিনী নদীর নিকটবর্ত্তী এবং চিত্রকূটেরও সান্নিধ্যে। তাহা হইলেই পঞ্চবটীর দূরত্বের সঙ্গে মিলাইলে চিত্রকূট ও নর্ম্মদার দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। দণ্ডকারণ্যের বিবরণের সঙ্গে মিলাইলে চিত্রকূটের বিস্তৃতি নর্ম্মদার দক্ষিণ ভাগ পর্য্যন্ত বলিয়া বোধ হয়। গোদাবরী ও নর্ম্মদার অন্তরালবর্ত্তী প্রদেশই রামায়ণের বর্ণনা অনুসারে দণ্ডকারণ্য। চিত্রকূট যেখানে শেষ সেখানেই দণ্ডকারণ্য। কাজেই চিত্রকূট যে নর্ম্মদার উৎপত্তি স্থানের দিকে নর্ম্মদার দক্ষিণ ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। নর্ম্মদা ও তাপ্তী নদীর মধ্যভাগে সাতপুরা পর্ব্বত। সাতপুরার পূর্ব্বভাগ ও চিত্রকূটের দক্ষিণ ভাগ খুব সম্ভব সংলগ্ন ছিল এবং বর্ত্তমান কালেও নর্ম্মদার উৎপত্তি স্থানের দক্ষিণ ভাগে বিশাল পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান কালের ভারতবর্ষের মানচিত্রেও ইহা লক্ষিত হইবে। এই পর্ব্বতমালার কিয়দংশ রামায়ণের সময়ে চিত্রকূটের অংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত। রামায়ণের বর্ণনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়। পঞ্চবটীর স্থান নির্দ্দেশ হইতে নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে চিত্রকূট বিন্ধ্যপর্ব্বতও নর্ম্মদার দক্ষিণ ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাহা হইলেই চিত্রকূটই যে রামগিরি সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় থাকে না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে রামায়ণে যে সকল নদ নদী পর্ব্বত ও জনপদ প্রভৃতির উল্লেখ আছে তাহাদের ভৌগলিক স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে অনেক ভুল আছে। কাজে কাজেই রামায়ণের বর্ণনা হইতে কোন ভৌগলিক সত্য বাহির করা অতি সুকঠিন। এ কথা সত্য হইতে পারে। কিন্তু প্রসিদ্ধ স্থান সকল সম্বন্ধে কোন প্রকার ভ্রম নাই। এলাহাবাদ বা প্রয়াগ, বিন্ধ্যপর্ব্বত নর্ম্মদা গোদাবরী প্রভৃতি রামায়ণের মতে এবং বর্ত্তমান কালেও ঠিক একই জায়গায় আছে। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের বিশেষ কোন স্থান পরিবর্ত্তন হয় নাই। রামায়ণে আছে প্রয়াগের অতি নিকটে ভরদ্বাজ মুনির

আশ্রম ছিল। এখন যদি নিকটে কোন স্থানকে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম বলিয়া কেহ নির্দ্দেশ করেন তাঁহার কোন ভ্রম হইল না। রামচন্দ্র বনবাস কালে যে সকল আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন তাহাদের বর্ণনা এবং দূরত্বের নির্দ্দেশ প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ হইতে দেওয়া আছে। সুতরাং তাহাদের অবস্থান এবং দূরত্ব বর্ত্তমান কালেও ঠিক নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দেখা যাইতেছে চিত্রকূট পর্ব্বত কোন্ কোন্ আশ্রমের সান্নিধ্যে এবং কতদূর বিস্তৃত। রামায়ণ অনুসারে চিত্রকূট প্রয়াগ হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত বিন্দুমাত্র নহে। ইহা অতি বিস্তৃত মহাপর্ব্বত বা পর্ব্বতমালা। এবং বিন্ধ্যের পূর্ব্বভাগের দক্ষিণ পর্য্যন্ত এই পর্ব্বতমালা চলিয়াছে। এই চিত্রকূটই কালিদাসের মতে ও মল্লিনাথের মতে রামগিরি। তাঁহাদের কোনরূপ ভ্রম হয় নাই। "রামগিরি" খুঁজিবার জন্য "রামটেক" বা "রামটিঙ্কি" কল্পনা করিবার কোন আবশ্যক নাই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন।

---

# ভূ-প্রদক্ষিণ।

## তৃতীয় অধ্যায়।

### [ নেপ্‌লস্ ]

নেপলস্ ( Naples ) পৌঁছিয়া আমরা প্রথম ইউরোপীয় সহরের আভাস পাইলাম। বৃন্দিসি একটী সামান্য স্থান মাত্র কিন্তু নেপলস্ একটী প্রকাণ্ড সহর। রাস্তাগুলি অতি প্রশস্ত। দুইধারে সৌধমালা বিরাজিত এবং রাস্তার মোড়ে মোড়ে বা চৌমাথার উপর ইটালিয়ান রাজাদিগের বা বীরগণের প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ষ্টেশন হইতে আমাদের হোটেলে যাইতে প্রাচীন রাজবাটী দেখিতে পাইলাম। এখানে বোর্ব্বোঁ রাজাগণ বাস করিতেন; তাহার পর ইটালিয়ান রাজত্ব স্থাপিত হইলে সমগ্র ইটালির রাজা কখন কখন আসিয়া এইখানেই থাকেন। গারিবল্‌ডি ম্যাটসিনি ও রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। সমস্ত সহরটী রাত্রে বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত করা হয় এবং ট্রাম গাড়ীগুলিও বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে। বাড়ীগুলি সমস্ত পাথরের এবং দেখিতেও বড় সুন্দর। চারিতলের কম কোন বাড়ী নাই বলিলেও চলে। 'তুফা' নামক এক প্রকার পাথরের প্রস্তুত; দেখিতে কতকটা চুনারের প্রস্তরের মত। নেপলস্ সহরের সম্মুখে Bay of Naples এবং পশ্চাতে ছোট ছোট পাহাড়, অদূরে ভিসুভিয়স পর্ব্বত। আমরা হোটেলে আসিয়াই কিছুকাল বিশ্রাম করিলাম। তাহার পর আহারাদি করিয়া এখানকার প্রসিদ্ধ 'তারান্তেলা' নৃত্য ( Tarantella dance ) দেখিলাম। এ নৃত্য বড় চমৎকার। ৩।৪ জন স্ত্রী পুরুষে একত্রে নৃত্য করে, ইহাদের পরিধানে প্রাচীন নিয়পলিটান পোষাক। বেহালা, তম্বুর সিটার ও অপর এক প্রকার তারের যন্ত্র ও ছোট ছোট করতালের সহিত নৃত্য ও গান করে। ইহার নাম কেন তারান্তেলা হইল তাহা উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ইটালীতে তারান্তেলা নামক এক প্রকার মাকড়সা আছে, তাহা কামড়াইলে খুব লাফাইতে হয়, তাহা হইলে বিষ নষ্ট হয়। এই নাচেও ঐ প্রকার লম্ফন আছে—সেই জন্য ইহাকে তারান্তেলা নাচ বলে। দক্ষিণ ইটালীতেই এই

প্রকার নাচ দেখিতে পাওয়া যায়। নাচ দেখিবার পর আমরা শয়ন করিলাম।

প্রাতঃকালে উঠিয়া তাড়াতাড়ি আহারাদি সমাপন করিয়া সহর দেখিতে বাহির হইলাম। প্রথমে আমরা মিউজিয়ম দেখিতে গেলাম। ইহার নাম ( Museo Nazionali ) ন্যাশনাল মিউজিয়ম। এই মিউজিয়মে বহুতর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্র আছে। ইটালী দেশ এই সকল প্রতিমূর্ত্তির ও চিত্রের জন্য বিখ্যাত। এই সকল প্রতিমূর্ত্তির অধিকাংশই প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদিগের কৃত। ইহার মধ্যে অনেক প্রাচীন ভূ-প্রোথিত পম্পেয়ী নগর হইতে আনীত। মূর্ত্তি ব্যতীত প্রাচীন রোমানদিগের কাচের ও পিত্তলের দ্রব্য, অলঙ্কার ও রন্ধনের বাসন প্রভৃতি রহিয়াছে। পম্পেয়ী নগর দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভূ-প্রোথিত হইয়াছে কিন্তু তখনকার তৈল, মদিরা, প্রভৃতি দ্রব্যগুলি এখনও আছে ; আনিয়া সাবধানে মিউজিয়মে রাখা হইয়াছে। দেখিয়া বড়ই বিস্ময়াপন্ন হইলাম। পম্পেয়ী নগরের বিষয় পরে বিস্তারিতরূপে লিখিব। মিউজিয়মে এত রকম রকম সুন্দর প্রস্তর মূর্ত্তি রহিয়াছে যে কোন্‌টী কাহার অপেক্ষা ভাল তাহা বিচারকরা সুকঠিন। ঐ গুলির মধ্যে মিনর্ভা, ভিনাস্, কালিপিগাস্, জুনোফানিস্, আপোলো, ফারনিজষণ্ড এবং হারকুলিজ বিশেষ ভাল বোধ হইল। টসকান ও ইজিপসিয়ান, দ্রব্যাদিও অনেক আছে। মিউজিয়মের বাড়ীটীও বড় সুন্দর। প্রাচীন রাজাদিগের সেনানিবাস ছিল, এখন মিউজিয়মে পরিণত করা হইয়াছে। মিউজিয়মের পর আমরা নেপলসের প্রসিদ্ধ গির্জ্জা (Cathedral ) দেখিতে গেলাম, ইহার নাম Church of St. Jamerius। ইহার ভিতরের গঠন প্রণালী ও দেওয়ালের চিত্রগুলিও সুন্দর। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত কিন্তু এখনও ঠিক নূতন। প্রাচীন রোমান আপোলো মন্দিরের স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং উক্ত মন্দিরের প্রস্তরাদিও ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে। গির্জ্জার ভিতরের চিত্রগুলি প্রসিদ্ধ চিত্রকর ডমেনিচিনো কর্ত্তৃক চিত্রিত। এই গির্জ্জার ভিতর St. Jamerius এর সমাধি আছে। এই গির্জ্জার ভিতর দেওয়ালের গায়ে একটী মূর্ত্তি খোদিত আছে তাহার সম্মুখে একটী প্রজ্বলিত দীপ উঠাইলে ও নামাইলে বোধ হয় যেন প্রতিমূর্ত্তিটীর



চক্ষু একবার খুলিতেছে ও পুনরায় মুদ্রিত হইতেছে। পাদ্রিরা উহাকে যীশু খৃষ্টের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া রোমান কাথলিক ভক্তবৃন্দকে বুঝাইয়া দ্যান এবং কিছু পূজাও সংগৃহীত করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা ( Zous ) গ্রীক দেবতার প্রতিমূর্ত্তি এবং ঐ মূর্ত্তির নিকট জুনোভিনাস্ প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তিও আছে। গির্জ্জা হইতে বাহির হইয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। বৈকালে ভোমিরো হিলস্থিত Museum of San martin দেখিতে গেলাম। নেপলসের এক ধারে ভোমিরো হিল, একটী ছোট পাহাড় অথবা উচ্চস্থান বলিলেও চলে। তাহার উপর উক্ত মিউজিয়ম। দিনটী বড় পরিষ্কার থাকাতে পাহাড়ের উপর হইতে সমস্ত সহর Bay of Naples, এবং ভিসুভিয়াস পর্ব্বত দেখা যাইতে লাগিল। বড় মনোরম দৃশ্য। মিউজিয়মের নিকট একটী সুন্দর গির্জার বহুমূল্যবান চিত্র (oil-painting ) দেখিলাম। ইহার মধ্যে Descent from the Cross by Stanzioni প্রসিদ্ধ।

মিউজিয়মের ভিতরে পুরাতন রোমের রাজাদের অনেক গাড়ী ও নৌকা রহিয়াছে দেখিলাম। রাজাদিগের ব্যবহারের একটী সুবর্ণ খচিত বহুমূল্যবান বজরা Royal barge ও একটী রাজকীয় শকট ( State coach ) রহিয়াছে। গাড়ীগুলির মধ্যে যে গাড়ীতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নেপলস্ সমগ্র ইটালী রাজ্যভুক্ত হইলে পর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল, গারিবল্‌ডি এবং ম্যাটসিনি চড়িয়া জয়োল্লাসে নেপলস্ প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন সেটীও রহিয়াছে দেখিলাম। মিউজিয়মটী বহু পূর্ব্বে একটী মঠ ( Monastery ) ছিল ; রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল্ মিউজিয়মরূপে পরিণত করিয়াছেন। মিউজিয়ম দর্শন করিবার পর আমরা সাধারণ উদ্যান ( Public Park ) দেখিতে গেলাম। এই পার্কের একধারে জলজন্তুদিগের quarium। এখানে যে সকল সামুদ্রিক মৎস্য ও অন্যান্য জন্তুগণকে রাখা হইয়াছে তাহা শুনা যায় জগতে অতুলনীয়। ষ্টারফিস্, অক্‌টোপস্, সী-হর্স অর্থাৎ সামুদ্রিক অশ্ব প্রভৃতি বহুতর সামুদ্রিক জীব রহিয়াছে। এ সমস্তগুলিকে Bay-of Naples হইতে ধরা হইয়াছে। পর দিন আমরা ভিসুভিয়াস্ আগ্নেয় পর্ব্বত দেখিতে গেলাম। নেপলসের পূর্ব্ব ধারে পোরটিসি এবং রেসিনা নামক দুইটী সহর পার হইয়া পুলিয়ানো নামক স্থানে ইলেক্‌ট্রিক ট্রামওয়ে

ধরিলাম এবং যতদূর যাওয়া সাধ্য ভিসুভিয়সের নিকট পর্য্যন্ত গেলাম। এই ট্রামওয়ে ভিসুভিয়সের গা দিয়া উঠিয়াছে। যেখানে অবতরণ করিলাম সে স্থানের উচ্চতা ১২০০ ফিট্। কিছুদিন পূর্ব্বেই ভিসুভিয়সে অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল। তখনও শিখর হইতে ( crater ) ধূম নির্গত হইতেছে দেখিলাম। পর্ব্বতের চারিদিকে ১০।১৫ ফিট ছাই জমিয়াছে। আমরা দেখিতে দেখিতে একবার অগ্ন্যুৎপাত হইল। শিখা হইতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহার পরেই ধূম নির্গত হইতে লাগিল এবং তরল ধাতু ( lava ) এবং ছাই বাহির হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ভিসুভিয়সের এই শিখরের নিকট আর একটী শিখর দেখিলাম। যাহার অগ্ন্যুৎপাতে হারকুলেনিয়ম এবং পম্পেয়ী ধ্বংশ হইয়াছিল। ইহা এখন আর অগ্ন্যুদ্গীরণ করে না, মৃত হইয়াছে। এখানে কতকগুলি আমেরিকান দেশ পর্য্যটকের সহিত সাক্ষাৎ হইল; তাঁহারাও ভূ-প্রদক্ষিণে বাহির হইয়াছেন। ইঁহাদের সদাচারে আমরা অত্যন্ত আপ্যায়িত হইলাম। এখানকার নিকটেই মানমন্দির দেখিতে গেলাম। এখানকার সুপারিনটেনডেণ্ট আমাদের খুব আদর করিয়া মানমন্দির দেখাইলেন এবং তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত যন্ত্রাদি বুঝাইয়া দিলেন। এই মহাত্মা গতবারের অগ্ন্যুদ্গীরণের সময় আপনার স্থান পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। যদিও তাঁহার অধীনস্থ লোকজন ভয়ে পলাইয়া গিয়াছিল তথাপি তিনি একাকী মানমন্দির রক্ষা করিয়াছিলেন। এজন্য সকল ইউরোপীয় রাজারাই ইঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন ও সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই মানমন্দিরে এক প্রকার যন্ত্র দেখিলাম যাহা দ্বারা পৃথিবীতে যেখানে অগ্ন্যুৎপাত বা ভূমিকম্প হয় পূর্ব্বাহ্নে জানা যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যেই Professor Mattanchhi গত বারের অগ্ন্যুৎপাত হইবার পূর্ব্বে নেপলসবাসিদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। প্রোফেসার আমাদের নিকট বলিলেন যে ১৮৯৬ সালে যে অগ্ন্যুদ্গীরণ হইয়াছিল তাহা এত ভয়ানক হইয়াছিল যে আর ২৪ ঘণ্টা হইলেই নেপলস সহর পম্পেয়ীর ন্যায় ভূ-প্রোথিত হইয়া যাইত। এই ভিসুভিয়স মানমন্দির দুই শত বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে। এখান হইতে আমরা ক্লান্ত হইয়া এরিমো নামক স্থানে যাইয়া উত্তমরূপ জলযোগ করিলাম। এইখানে একজন



অরগান বাজাওয়ালার বাজনা শুনিয়া বড় প্রীত হইয়াছিলাম। সে তাহার অরগানের সুরের সঙ্গে সঙ্গে ও তালে তালে এমন সুন্দর শিশ্ দিতেছিল যে সকলে মোহিত হইয়া গিয়াছিল। এ বেচারা খোঁড়া, প্রতিদিন তাহার অরগান ও ভগ্নপদ লইয়া দুই মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়া এখানে বাজনা বাজায় এবং যাহা পায় তাহাতেই তাহার সংসার প্রতিপালন হয়। এরিমোতে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া আমরা পম্পেয়ী দেখিতে গেলাম। রাস্তার সমস্ত স্থানে ভস্মরাশি, গত অগ্ন্যুদ্গীরণের ফল। পরে দুইটী সহর, Torredelgreco এবং Torre Annunziata দেখিলাম। এখানে ইটালীয়ানেরা তাহাদের প্রিয় খাদ্য ম্যাকারোণি প্রস্তুত করিয়া রাস্তার ধারে শুকাইতে দিয়াছে। ম্যাকারোণি ময়দায় প্রস্তুত হয়। ইহা দেখিতে লম্বা লম্বা দড়ির ন্যায় কিন্তু খাইতে বেশ সুমিষ্ট।

অনেকেই জানেন যে প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রোমানদিগের রাজত্ব কালে ভিসুভিয়স পর্ব্বতে অগ্ন্যুপাত হইয়া হারকুলেনিয়ম এবং পম্পেয়ী নামক দুইটী সহর ভূ-প্রোথিত হয়। ঐ সহর দুটী তদবস্থাতেই থাকে, পরে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে কৃষকেরা ভূমি কর্ষন করিতে করিতে প্রস্তরের থাম দেখিতে পায়। পরে ইটালীয়ান গবর্ণমেণ্ট ভূমি খনন করিয়া ভূ-প্রোথিত পম্পেয়ী নগরের আবিষ্কার করেন। হারকুলেনিয়ম এখনও প্রোথিত আছে। যেখানে এখন রেসিনো নগর ঠিক তাহার নীচেই হারকুলেনিয়ম। খনন করিতে গেলে রেসিনো নগর নষ্ট হয় বলিয়া এখনও উহা খনন করা হয় নাই; কিন্তু ইটালীয়ান গবর্ণমেণ্টের খুব চেষ্টা আছে যাহাতে উহা খনন করিয়া আবিষ্কার করা হয়। পম্পেয়ী কি প্রকার নগর ছিল তাহা হইতেই জানা যায় যে আজ দেড়শত বৎসর হইতে খনন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে তথাপি পঞ্চাংশের দুই অংশ মাত্র খনন হইয়াছে। ১৫ ফিট হইতে ২০ ফিট পর্য্যন্ত লাভা সহরের উপরে পড়ায় এবং তাহার পর একটা ভয়ানক ভূমিকম্প হওয়ায় সহরটী একেবারে ভূ-প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ভিসুভিয়স গিরির নিকটে আর একটী পর্ব্বত আছে যাহার উৎপাতে এই সহর নষ্ট হইয়াছে। উহার নাম Mount Somma। এই খনন কার্য্যে যে সকল বহুমূল্য শিল্প দ্রব্য ও প্রস্তর মূর্ত্তি

পাওয়া গিয়াছে তাহা নেপেলসের ন্যাশানেল মিউজিয়মে রাখা হইয়াছে। পম্পেয়ীর প্রাচীন রোমান গৃহাদি সমস্ত রহিয়াছে, উহার মধ্যে প্রধান ব্যাসিলিকা, ফোরম অর্থাৎ প্রধান বাজার, থিয়েটর, আপোলো মন্দির, ভিটেইদিগের বাটী এবং ক্যালিগির্ডলা ও বিজয় তোরণ। ভিটেইদিগের বাটীর কারুকার্য্য এমন সুন্দর যে এখনও বোধ হয় যেন অতি অল্পদিনই নির্ম্মিত হইয়াছে। বাটীর প্রতি গৃহে মেজেতে সুন্দর সুন্দর প্রস্তরের mosaic কার্য্য এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। কুকুরের গৃহ, ভল্লুক গৃহ আজিও বিদ্যমান আছে। এই কুকুরের গৃহের বিষয় বাইরণ কৃত Last days of Pompeii গ্রন্থে উল্লেখ আছে। কুকুরের মূর্ত্তি সাদা জমির উপর কাল পাথরে অবিকল স্বাভাবিক ভাবে খোদিত। দুই হাজার বৎসর আগেকার রুটীওয়ালার ও তৈল বিক্রেতার দোকান আজিও বর্ত্তমান; রাস্তায় পাথরের উপর তৎকালীন রোমান বীরদিগের রথের দাগ এখনও দেখা যায়। বেশ্যারা যে গলিতে বাস করিত সেই গলির মুখে এক প্রকার গুপ্ত চিহ্ন আছে যাহা দেখিয়া রোমান যুবকেরা স্থান চিনিয়া লইত। এই সকল দেখিলে রোমানদিগের আচার ব্যবহার ও গৃহস্থালীর বিষয় উত্তমরূপ জানা যায়। পম্পেয়ী প্রবেশ করিবার রাস্তার ধারে একটী ছোট মিউজিয়ম আছে যাহাতে কতকগুলি মৃত দেহের ছাঁচ আছে। কয়েকটা কুকুরেরও আছে। পম্পেয়ী ধ্বংশ কালে যাহারা পলাইতে না পারিয়া মরিয়া গিয়াছিল তাহাদের শরীরের অবিকল ছাঁচ লাভা ও ভস্মরাশির মধ্যে রহিয়াছে। ঐ ছাঁচ হইতে মনুষ্য মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইয়াছে। যে, যে অবস্থায় মরিয়াছে তাহার ছাঁচ সেই মতই রহিয়াছে। একটী স্ত্রী ও পুরুষের ছাঁচ এরূপে পতিত রহিয়াছে যে তাহা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে পলাইতে না পারিয়া স্ত্রী ও পুরুষ একত্রে আলিঙ্গন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। মিউজিয়মটী দেখিলে হর্ষ বিষাদের উদয় হয়। এই মৃত সহরের ভিতর ৩।৪ ঘণ্টা ঘুরিয়া অবশেষে আমরা শ্রান্ত হইয়া রেলওয়ে যোগে নেসলস প্রত্যাগমন করিলাম। হোটেলে আসিয়া রাত্রে ভিসুভিয়সের দিকে ভয়ানক অগ্ন্যুদ্গীরণ হইতেছে দেখিতে পাইলাম। আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত এই প্রথম দেখিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে কাপ্রি দ্বীপ দেখিতে গেলাম। কাপ্রি



নেপলস উপসাগরের একটী মনোরম দ্বীপ। যাঁহারা এই অঞ্চলে বেড়াইতে আইসেন কাপ্রি না দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন না।

প্রাতঃকালে আমরা আহারাদি সমাপন করিয়া বন্দরে উপস্থিত হইলাম। সেখানে কাপ্রি যাইবার ষ্টীমার জেটিতে প্রস্তুত ছিল। আমরা অবিলম্বে ষ্টীমারে উঠিয়া দেখিলাম ষ্টীমার লোকে পরিপূর্ণ। কেহ কাপ্রি কেহ বা অন্যরাপর স্থানে যাইতেছে। প্রায় এক ঘণ্টার পর ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। যতক্ষণ ষ্টীমার জেটিতে ছিল ততক্ষণ ডুবুরিদের তামাসা দেখিতেছিলাম। কতকগুলি লোক সমুদ্রে সন্তরণ করিতেছিল এবং ষ্টীমারের উপর থেকে কেহ রৌপ্য মুদ্রা কেহ বা তাম্র মুদ্রা জলে ফেলিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ জলে ডুবিয়া দন্তের দ্বারা ধরিয়া জলের উপর উঠিয়া লোকদিগকে দেখাইতেছিল। ইহাতে ইহাদের নিপুনতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। এটী কেবল নেপলস বন্দরে নহে বরাবর এডেন হইতে প্রতি বন্দরেই দেখিতে দেখিতে আসিতেছিলাম। এ বিষয়ে এডেনে আরব বালকেরা বিশেষ নিপুন। কাপ্রি যাইবার পথে সোরেণ্টো নামক পরম রমণীয় সহর দেখিলাম। এখানে দশ সহস্র ইটালীয়ানের বাস এবং বিদেশী লোকও অনেকে স্থানের রমণীয়তার জন্য বাড়ী করিয়া রাখিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস করেন। Marion Crawford নামক আমেরিকান নভেলিষ্টের একটী সুন্দর বাটী এখানে আছে। বাটীটি একটী ছোট পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত। ক্রমে কাপ্রি দ্বীপের যত সন্নিকট হইলাম ততই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম। আমাদের ষ্টীমার বন্দরের একটু দূরে নঙ্গর করিল। যাত্রীদিগের নীল গুহা ( Blue grotto ) দেখিবার জন্য ঐ স্থানে দাঁড়াইল। নীল গুহা একটী বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। দ্বীপের এক স্থানে সমুদ্রের তরঙ্গ লাগিয়া গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। সেই গর্ত্ত কালে তরঙ্গ লাগিয়া বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার ভিতরের আয়তন ১৫০ ফিট। গর্ত্তের মুখটি ছোট কিন্তু ভিতরটী বেশ প্রশস্ত। ঐ গর্ত্তের ভিতর ছোট নৌকা করিয়া যাইতে হয়। গেলে দেখা যায় যে সমস্ত নীল। গর্ত্তের ভিতরের তরঙ্গ বাহিরের সামান্য আলোকে ঠিক নীল বর্ণ ধারণ করে। যে সকল লোক উহার ভিতর প্রবেশ করে তাহাদেরও সর্ব্বাঙ্গ নীল বর্ণ বলিয়া মনে হয়। গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করা

একটু ভয়াবহ কার্য্য। একটী ছোট নৌকা যাইতে পারে এমন রাস্তা আছে। নৌকায় আরোহীদিগকে নৌকার খোলের ভিতর শুইয়া থাকিতে হয় কারণ প্রবেশ কালে যদি কোন রকমে উপরের প্রস্তর মাথায় লাগে তাহা হইলে জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়। যাহা হউক আমরা সাহস করিয়া একটী নৌকা লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। যাইয়া চমৎকার দেখিলাম। সমস্ত নীল। মস্তকের উপর পাহাড় নীল, ভিতরের জল নীল, আমাদের নৌকা নীল এবং আমরাও নীল। কিয়ৎকাল ভিতরে থাকিয়া নৌকা লইয়া বাহির হইলাম। বাহির হইবার সময় বিশেষ সাবধান হইয়া আসিতে হয় কারণ সেখানে ভারি স্রোত। নীল গুহা দেখিয়া ষ্টীমারে উঠিব মনে করিতেছিলাম কিন্তু সকল যাত্রীর গুহা দেখিয়া ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইবে বিবেচনা করিয়া আমরা ঐ নৌকাতেই কাপ্রি বন্দরে গেলাম। এই গুহাতে রোমান বাদসা নিরো আসিয়া স্নান করিতেন। কাপ্রিতে আসিয়া একটী ফিটন ভাড়া করিয়া নগর দেখিতে গেলাম। কাপ্রি দুই অংশে বিভক্ত। বন্দরের ধারে যে অংশ তাহার নাম কাপ্রি, আর পর্ব্বতের উপরে যে অংশ তাহার নাম আনা-কাপ্রি। কাপ্রিতে প্রাচীন রোমানদিগের অনেক কীর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে টাইবিরিয়স্ বাদসাহের স্নানাগারটী প্রধান। টাইবিরিয়স্ মহোদয় এই কাপ্রির পর্ব্বত শিখর হইতে যে স্থানে তাঁহার বিজিত শত্রুদিগকে সমুদ্রের নীচে ফেলিয়া ডুবাইয়া মারিতেন সে স্থানটীও দেখিলাম। বড় ভয়ানক স্থান। কাপ্রি এককালে ইংরাজাধিকারে ছিল। তাহার পর ফরাশিশ্ বাদসাহ প্রথম নেপোলিয়নের আজ্ঞাক্রমে তাঁহার সেনাপতি মুরা অধিকার করেন। পরে উহা ইটালীয়ান গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হয়। এই কাপ্রির চারিধারে সমুদ্রে প্রবাল পাওয়া যায়। কাপ্রি দ্বীপ ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ। বৈকালেজ লযোগের পর পাহাড়ের উপরে বেড়াইতে লাগিলাম। তার পর সেখান হইতে প্রসিদ্ধ ফ্রালিয়োনি প্রস্তররাজি দেখিতে গেলাম। এই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তররাজি সমুদ্রের ভিতর হইতে দৈত্য সমূহের ন্যায় উপরে উঠিয়াছে। এক নূতন দৃশ্য। এইপ্রস্তরগুলি এক কালে কাপ্রির অন্তর্গত ছিল। ক্রমে বহুকাল তরঙ্গ লাগিয়া লাগিয়া দ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ছোট ছোট নৌকা ইহাদের ভিতর দিয়া যাতা-



য়াত করে। সকলগুলির মধ্যে যেটী বড় প্রস্তর খণ্ড তাহার ভিতরে আর একটী গুহা আছে। পরে আনা-কাপ্রি পরিদর্শন করিয়া আমরা ষ্টীমারে উঠিলাম। যখন আমরা ফিরিয়া নেপলস পথে যাই তখন একবার সোরো-ণ্টাতে যাত্রী উঠাইবার ও নামাইবার জন্য আমাদের ষ্টীমার দাঁড়াইয়াছিল। এখানে একটী রহস্য-জনক ব্যাপার দেখিয়াছিলাম। যেমন ষ্টীমার দাঁড়াইল অমনি কতকগুলা হোটেলের নৌকা আসিয়া দাঁড়াইল। যাত্রীরা ষ্টীমার হইতে অবতরণ কালে প্রত্যেক নৌকার মাঝিরা আপন আপন হোটেলের নাম করিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। "হোটেল সিরেন" "হোটেল কোকুমেলা" ইত্যাদি নানা রকম নাম কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার পর যাত্রী লইবার জন্য মারামারি। একটা ছোট খাট জল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এ ওর নৌকায় যাইল, বোর্ড জলে ফেলিয়া দেয় ও তাহার পর সুমধুর ইটালীয়ান ভাষায় গালি বর্ষণ। যাত্রীদের বিপদ। যাহা হউক আমরা ক্রমে নেপলস বন্দরে আসিয়া পৌছিলাম। নেপলস সহরে বহুতর গির্জ্জা দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিলাম তিন শতের উপর গির্জ্জা আছে। প্রত্যেক রাস্তায় একটী করিয়া অধিষ্ঠাতা পীর (Saint) আছেন এবং যেখানেই যাওয়া যায় একটী না একটী ভর্জিন মেরির Virgin Mary বা কোন পীরের মন্দির আছে। লোকগুলি গোঁড়া রোমান ক্যাথ-লিক এবং পাদ্রিরা যাহা বলিয়া দেয় তাহাই করে। যখন অনাবৃষ্টি হয় তখন ম্যাডোনার মুর্ত্তি লইয়া মহা সমারোহে রাস্তায় রাস্তায় বেড়ায়। অনেকে ভেট চড়ায় এবং আতশ বাজী পুড়াইয়া খুব ধুম ধাম করে। তাহা-দের বিশ্বাস এরূপ করিলে ম্যাডোনা সন্তুষ্ট হইয়া বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের ন্যায় এ সকল বিষয়ে খুব বিশ্বাস। ডাইনে খাওয়ার বিশ্বাস আমাদের দেশে যেমন আছে এখানেও তেমনি আছে। কেবল এখানে কেন সমগ্র ইটালীতেই সাধারণ লোক মাত্রেরই আছে। বহু লোকের বাটীর দরজার উপর একটী করিয়া গরুর শিং আছে। ইহা থাকিলে আর ডাইনে খাইতে পারিবে না। অনেকে ঘড়ীর লকেটে ছোট ছোট শৃঙ্গের টুক্‌রা রাখিয়া দেয়। এ বিশ্বাস এত প্রবল যে প্রসিদ্ধ ইটালিয়ান্ রাজ মন্ত্রী Count Caprivi যখন তাঁহার দল পার্লামেণ্টে বিজিত

হয় তখন তিনি বলিয়াছেন "আজ আমরা শিং আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম তাই আমরা হারিলাম"। নেপলসে অলস লোক অনেক আছে এবং সাধারণ বালকগণ বড় দুষ্ট। স্থানে স্থানে আমাদের গাড়ীর পিছনে 'Indiano' 'Africano' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে দৌড়াইত। অরগানওয়ালা, বেহালাওয়ালা, মান্দোলিন, বাদক ও গায়কগণ যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। ভিক্ষুকের ত কথাই নাই। ইটালীয়ানেরা বিশেষতঃ দক্ষিণ ইটালীর অধিবাসিরা অল্প বয়সে বিবাহ করে সেজন্য ১৫। ১৬ বৎসরের স্ত্রীলোকদিগের দুই তিনটী ছেলে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক বাড়ীর জানালায় গরাদে দেওয়া দেখা যায়, ইহাতে আমরা বোধ করিয়াছিলাম চৌরভয়ে এরূপ দেওয়া রহিয়াছে। কিন্তু শুনিলাম তাহা নহে, বালিকা বয়সে বিবাহ দেওয়ায় এবং পিতা মাতার অভিরুচি মত পাত্র পাত্রী স্থির করা নিয়ম থাকায় এখানে অনেক রোমীয় এবং জুলিয়ের প্রাদুর্ভাব। ইহাদের উৎপাত নিবারণের জন্য এই গরাদে দেওয়া হইয়া থাকে। এমন অনেক শুনা যায় যে পাদ্রিরাও সময়ে সময়ে রোমীয় হইয়া জুলীয় লইয়া পলায়ন করে। কোন যুবতীর প্রণয়ী যদি হঠাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে তাহা হইলে সে আপন প্রণয় চোরের পশ্চাতে পশ্চাতে একখানি ক্ষুর লইয়া দৌড়িয়া যায়। যেখানে পায় তাহাকে ধরিয়া হয় নাক কাটিয়া দেয় না হয় গালে মন একটী কুৎসিত দাগ করিয়া দেয় যে চিরদিনের জন্য তাহার মুখ দেখান ভার হয়। প্রণয়ের উৎপাত এখানে বড় বেশী। যাহা হউক এক্ষণে নেপলসের অবস্থান কাল আমাদের ফুরাইয়া আসিলে, আমরা ভুবন প্রসিদ্ধ রোম নগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

শ্রীপশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

---

# কাব্য ইতিহাস।

[ ৪ ]

ধর্ম্ম কর্ম্ম পূজা পার্ব্বনাদি।—

মহাপ্রভু চৈতন্যের পর বৈষ্ণব ধর্ম্ম সমস্ত বাঙ্গালা জুড়িয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। সমস্ত লোকেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'আখড়াধারী' বৈষ্ণবের সংখ্যা অল্পই ছিল। গৃহী বৈষ্ণবই অধিক। এমন কি আমরা দেখিতে পাই, কবিকঙ্কণ, ঘনরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ চণ্ডীমঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি বিসদৃশ কাব্য রচনা করিলেও তাঁহারা নিজে বৈষ্ণব ছিলেন। ইহাতে এমন বলিতেছি না, যে বাঙ্গালায় বৈষ্ণব ধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম হইল। শাক্ত শৈব প্রভৃতিও ছিল।

বাঙ্গালীর ঘরে পূজা পার্ব্বনাদির অভাব ছিল না। বার মাসে তের পার্ব্বন অটুট ছিল। মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, বাশুলী, ষষ্ঠী, সত্যনারায়ণ, মনসা, ধর্ম্ম প্রভৃতি দেব দেবীর পূজা লাগিয়াই আছে।

এই সকল দেব দেবীর পূজা হিন্দুর অন্তঃপুরে হিন্দুর মেয়ের অতিশয় আদরের জিনিস ছিল এবং এখনও আছে। ইহার প্রত্যেকটীরই এক এক কথা ছিল। মেয়েরা আপনারাই সে সকল কথা বলিতেন। শেষে সেই সকল কথা বৃহৎ কাব্যে পরিণত হয়।

মৃত্তিকা শিবলিঙ্গ প্রায় প্রত্যেকে পূজা করিত। চৈত্র মাসে নানা বাদ্য সংযোগে, নানা উপচারে শিবপূজা ও চড়ক হইত। কেহ বা চতুর্দ্দশীতে সমস্ত দিন উপবাসে থাকিয়া নিশি জাগরণ করিত;—

জীবন অবধি পূজে মৃত্তিকা শঙ্কর। —৩৬ ক, ক, চ,
চৈত্র মাসে পূজে শিব নানা উপচারে।
ঢাক ঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে॥
জিহ্বা কাটে জিহ্বা ফোড়ে করয়ে চড়ক।
অভিমত ফল পায় না যায় নরক॥ — ৩৬ ক, ক, চ
যদি পায় চতুর্দ্দশী, থাকে তবে উপবাসী,
নিশাকালে করে জাগরণ॥ — ৩৭ ক, ক, চ,

মঙ্গলচণ্ডী, ধর্ম্ম প্রভৃতি ঠাকুরের পূজার সময় 'গাজন' হইত; সেই

গাজনের সময় নির্দ্দিষ্ট দেবীর পাঁচালী হইত। দেব দেবীর পূজার পর সমস্ত দিন, রাত্রি, এইরূপ গানে কাটিত। এই পাঁচালীর একজন মূল গায়েন থাকিত, সেই চামর হস্তে, গান গাহিত। আর কতকগুলি তাঁহার গানের সুর ধরিয়া থাকিত। তাহাদের হাতে থাকিত মঞ্জিরা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সকল পাঁচালীতে কঠিন কঠিন রাগ রাগিনী আলপিত হইত; এবং দেশীয় লোকে তাহার রস গ্রহণে সক্ষম ছিল; খাওয়া দাওয়া ভুলিয়া এই গানে ভোর হইয়া থাকিত। ইহাই ছিল তখনকার আমোদ আহ্লাদ; হায়! এখন আর সে পাঁচালীর গান, সে যাত্রার গানের পরিবর্ত্তে—সে মধুর শিক্ষণীয় রাগ রাগিনীর পরিবর্ত্তে—চুট্‌কী রাগিনী বহুল থিয়েটারের আবির্ভাব হইয়াছে। লোকে সঙ্গীত শাস্ত্রের শিক্ষা ছাড়িয়া চুট্‌কীর মোহে ভুলিয়া—যুগযুগান্তরের কষ্ট লব্ধ ধন বাঙ্গালীর গৌরবের সামগ্রী ভুলিতে বসিয়াছে।

আতিথ্য উৎসব;—

অতিথি গুরুর ন্যায় সেবা ভক্তি পাইতেন। দেশে প্রচুর পরিমাণে আতিথ্য প্রচলিত ছিল। এমন কি যে গৃহস্থ অতিথি সেবা না করিত, সে গৃহস্থ-নাম বাচ্য হইবার যোগ্য ছিল না *। অতিথি সেবা লোকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিত এবং অতিথির অনাদরে অনন্ত নরকভোগ হইবে ভাবিত;—

অতিথিকে, মিষ্ট অন্ন পানেতে পূরিয়া দিল থালা।
কর্পূর তাম্বুল দিল ঘৃত পুষ্পমালা॥ —৯২ ক, ক, চ
পরিবার সহিত সেবক হ'য়ে সেবে।
জ্ঞানবান গৃহস্থ যেমন গুরুদেবে॥ — ২৬৮ ধ, ম
গৃহস্থ জনার ধর্ম্ম অতিথির সেবা।
যত ধর্ম্ম ইহাতে কহিতে পারে কেবা॥
অতিথি সেবায় খণ্ডে অশেষ পাতক।
অনাদরে অতিশয় সঞ্চরে নরক॥—২৬৮ ধ, ম,

* গৃহী বলা দায়, ভিক্ষা মাগি খায়
না করে অতিথি সেবা। — ১২ অ, ম



আবার দেখিতে পাই কবি মুকুন্দরাম যখন দেশত্যাগী হইয়া পলাইতে ছিলেন, তখন কত দরিদ্র ব্যক্তিই তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। আবার অন্নদামঙ্গলে ভবানন্দ ভবনে মানসিংহের আতিথ্য—ধর্ম্মমঙ্গলে—লাউসেনের কর্ম্মকারের আবাসে আতিথ্য গ্রহণ ইত্যাদি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে আতিথ্য তখন দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকই করিত।

দেশে এত আতিথ্য থাকিলেও, কোন কোন ধনীব্যক্তি ভিক্ষুকদের প্রতি নিতান্তই বিরূপ ছিলেন।

ভিক্ষুকের সাক্ষাতে সংবাদ নাহি কাজ।
বল যেয়ে মহলে নাহিক মহারাজ॥
তবে যদি সহসা প্রবেশ করে পুরে।
দ্বার দিয়া দূর কর ছোবাইয়া কুকুরে॥ ২৮৮ ধ, ম,

তখন সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল;—

চিরুণী কুন্তল জালে, সিন্দুর তিলক ভালে,
সঘনে নাড়য়ে আম্রডাল।
সঘনে হুলুই পড়ে, রতি চতুর্দ্দোলে চড়ে,
ইন্দ্রের হৃদয়ে বাজে শাল॥ ২২, ২৪, ১৭৪, ক, ক,চ
৬৩৩, ৬৩ ধ, ম, ২১ অ, ম,

পুত্রের জন্মের পর সকল ক্রিয়াই করা হইত। পাঁচ দিনে 'পাঁচোট,' হইতে অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ ইত্যাদি সকল আচারই ছিল (৪৫ ক, ক, চ; ৬৬, ১২৫৩৬ ধ ম; অ, ম,)

বিবাহে 'খুঁটি নাটী' সকল ক্রিয়াই করা হইত; 'জলসহা' 'হাঁড়ী-মঙ্গলান;' 'ছামনী নাড়া' প্রভৃতির মেয়েদের আচার হইতে [নান্দীমুখ, গন্ধাধিবাস ইত্যাদি শাস্ত্রীয় আচার সমস্তই] প্রতিপালিত হইত। ২৪, ২৫, ২৬ ক, ক, চ,

কেহ আগাইয়া ধীরে গুড় চাউলী মারে,
গুহা কাটায় হৈল গণ্ডগোল। ৪৮

স্ত্রী আচারের ব্যাপার—(ক, ক, চ ১২৪ পৃঃ ৬৯—৭৪ ৫১৫—৫২০ পৃঃ ধ,ম)

বিবাহ হইয়া গেলে, বর কন্যা ক্ষীর খণ্ড খাইত। বিবাহে গাত্রহরিদ্রার পর এয়োগণকে তৈল সিন্দুর ইত্যাদি দেওয়া হইত ;—

এয়ো, সবাকারে দিল তৈল সিন্দুর চিরুণী। ১৫৪ অ, ম

বর প্রায়ই দোলা আরোহণ করিয়া বিবাহ করিতে যাইত ; আর সেই দোলা 'বাউরী' জাতি যোগাইত ;—

গমনের শুভবেলা বাউরী যোগায় দোলা,
তথি বীর কৈল আরোহণ। ৪৮ ক, ক, চ

পোষাক পরিচ্ছদ ;—

কাপড়ের মধ্যে তসর, গড়া, পাটশাড়ী, নেত, সগোল্লাদ মেঘডম্বুর, কমলা বিলাস।

এতদ্ভিন্ন পাগড়ীর জন্য জরিশাল সরবন্দ বীরা। অ, ম ১৩০, ১৫৯ ধ, ম ) শাল ছিল, সকল আভরণাদি পরিয়া শাল গায়ে দিত ;—

আভরণ পরিয়ে উড়িল গায়ে শাল।—২৬০ ধ, ম

গহনা ;—

সীমন্তে সীঁথি, কণ্ঠে কণ্ঠহার ( গজমতি হার ) পুঁতি, দোমতি, তেমনি, পাঁচনলী, সাতনলী, কেয়াপাতা ; নাশায় নত বেসর, হস্তে কণক কঙ্কন, বাজুবন্দ, কড়াই, অঙ্গদ, বলয়, তাড়, কুলুপিয়া শঙ্খ, কর্ণে কুণ্ডল, সোনার চাঁপা, হেম মুকুলিকা, কর্ণপুর ; কটিতে কিঙ্কিনী, অঙ্গুলীতে রতন অঙ্গুরী ; চরণে নুপুর, গোটামল, পায়ের আঙ্গুলে পাশলী—আর পৃষ্ঠে দোদুল্যমান ঝাঁপা। *

ছেলেদের গহনা ,—

কনক কাবাই কণ্ঠহার।—৭৩৩ পৃঃ ধ, ম,
খানা জরি জরদ জামাযোড়া। —৭৭১ ধ,ম

কাঁচুলীর বড়ই গৌরব ছিল। এই কাঁচুলী নির্ম্মাণে, স্ত্রীলোকগণ অতিশয় শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেন। কাঁচুলীতে সমস্ত দেব দেবীর মূর্ত্তি সুতার বোনান থাকিত।

* ক, ক, চ ১৫৯ পৃঃ ধ, ম, ২০৫, ৩৪২, ৬১২, ৭১৪ পৃঃ অ, ম শিবামঙ্গল—১০৩ ইত্যাদি।



ইতর স্ত্রীলোকেরা 'খোসলা' নামক একরূপ শীতবস্ত্র গায়ে দিত। এবং খুঞা বা ক্ষৌমবাস পরিত।

গহনার মধ্যে ;—

দু হাতে দুগাছি মেঠে, 'গলায় রসের কাঠি,' হিঙ্গুলের পলা দুটী, নাকে নাক চোনা, 'পিত্তলের ঝুট্টা পায়,' করাঙ্গুলে পিত্তল অঙ্গুরী।

এই সকল সুবর্ণ ও রজতের অলঙ্কার প্রস্তুত করার জন্য বাঙ্গালা প্রসিদ্ধ ছিল। অতি বিচক্ষণ স্বর্ণকার বাঙ্গালায় বাস করিত।

চাষবাস ;—

তখন চাষবাসই দেশের লোকের মুখ্য জীবিকা ছিল। সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে আবাদ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। সকলেরই ঘরে গোয়ালভরা গরু, মরাইভরা ধান, উঠানভরা ফসল বিরাজ করিত। সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও খাদ্য সকল আপনারাই আপনাদের ক্ষেত্রে উৎপন্ন করিত বলিয়া তাহারা অর্থের জন্য লালায়িত হইত না। আপনার ক্ষেত্রের উৎপন্ন শস্যেই সংসার চলিয়া যাইত। এই কৃষিপ্রিয়তাই তখন দেশে সুখ শান্তি স্থাপন করিয়াছিল। কৃষিজীবী লোকেই সুখী ছিল। ঘনরাম বলিতেছেন 'সুখবাসী চাষী'। ইহা অতি যথার্থ কথা। তখন চাষ করিতে লোকে অপমান বোধ করিত না। বরং আপনাকে কৃতার্থ মনে করিত ;—

ধন্য অগ্রহায়ণ মাস, ধন্য অগ্রহায়ণ মাস।
বিফল জনম তার যার নাহি চাষ॥ ২৮৬ ক, ক, চ

চাষের বিবরণ শিবায়ণে যাহা পাওয়া যায়, তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

শুনিতে সুন্দর চাষ আয়াস বিস্তর।
সকল সম্পূর্ণ যার তার নাহি ডর॥
চাষ বলে ওরে চাষী তোকে আগে খাব।
মোরে খাবি পশ্চাতে যদ্যপি ক্ষেতে হব॥ ৮৩

* * *

আগে পুতে ভাল চাষ অভাবে সেদির।
অন্যথা হা-ভাতে হেল্যা বিকায় সত্বর॥ ৭৩

মহীতলে মাঘ শেষে মেঘ রস দিলা।
দিন সাত বই বাত পাইয়া ঈশানে।
হৈল হল প্রবাহ শিবের শুভক্ষণে॥
আরম্ভে উগালা গেল একশত কুড়া।
পড়ে গেল পাশে যেন পর্ব্বতের চূড়া॥
হাল ছাড়ি দু দণ্ড হালুয়া আইল ঘরে।
বান্ধ আলি বৈকালে বান্ধিল একবারে॥
হেল্যা চরাইতে হালুয়া বান্ধিলেক ঝাড়ি।
লোকালোক পর্ব্বত প্রমাণ কৈল আড়ি॥
মধ্যখানে খানিক খসাইয়ে দিল চালা।
দক্ষিণ মোহান হৈল জল যেতে নালা॥
শর আরোপিয়া পগারের চারি পাশে।
সাঁজি শিব সেবক সহিত আইলা বাসে।

ইত্যাদি হইতে ( ৭৪ পৃঃ হইতে )।

ডাক সংক্রমণ দিনে ক্ষেতে পুতে নল।
কার্ত্তিকের কত দিনে কেটে দিল জল।

পর্য্যন্ত ( ৮০ ৮১—পৃঃ পর্য্যন্ত শিবায়ণ। )

চাষের সরঞ্জাম—লাঙ্গল, জুয়ালি, মই, কোদাল, ফাল, দা, উখুন, পাশী।

গরুর রোগ ও ঔষধ ,—

হেল্যার কিয়ারী করি কৃমি কৈল দূর।
তাহাতে রসুন তৈল দিলেন প্রচুর॥ ৭৯ শিবায়ন।

শ্রীযাগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

# সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্।

[ ৪ ]

মাণ্টাপান হইতে ষ্টীমারে হর্‌বোলার খাঁড়ী পার হইয়া রামেশ্বর দ্বীপে আসিবার সময় সমুদ্র জলে মাঝে মাঝে শুষ্ক বাক্‌ড়া সহ তাল পাতা পোঁতা দেখিয়াছিলাম। কম জল দেখাইবার জন্যই এই গুলি এরূপ ভাবে রাখা হইয়াছে। জাহাজ এই গুলি ত্যাগ করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গভীর জল দিয়া যায়। রামেশ্বর ষ্টেসনের নিকটে ঘর কত পর্ত্তুগীজ বাস করেন। আমাদের নবা ডোমের রংও শ্রীমান আলফনসোঁর রং অপেক্ষা ফর্সা। যাহা হউক পর্ত্তুগীজ বংশধরাংসগণের পুণ্য ক্ষেত্র রামেশ্বরম দ্বীপে বাস দেখিয়া তথা তাঁহাদের আবাস প্রাঙ্গনে কুক্কুটের উচ্চরব শুনিয়া আমার মনে যে ভাব হইয়াছিল তাহা আর বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই। অনেক নেটীব কৃশ্চনও তথা বাস করেন।

মন্দিরে আসিবার পথে রাস্তার দু ধারে সমোচ্চ নারিকেল তরুর সারি চলিয়াছে। দেখিতে অতি বাহার। উচ্চে ১০। ১২ হাতের বেশী হইবে না সুতরাং তরুগুলির কৈশোর কাল সতেজ ও সুন্দর। লবণময় স্থানে নারিকেল গুবাক প্রভৃতি তাল জাতীয় তরুর স্ফূর্ত্তি বেশী। ত্রিবাঙ্কুড়ের সমুদ্র উপকূলে দেড় হাত উচ্চ নারিকেল গাছে নারিকেল ধরিয়াছে দেখিয়াছিলাম। কাঁদির নারিকেল প্রায় মাটীতে ঠেকিয়া রহিয়াছে। এই স্থানে একটী বাজার বসে, আমরা যখন যাই তখন কেনা বেচা হইতেছিল। রাস্তার দুই ধারে লোকের বাস ও যাত্রী থাকিবার বাটী। কিয়দ্দূর গিয়া আমরা আর একটী রাস্তায় পড়িলাম। আমরা যে রাস্তায় আসিতেছিলাম সেটি যেন একটি সমান্তরাল কোণের লম্ব রেখা। এই রাস্তাটি প্রশস্ত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমরা এই রাস্তায় পড়িয়া বাম দিকে ভাঙ্গিলাম অর্থাৎ মন্দিরের বিপরীত দিকে গমন করিলাম। উদ্দেশ্য যে প্রথমে রাত্রি যাপনের স্থান ঠিক করিয়া লইব ও আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া পরে নগর দর্শনে বাহির হইব। আমরা যখন মাণ্টাপানে ষ্টীমারে উঠি সেই সময়ে রামেশ্বর হইতে প্রত্যাগত যাত্রীর মুখে নানা বিষয়ের সংবাদ লইয়া

ছিলাম। এই যাত্রীরা আর কেহই নহেন কংগ্রেসের ডেলিগেট, আমাদের মত কংগ্রেস দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছিলাম যে গঙ্গা-রাম পাণ্ডাই ভাল লোক ও বাঙ্গালী ঘেঁসা ও ভদ্রলোকের কদর জানেন। বাঙ্গালীরা প্রায়ই সেই স্থানে থাকেন। সুতরাং আমরা গঙ্গা পাণ্ডার অন্বেষণে বাহির হইয়া সেই সমোচ্চ নারিকেল তরু সেবিত রাস্তায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলাম। পাণ্ডার বাটী অধিক দূর নয়। রাস্তার এক পার্শ্বে তাঁহার বসত বাটী। রাস্তার অন্য পার্শ্বে যাত্রী থাকিবার ঘর এটাও একটা মস্ত বাড়ী ও অনেক মহল আছে দোষ মহলে গোহাল। এখানে একটী ঘর অধিকার করিয়া জিনিষ পত্র রাখিতেছি এমন সময় পূর্ব্ব পরিচিত তিনটী বাঙ্গালী যুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহারাই মাণ্টাপালে সমুদ্র স্নান করিয়াছিলেন। ইহাদের একজনের নাম প্রমথ বাবু, ইনি কালেজের প্রোফেসার। ইনি বলিলেন যে এক সঙ্গেই রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা হোক না। আমাদের অসম্মতি না থাকায় আমাদের ছয় জনের জন্য খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। দেখিলাম খিচুড়ী ভিন্ন অপর কিছু হইবার সুবিধা নাই। বেশী করিয়া ঘৃত দুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া ছয় মূর্ত্তি মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমাদের বাসা বাটীতে অনেক দেশের যাত্রীই রহিয়াছেন। তবে বাঙ্গালীর মধ্যে দেখিলাম এক জন সন্ন্যাসী। তিনি আপনার ভাবেই ভোর—নিমেষে গঞ্জিকা পুড়িয়া ভস্ম হইতেছে। সন্ন্যাসী প্রবর দুই এক কথা আমাদের উদ্দেশে কহিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা না গা পাতায় তিনি বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। আমার ইচ্ছা ছিল যে কথা কহি, কিন্তু আমার সহযাত্রীরা সকলেই তাহাতে নারাজ হইলেন। রাস্তায় যাইতে কত দেশের কত রকম বিভিন্ন বেশ ভূষার পুরুষ ও স্ত্রীলোক দেখিলাম। রামেশ্বরম দ্বীপ যে ভারতবর্ষের এপিটমি ( Epitome ) সকল জাতীয় লোকই তথা উপস্থিত। তবে গিরি বাসিনী নেপাল সীমন্তিনীরা এতদূর সুন্দরী তাহা আমার জানা ছিল না। আমার শুনা ছিল কাশ্মীরী মহিলারা কুলু-বিহারিনীরা ও ভাটিয়া ললনারাই সৌন্দর্য্যে ভারতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ভাটিয়া আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আর কিছু দেখি নাই।



সে যাহাহৌক রাস্তার দুই পার্শ্বে যাত্রী বাটীর দরজায় বা খোলা বারান্দায় আলোকে বেশ বিন্যাস প্রভৃতি নানা কার্য্যে মগ্ন স্ত্রী পুরুষ যাত্রী দেখিতে দেখিতে ক্রমে শ্রীরামেশ্বরম মন্দিরের সিংহ দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমার সাধ্য নাই যে এই মন্দিরের বর্ণনা আমি করি। পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য কেবল মাত্র সংক্ষেপে অতি সংক্ষেপে দুই কথা লিখিব। সজ্জিত প্রতিমার সঙ্গে একমেটে ঠাকুরের যে তুলনা প্রকৃত বর্ণনার সঙ্গে আমার লেখা সেইরূপ তুলনা হইতে পারে। পাঠক মহাশয় কোন পুস্তক যোগাড় করিয়া বিশেষ বিবরণ পাঠ করিয়া লইবেন। মন্দির দেখিব কি —ভাবনায় ডুবিয়া গেলাম। নিকটে পাহাড় পর্ব্বত নাই, কি করিয়া কোথা হইতে এত পাথর আসিল? এত বড় বড় পাথর কি করিয়া তোলা নাবা করিল? কি যন্ত্রের সাহায্যে এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিল? ইহার সদুত্তর প্রদান করিতে কেহই সমর্থ নহে। কত কাল ধরিয়া এই মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কত কোটী টাকার শ্রাদ্ধ হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? এই সকল মন্দির নির্ম্মাতা শিল্পীরা কোথা হইতে আসিয়াছিল? এই সকল ভাবনা প্রবাহে ভাসিয়া চলিলাম। উঃ সে কালের কি ইঞ্জিনিয়ারিং! পুরী ক্ষেত্রে ৺ জগন্নাথ দেবের মন্দিরের একখানা পাথর খসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, সে পাথর পাশ্চাত্য ইঞ্জিনিয়ারগণ আর বসাইতে পারেন নাই। তখন পুরী ধামে ৺ বলরাম মল্লিক সদরালা তিনি চাঁদা করিয়া ঐ পাথর বসাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু পারেন নাই, বিফল মনোরথ হয়েন।

উত্তর ভারতের মন্দির নির্ম্মাণের প্রথা স্বতন্ত্র। সেদিকে মন্দিরের এক চূড়া। দক্ষিণ ভারতে প্রত্যেক মন্দিরের দুইটি করিয়া চূড়া। যে সহরে মন্দির আছে তাহাকে "কোয়েল" বলে। দক্ষিণ ভারতে কোয়েল—সহর বিস্তর। তাঞ্জোর মন্দিরের যেরূপ নির্ম্মাণ কৌশল সকল মন্দিরের প্রায়ই সেইরূপ ছাঁদ—অন্তত বাহির হইতে দেখিতে সেইরূপই ছাঁদ দেখায়। এক একটি মন্দিরের মধ্যে একখানি গ্রাম অনায়াসে থাকিতে পারে। কতক বক্তব্য তাঞ্জোর মন্দির উপলক্ষ্যে বলিয়াছি তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

প্রথমেই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পরিখা দেখিলাম। এই মন্দিরের দুই দিকে অর্থাৎ পরস্পর বিপরীত দিকে দুইটি তোরণ দ্বার—যেন একটি সদর ও একটি অন্দর তা বলিয়া খিড়কী দ্বার ছোট নহে। মন্দিরের মধ্যে বড় বড় পুষ্করিণী আছে—তাহা গজগিরি পাথর দিয়া গজগিরি। রামেশ্বর মন্দিরে ঢুকিবার তোরণ দ্বার বড়ই উচ্চ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহা রথের চূড়ার ন্যায় স্তবকে স্তবকে উঠিয়াছে ও তাহা উপরে অস্ত্রাগার স্বরূপ ব্যবহার হইত। বেশ বুঝা যায় এক একটী মন্দির এক একটি দুর্গ ছিল। পরিখার পর দুর্ভেদ্য প্রাচীর। প্রাচীরের প্রশস্ততা ৮। ১০ হাত হইবে। মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম দুই ধারে (অর্থাৎ তোরনের নীচে দেউড়ী স্থানে যাহা বিশ হাত লম্বা ও দশ হাত প্রশস্ত হইবে) দোকান বসিয়াছে। এই সব দোকানে বিক্রয় হইতেছে নানা আকারের রাম সীতার মূর্ত্তি, পটেও আছে অপর প্রকারেরও আছে। বিক্রয় হইতেছে সমুদ্রের কড়ি, শঙ্খ, পলা প্রভৃতি সামুদ্রিক দ্রব্যাদি। আরও নানা প্রকার দ্রব্যাদি, ছবি ফল মূল। যখন পার হইয়া বাম দিকে যাইতে হয় আগাগোড়া খিলান করা ছাদ ১০ হাত প্রশস্ত বারান্দা মধ্যে মধ্যে জানালা। ছাদে ও পাথরের প্রাচীর গাত্রে নানা প্রকারের মূর্ত্তি অঙ্কিত। নরসিংহের মূর্ত্তিটা কিছু ঘন ঘন। পৌরাণিক চিত্রও আছে, ইন্দ্রসভা, রামসীতার বিবাহ ইত্যাদি। কতক বা খোদিত কতক বা চিত্রিত। সামাজিক চিত্রও আছে। হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধচ্ছবি দেখিয়াছিলাম মাদুরায় প্রকাণ্ড মন্দিরে। মুসলমানের দাড়ী ধরিয়া হিন্দু চড় মারিতেছে তাহাও মাদুরায় দেখিয়াছিলাম। সামাজিক চিত্রটা মাদুরায় কিছু বেশী দেখিয়াছিলাম। যাহাহউক এইরূপ সিকি পোয়া রাস্তা যাইবার পর বারান্দা ঘুরিয়া প্রায় আধপোয়া গিয়াছে। ঐরূপ একই ভাব। তারপর আবার ঘুরিয়া আধপোয়া রাস্তা মধ্যে একটি তোরণ দ্বার, তারপর আবার দুইধার ঘুরিয়া পুনরায় বড় তোরণে আসিয়া মিলিয়াছে। এই চক মিলনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কোথায় কি আছে তাহা আমরা সব দেখিবার সাবকাশ পাই নাই। বিপরীত তোরণ পার হইয়া রাস্তায় পড়িতে হয় সেখানে দোকান পসার। বরাবর খানিক দূর গমন করিলেই একেবার অর্থাৎ পোয়া-টাক রাস্তা গমনের পর সমুদ্র উপকূল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিপরীত দিকের



তোরণ দিয়া বাহির হইয়া আমরা সমুদ্র উপকূলে গিয়াছিলাম। সেখানে প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়া রত্নাকরের বীচী ক্রীড়া দেখিতে দেখিতে ভাব সাগরে ডুবিয়া গেলাম। বন্ধুগণও সকলে অবাক্, কেহ আর কাহারও কথা শুনে না, আপনার আপনার ভাব লইয়াই সকলে ব্যস্ত। উপকূলের এক স্থানের মাটী কৃষ্ণবর্ণ ঠিক যেন পোড়া মাটী। পাণ্ডা সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বলিলেন (যিনি আমাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন) যে এই স্থানে সীতার অগ্নি পরীক্ষা হইয়াছিল তাই এই স্থানের মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ। তিনি আমা-দিগকে বলিলেন এই স্থানে সমুদ্রকে কিছু দান করিয়া অর্থাৎ জলে ফেলিয়া দিয়া অগ্নিপরীক্ষা ঘাটে স্নান করিতে হয়, পরে দান ধ্যান করিতে হয়। একটু তফাতে দেখিলাম স্তূপীকৃত প্রস্তর প্রভৃতি মাল মসলা। আমরা যখন দেখিতে গিয়াছিলাম তখন রামেশ্বর মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার হইতেছিল। দ্বিতীয় চূড়াটি গঠিত হইতেছিল। অনেক শিল্পী খাটিতেছিল। মন্দিরের ভিতরের অনেক ছোট ছোট মন্দিরেরও জীর্ণ সংস্কার হইতেছিল। দক্ষিণ ভারতে এক শ্রেণীর সদাগর আছেন যাঁহারা হিন্দু ও ধনকুবের। শুনিতে পাই আভিজাত্যে তাঁহারা কিছু ক্ষীণ। তাঁহাদের হাতেই এখন এই রামেশ্বরম মন্দির। তাঁহারাই জলের মত টাকা ব্যয় করিয়া আপনা আপনি চাঁদা দিয়া এই মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার করিতেছেন।

পাঠক মহাশয়কে আর আমার ভাব রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করাইব না অধিক লিখিতে গেলে পুঁথী বেড়ে যায়—এটা একটা মহাজনের কথা। তারপর ভাল মন্দ লোক ত আছেনই। কেহ অনায়াসেই বলিতে পারেন, "কাজ কি বাবা, তোমার চিন্তা তোমারই থাক, এখন গল্পটা কি তা বল"। তথাস্তু—তাই হোক—আমার ভাব আমারই থাক।

এখান হইতে লক্ষ্য করিলে বাণিজ্যের ব্যাপারটা দেখা যায়। দূরে জেঠি রহিয়াছে, নারিকেল, দড়ি, কাষ্ঠ, গুবাক, প্রভৃতি এখান হইতে জাহাজ-যোগে দূর দেশে চালান হয়। এখান হইতে সেতুটিও বেশ দেখা যায়।

উপকূলে একটি প্রকাণ্ড অচেনা গাছে অচেনা বড় বড় ফুল ফুটিয়াছিল রং—হলদে গোটাকত ফুল আনিয়াছিলাম কোথায় কি হইয়া গেল। সন্ধ্যার

প্রাক্কালে মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম। এখানে পূজা করিবার জন্য ট্যাক্‌স্ আছে। সেই টাকা সরকার বাহাদুরের লোক আদায় করে ও আদায়ী আফিস এই মন্দিরের মধ্যেই অবস্থিত। তারপর গঙ্গাজল বিক্রয় হয়, হরিদ্বারের জল, প্রয়াগের জল প্রভৃতি গঙ্গাজল শিশি করিয়া বিক্রয় হয়। একটী ছোট শিশির মূল্য ছয় টাকা। আমরা বিপরীত তোড়ণ দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বাম দিকে গমন করিলাম। দেখিলাম অসংখ্য ছোট ছোট মন্দিরে দেব দেবীর আরতি হইতেছে। কোথাও নরসিংহ দেব কোথাও লক্ষ্মীদেবী ইত্যাদি ইত্যাদি নানা স্থানের আরত্রিক দর্শন করিয়া আমরা শেষে রামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরের সম্মুখের ছোট মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বলিয়া রাখি প্রত্যেক দেব দেবীই এক একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে বিরাজিত। অনেক দেউড়ী দরজা পার হইয়া অনেক দূর যাইবার পর শেষ প্রকোষ্ঠে দেব বা দেবীর দর্শন পাওয়া যায়। এই সরু গলি পাথর মধ্যে ঘোর অন্ধকার। দিবাভাগেও প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রদীপের আলো থাকাতেও অন্ধকার যেমন তেমনই বিরাজ করিতেছেন। শ্রীমান অন্ধকারের বিশেষ প্রভাব যে আলো দ্বারাও ইহাকে জব্দ করিতে পারে নাই। যেমন অন্ধকার তেমনই গরম। যত অগ্রসর হইতেছ তত অন্ধকার ও গরম বাড়িতেছে। শেষে গাত্র হইতে বৃষ্টির ন্যায় ঘর্ম্ম পতিত হইতে লাগিল। নিশ্বাস রুদ্ধ হইবার মত হইতে লাগিল, একটু খোলা স্থানের বাতাসের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ প্রত্যেক দেব বা দেবীর প্রকোষ্ঠের ব্যবস্থা মুসলমান হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই কি এই ব্যবস্থা হইয়াছিল? বলিতে ভুলিয়াছি এই সকল লাট মন্দিরে ও প্রকোষ্ঠে চর্ম্মচটিকা অর্থাৎ চামচিকা মহোদয়েরা অবাধে রাজত্ব করিতেছেন। কেহ তাহাদের হিংসা করে না, কেহ তাহাদের অধিকার বিচ্যুত করিবার জন্য অস্ত্র ধারন বা সম্মার্জ্জনী ধারণ করে না সুতরাং তাহাদের অবাধ বাণিজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। মানুষের মধ্যেও বুঝি এমনই হয়। যাহাহৌক এই চামচিকার তীব্র গন্ধ ধূপ ধুনা গুগ্‌গুলের সঙ্গে মিশিয়া এক অপূর্ব্ব গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা দুই তিনটি ঘরে আরতি দেখিয়া শেষে রামেশ্বর মন্দিরে আসিয়াছিলাম।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ,
আশ্বিন ১৩০১ বঙ্গাব্দ,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ,
মাঘ ১৩০১ বঙ্গাব্দ,

ফাল্গুন। ৫ম সংখ্যা।

# পূর্ণিমা

## সপ্তদশ বর্ষ।


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্ | শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল | ১৫৯ |
| কাব্যে ইতিহাস | শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায় | ১৬৫ |
| দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ | শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ১৬৯ |
| ভাব ও ভাষা | শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ | ১৭৮ |
| সমালোচন ... ... ... | | ১৮৩ |

# সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্।

[ ৫ ]

রামেশ্বর মন্দিরে পূজার নির্দ্দিষ্ট সময় আছে কি না জানি না। আমরা কিন্তু শুনিলাম যে যখন ইচ্ছা যাত্রীগণ পূজা করিতে পারেন। শুনিলাম নিজে পূজা করিবার উপায় নাই। পাণ্ডারাই পূজা করিবেন। আপনি সব দ্রব্যাদি দিয়া বসিয়া অপেক্ষা করুন, আর জপই করুন। তারপর প্রসাদ ও নির্ম্মাল্য পাইবেন। ফল ফুল গঙ্গাজল সেই খানেই বিক্রয় হইতেছে। ফল নারিকেল আদিও পাওয়া যায়। মাল্য চন্দনও পাওয়া যায়। যখন শুনিলাম যে যখন ইচ্ছা পূজা হইতে পারে তখন আমরা সেই রাত্রিতেই ( অর্থাৎ সন্ধ্যার পরই ) পূজার কার্য্য শেষ করিব ও আহারাদির পর সেই রাত্রিতেই ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিব মনে করিলাম, কেন না তাহা হইলে ২৪ ঘণ্টা আমাদের হাতে পাইব। আমরা সময়ের কাঙ্গালী, কন্‌সেসন অর্থাৎ দয়ার টিকিটধারী অর্থাৎ এক ভাড়ায় আমাদের যাতায়াত হইবার কথা। সুতরাং ২৪ ঘণ্টা পাইব সে বড় কম কথা নহে। আমরা লাট মন্দিরে জপে বসিলাম ওদিকে পূজা হইতে লাগিল।

এই মন্দিরে আমরা অনেক দূর প্রবেশ করিয়াছিলাম। শেষে অসহ্য গরম বোধ হইলে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া লাট মন্দিরে জপে বসিয়া গেলাম। এই মন্দিরে দুই ধারে— অর্থাৎ প্রবেশ দ্বারের দুই ধারে দুইটি সমুদ্রের মূর্ত্তি। তাঁহারা পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিতেছেন। দুইটি সমুদ্রের নাম যথাক্রমে হইতেছে মহোদধি ও রত্নাকর অর্থাৎ Indian Ocean ও Arabian Sea. মন্দির প্রকোষ্ঠে যতদূর গিয়াছিলাম সেখান হইতে দেখিয়াছিলাম দেবদাসীর দল। কেহ বা চামর ঢুলাইতেছে, কেহ বা মাল্য নিবেদন করিতেছে ইত্যাদি। যতক্ষণ ছিলাম ইহাদিগকে নৃত্য বা গীত করিতে দেখি নাই। পূজা হইলে নির্ম্মাল্য লইয়া বন্ধুগণসহ বিদায় হইলাম। অর্থাৎ মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বড় তোরণে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে রাম সীতার মূর্ত্তি খরিদ করিয়া আর কি কি খরিদ করিয়া বাসায় আসিয়া পঁহুছিলাম।

আমরা যে সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম সে সময়ে মন্দিরের ভিতর

অনেক স্থানে এবং মন্দিরের দুইটি বড় চূড়ার মধ্যে দ্বিতীয়টি মেরামত হইতেছিল। এই সকল সংস্কার কার্য্য শেষ হইলে, বলাই বাহুল্য, মন্দিরটি আবার অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিবে। এখন ময়দানবের দিন না হইলেও মানুষের অসাধ্য প্রায়ই নাই। তবে বলিয়াছি কার্য্য বহু ব্যয়সাধ্য। তবে এ কথাও সত্য যে বণিক সম্প্রদায়ের হস্তে এই স্বেচ্ছা প্রণোদিত ভার ন্যস্ত হইয়াছে তাঁহারা এক একজনে এক একটি ধনকুবের। শিবের গুরু রাম, রামের গুরু শিব! শিবের মন্দির রামেশ্বরম্ দ্বীপে হইতে হইলে কুবের ভিন্ন আর কে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে?

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া কোন ক্রমে খিচুড়ী গলাধঃকরণ করিলাম। বুঝিলাম, যে ব্রাহ্মণ খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছিল সে রাঁধিতে জানে না। উপদেশ মত কাজ করিয়াছিল বটে, কার্য্যটি ঠিক না হওয়ায় ফলে দোষ পড়িয়াছিল।

শরীরের অভাব মোচন হইলে আমরা পাণ্ডার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। ফেরৎ আসিবার কালে পথিমধ্যে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসুর দলের সঙ্গে দেখা হইল। আমরা আসিতেছি—তাঁহারা যাইতেছেন। আমাদের নিকট বিবরণ শুনিয়া তাঁহারা সেই রাত্রিতেই ষ্টেসনে ফিরিয়া আসিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে বোম্বাই সহরের একদল পার্শি ছিলেন এবং অযোধ্যার বৃদ্ধ গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা ও পণ্ডিত গোকর্ণ মিশ্রও (যতদূর স্মরণ হয়) ছিলেন। আমরা রেল গাড়ীতে যখন শয়ন করিতে যাইতেছি তখন ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন, রেল গাড়ীতে আপনারা শয়ন করিবার স্থান পাইবেন না। আমরা কত কাকুতি মিনতি, কত যোড়হাত করিলাম, সবই ভাসিয়া গেল। তিনি অম্লান বদনে সমস্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীগুলি চাবীবন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা অগত্যা কেহ বা তৃতীয় শ্রেণীতে কেহ বা মৃত্তিকার উপর শয্যা রচনা করিয়া আকাশের তারা গুণিতে লাগিলাম। গাড়ীতে এত মশা যে তিষ্ঠিবার যো নাই। নিদ্রা ত হইলই না—কেবল কোন ক্রমে রাত্রি কাটান। অনেক রাত্রিতে দেখি ষ্টেশন মাষ্টারের লোক আসিয়া চুপি চুপি জন কত প্রিয় ব্যক্তিকে ১ম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে শোয়াইতেছেন। আমরা উঠিয়া তখনই জানিলাম তাঁহারা কাঁহারা। ইঁহারা সিংহলদ্বীপ হইতে রামেশ্বরম্ দেখিতে আসিয়াছিলেন। কেন যে



ইঁহাদের উপর ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় এতটা সদয় হইলেন তাহা কোন বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধই বলিতে পারে। তবে এ কথা সত্য যে এটা আমাদের অনুমান মাত্র। তখন অনুমান ছিল। পরে জিজ্ঞাসায় জানিয়াছিলাম যে অনুমান অমূলক নহে। যাহাহৌক সেই রাত্রিতে আমার আবার কাপড় চুরি গেল। অনেক কষ্টে রাত্রি পোহাইল। ভোরে রেল শকট ছাড়িল। আবার ষ্টীমারে উঠিলাম। মাণ্টাপানে আসিয়া আবার রেল সাহায্যে মাদুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা দুপুর হইবে।

মাদুরার ষ্টেসনের ওয়েটিংরুমে দেখিলাম ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত দীপনারায়ণ সিংহ ব্যারিষ্টার মহাশয় ও বাঁকিপুরের শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ ব্যারিষ্টার মহাশয়। সেইখানে মোট ঘাট রাখিয়া সহরে আহারের চেষ্টায় বাহির হইলাম। দীপনারায়ণ বলিলেন "অমনই অমনই বাড়ী যাইবেন, না দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করিবেন?" আমাদের উত্তর শুনিয়া বলিলেন সে ভাল কথা—ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্য দেখিবার জিনিষ বটে, প্রত্যহ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তবে হিন্দু মহারাজ জল গ্রহণ করেন, সেখানে সবই নূতন রীতি নীতি আইন কানুন—সবই নূতন—দেশটা দেখা উচিত। আমি দুইবার দেখিয়াছি, তবে তখন রেল হয় নাই নৌকাযোগে গিয়াছিলাম, অনেক খরচা পড়িয়াছিল ও অনেক সময় লাগিয়াছিল।

আমরা মাদুরার প্রশস্ত রাজপথে ঘুরিতে ঘুরিতে একটি হিন্দু হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে দুইটি নব যুবক দণ্ডায়মান হইয়া আমাদিগকে সমালোচন করিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইংরেজি জানেন। উত্তর, হাঁ জানি।

প্রশ্ন।—কি করেন?

উত্তর।—পোষ্ট আফিসে কাজ করি, এখনই ট্রেণে ত্রিচিনপল্লী যাইতে হইবে।

প্রশ্ন।—আমাদের একটু উপকার করিবেন? উত্তর।—করিব। কি?

প্রশ্ন।—এই হোটেল অধিকারীকে বলিয়া দিবেন আমাদের জন্য কি কি খাদ্য কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। আমরা ত ভাষা জানি না আপনি তামিল ভাষায় বুঝাইয়া দিন।

যুবক তামিল ভাষায় কথা কহিয়া বলিলেন, উহারা নিজের মত রাঁধিবে তাতে খাইতে হয় খান—না হয় চলিয়া যান। আমরা বেশী পয়সা দিতে অঙ্গীকার করায় কতকটা রাজী হইল। যাহাহৌক সময় আছে শুনিয়া বালকটীকে খানিকক্ষণ আটকাইয়া রাখিয়া মাদুরায় কি কি দেখিতে হইবে জানিয়া লইলাম।

আজ আহারে একটু সুখ হইল। আবার আসিব বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া এ স্থান ত্যাগ করিয়া সহর ভ্রমণে বাহির হইলাম। তাঞ্জোরে যেমন কোন ইন্দ্রজালিকের হস্তে মুহ্যমান নগর দেখিয়াছিলাম এখানে সেরূপ নহে। এখানে তেজ আছে, লোকের স্ফূর্ত্তি আছে দেখিলাম। লোকে সব আপন আপন কাজে ছুটিয়াছে। দলে দলে লোক এদিক হইতে ওদিক যাইতেছে। বাজার খুব সরগরম, খুব বেচা কেনা হইতেছে। তবে যেদিকে চাই দেখি রাশি রাশি পেঁয়াজ আর লঙ্কা। উঃ বিষ বিষ। কি করিয়া এত ঝাল খায়। আমার ধারণা ছিল বাঙ্গালরাই ঝাল খায়, এখানে বাঙ্গাল কাঙ্গালে তফাৎ নাই। মান্দ্রাজীরা ভীষণ ঝাল খায়, ঘৃতে দধিতে পর্য্যন্ত ঝাল মাখে, ডাল তরকারী ত ছেলে মানুষ। কেবল মাত্র গোলমরিচের ঝোল খায়। কেবল মরিচের ঝোল আর কিছু নাই—আলু টালু কিছু নাই। স্ত্রী স্বাধীনতা অবাধে যুবতীরা রাস্তায় গমনাগমন করিতেছে। ভ্রূক্ষেপও নাই। এক্কা খুব ছুটিতেছে। আমরা প্রথমে সরোবর দেখিলাম। প্রকাণ্ড পুকুরের মাঝখানে একটি রাজ প্রাসাদ। প্রাসাদটি একটি দ্বীপ স্বরূপ, নৌকা সাহায্যে যাওয়া যায়। বর্দ্ধমানের শ্যাম সায়ার কৃষ্ণ সায়ার দেখিয়াছেন? ইহাদের দুইটিকে এক করিয়া পুকুর বা সায়ার কল্পনা করুন, তাহার মাঝখানে দ্বীপ—বাটী। পুকুরের চারিদিক প্রাচীর বেষ্টিত, পুকুরের চারি ধারে ঘাট আছে, চারি তরফে উদ্যান আছে। তার পর রাজবাটী দেখিলাম। পূর্ব্বে মাদুরায় হিন্দুরাজাদের রাজধানী ছিল। এখন রাজবাড়ীতে কাছারী। রাজা যেখানে স্নান করিতেন, এখন সেখানে মুন্সেফের কাছারী। জপের ঘরে সব্‌জজ, রাজদরবার হলে—সেশন জজ। হলেরই এক পার্শ্বে Bar Library উকিলদের বসিবার আড্ডা ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

লর্ড কর্জ্জন ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করিবার হুকুম দেন। কই



এখানে কি সে হুকুম পঁহুছায় নাই? লাহোরে মতী মসজিদে খাজনাখানার সংস্থাপন দেখিয়াই ত লর্ড কর্জ্জনের মনে ঘৃণার বেগ আসিয়াছিল, তাই ত তিনি ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষার জন্য যত্নবান হন। সে যাহাহৌক আমরা রাজবাটী দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলাম। ভরষা করি অচিরে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে দৃষ্টি পতিত হইবে।

রাজপুরী ত্যাগ করিয়া বিষাদ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা মাদুরার মন্দির দেখিতে চলিলাম। খুব বড় মন্দির ও একেবারে সজীব। অর্থাৎ এই মন্দির হিন্দুর একটি বড় তীর্থ। এই মন্দিরে অসংখ্য দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে। তাঁহাদের স্নান, পূজা, ভোগরাগ, আরত্রিক, পরিক্রমণ, বিশেষ বিশেষ ভোগ, বিশেষ বিশেষ সময়ে ধূনা পোড়ান ইত্যাদি ব্যাপারে ও যাত্রীগণের কলরবে মন্দিরটি মুখরিত। মন্দিরের বড় দরজায় একটি বাজার বসিয়াই আছে, অনেক দোকান পাট। আমাদিগকে খদ্দের ধরিবার জন্য দলে দলে দালাল ছুটিয়া আসিল।

দক্ষিণ ভারতে একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছি, সেটি হইতেছে দেব দেবীর পরিক্রমণ। মান্দ্রাজী অর্থাৎ তামিল শব্দটি ভুলিয়া গিয়াছি। দেব বা দেবীকে ব্রাহ্মণগণ চতুর্দ্দোলে স্থাপন করিয়া স্কন্ধে চতুর্দ্দোল লইয়া নির্দ্দিষ্ট পথে মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। একবার দুইবার নয়, দিনের মধ্যে অনেকবার এই কার্য্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যকরগণ গমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে ধূপ ধূনা পোড়াইতে পোড়াইতে লোক যায়। নির্দ্দিষ্ট কয়বার প্রদক্ষিণ হইলে বিগ্রহ আবার মন্দিরে ফিরিয়া আসেন। কোন কোন স্থলে দেখিয়াছি, বাদ্যকরগণ অশ্ব পৃষ্ঠে বা বৃষ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে গমন করেন। মাদুরার মন্দিরে যে পুকুরটি আছে সেটি খুব বড়—তবে জল যেন সিদ্ধি গোলা। দলে দলে লোক ঐ পুকুরে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ তর্পণ, ভোজ্য উৎসর্গ আদি কার্য্য করিতেছেন। আমরা যখন মন্দিরে উপস্থিত হই তখন অপরাহ্ণ, তথাপি অত বেলায় এই সব কার্য্য চলিতেছিল। বোধ হইল ধূলা পায়ে এই সব করিবার বিধি আছে। আমরা যখন গমন করি তখন প্রধানা দেবীকে ঘর হইতে বাহির করিয়া চতুর্দ্দোলে বসান হইতেছিল। ঘর, পাঠক মনে আছে ত, সেই রামেশ্বর মন্দিরের মত অন্ধ তমসাচ্ছন্ন অতি দীর্ঘ

প্রকোষ্ঠ। প্রদীপের আলোতেও সেই সাত দেউড়ীর অন্ধকার ঘুচে না বরং আরো বাড়ে। এই প্রধানা দেবীর নাম "মীনাচী"। শুনিলাম ইনিই হরমহিষী পার্ব্বতী। পার্ব্বতী কি করিয়া "মীনাচী" হইলেন বৈয়াকরণ ঠিক করিবেন। গ্রীম আইন খাটে কি? মীনাচী দেবীর মন্দিরে ধ্বজা দিবার জন্য একটি স্বর্ণ ধ্বজদণ্ড আছে। বাঁশের মত লম্বা ও উহা অপেক্ষাও স্থূল; সুতরাং দ্রব্যটী বহুমূল্য বটে। কোথাকার রাজা দিয়াছেন তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। যেন মহীশূর নাম মুখে আসিতেছে। তবে কথাটার দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত নহি।

মন্দির গাত্রে নানা প্রকারের ছবি আছে। চতুর্দ্দোলে দেবী যাইতেছেন। দেবাসুর যুদ্ধ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, নরসিংহ মূর্ত্তির বড় বাড়াবাড়ি। হিন্দু মুসলমানের কলহ কেবল মাত্র উত্তর ভারতে বা মধ্য ভারতে আবদ্ধ ছিল না। এখানেও প্রাচীর গাত্রে উভয় দলের যুদ্ধ বর্ণনা। তবে সিংহের হস্তে তুলিকা পড়িলে যাহা হয় তাহা হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই দেখি মুসলমান ভায়ার দাড়ী ধরিয়া অপর এক ভায়া (যাঁহার দাড়ী নাই) গণ্ডে চপেটাঘাত করিতেছেন। মুসলমান মন্দিরে এই বিষয় বর্ণিত আছে কি না তাহা আমি জানি না। এই সকল আলেখ্য (?) দর্শনে সমসাময়িক ইতিহাস অনেকটা পাওয়া যাইতে পারে। একজন ব্রাহ্মণ সখ্ করিয়া আমাদের সেথো হইতে আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম এটা কি? অর্থাৎ নরসিংহ মূর্ত্তির ন্যায় একটা মূর্ত্তি আর একটা মূর্ত্তিকে কায়দা করিয়া ধরিয়াছে। ব্রাহ্মণ যা বলিলেন তাহা বুঝা দায়। অনেকক্ষণ পরে বুঝিলাম যে তিনি বলিতেছেন ওটা একটা 'জেন্ট্'। জেন্ট কি? অনেক টীকা টিপ্পনীর পর বুঝিলাম, জেন্ট্ হইতেছেন ইংরেজী Giant শব্দ। ব্রাহ্মণের বিদ্যার দৌড় দেখিয়া আমরা তাঁহাকে বিদায় দিলাম।

বেলা অবসান প্রায়। রাস্তায় আর খানিকটা ঘুরিয়া ষ্টেসনে আসিলাম, দেখিলাম ওয়েটিংরুম খাঁ খাঁ করিতেছে, কেহই নাই সকলে চলিয়া গিয়াছে। আমাদিগকে একজন সাহেব বারকত উঁকি মারিয়া দেখিয়া একটা চাপরাসি পাঠাইয়া ঘর ছাড়িয়া দিয়া অন্য কোথাও যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমরা বলিলাম বিদেশী কোথায় যাইব? রাত্রির গাড়ীতে যাইব—এখানে



ত আর বাস করিতে আসি নাই। অতটা সহজ নয়। সাহেব নিজে আসিলেন—তাঁহাকেও ঐ কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন আইন মত কাজ হইবে—এখনই উঠিয়া যাইতে হইবে। আমরা অস্বীকার করিলাম, তখন সাহেব পুঙ্গব রাগে গর্ গর্ করিয়া ষ্টেশন মাষ্টারকে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁরও সেই এক কথা, উঠিয়া যাও। আমরা বলিলাম, সে কি? দ্বিতীয় শ্রেণীর পাসেঞ্জার কলিকাতা হইতে কংগ্রেস উপলক্ষে আসিয়াছিলাম যাইতেছি রামেশ্বর হইয়া ত্রিবাঙ্কুড়, তাঁহাদের রেল পথই আমাদের সম্বল, বিদেশী কোথা যাইব? তিনি বলিলেন, উপরে sleeping apartment আছে ভাড়া পাওয়া যায়। আমি হাসিয়া বলিলাম, সে কি, sleeping apartment এ জাগিয়া থাকিব কি করিয়া? গাড়ী যে চলিয়া যাইবে? সাহেব রসিকতায় তুষ্ট হইলেন, আমরাও একটু পরিচয় দিলাম, বিবাদ মিটিয়া গেল। বালাই গেল।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

# কাব্যে ইতিহাস।

[ ৫ ]

বাণিজ্য :—

সিংহলের সহিত রীতিমত বাণিজ্য চলিত। তৎকালে সিংহল অতিশয় ধনশালী বলিয়া বাঙ্গালীর বিশ্বাস ছিল। রামেশ্বর বলিতেছেন :—

লঙ্কার বাণিজ্য যদি এনে দেয় ঘরে।
মেয়ে হ'লে উলুই উড়ায় আঁখি ঠারে॥ ৬৮ শিবায়ন।

এতদ্ভিন্ন কবিকঙ্কণে অতি স্পষ্টরূপে সিংহল বাণিজ্যের কথা বর্ণিত আছে। বড় বড় ডিঙ্গায় করিয়া সমুদ্র পারে যাতায়াত করা হইত, এবং সেই সকল নৌকার মাঝী সবই পূর্ব্ব বঙ্গের লোক ছিল। এরূপ বাণিজ্যে অতিশয় লাভ হইত। কবিকঙ্কণে 'বদল ধন' দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

সেইরূপ নৌকায় বাঙ্গালা হইতে তিন মাসে সিংহলে যাওয়া যাইত।—

কবিকঙ্কণে ধনপতির সিংহল যাত্রার পথের বিবরণে দুইটী জিনিষ নিরীক্ষণ-যোগ্য।—

প্রথম ঃ—'হারামদের দেশ;'

দ্বিতীয় ঃ—'সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী।

ধনপতি শ্রীক্ষেত্র পার হইয়া

ফিরাঙ্গীর দেশ খাল বাহে কর্ণধারে।

রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারামদের ডরে॥ ১৯৯ ক ক চ,

এই ফিরাঙ্গী বোধ হয় পর্ত্তুগীজদের বলা হইতেছে, তাহারা জলদস্যুর ন্যায় কাজ করিত। নৌকা লুণ্ঠন করিয়া আরোহীদিগকে মারিয়া ফেলিত। আবার ধর্ম্মমঙ্গলেও উক্তরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়ঃ—

রাখিলা হুদ্বর পোতা ফিরিঙ্গী মুলুক।—৭২৩

দ্বিতীয়ত ঃ—সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী।

কলিঙ্গ কর্ণাট, অঙ্গ বঙ্গ, ত্রৈলঙ্গ প্রভৃতি নানা সহরের বণিকগণ তরণী সাজাইয়া ভিন্ন দেশে বাণিজ্য করিতে যাইত; কিন্তু—

সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না যায়।

ঘরে বসি থাকে সুখে নানা ধন পায়॥

তীর্থ মধ্যে পুণ্যতীর্থ ক্ষিতি অনুপাম,

সপ্ত ঋষির শাসনে বোলয়ে সপ্তগ্রাম। ২২৯ ক ক চ,

বিদেশ হইতে আনীত দ্রব্য ঃ—

বিদেশ হইতে আনীত জিনিস পত্রের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই;—শাল, অঙ্গরাখি, ভুটিয়া চামর, ভুটিয়া কম্বল, চন্দন, শঙ্খ, সগল্লাদ, গজঘোট, করভ পট্টিশ, ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি। ক ক চ, ৮৭

এতদ্ভিন্ন ভারতচন্দ্রের সময় বিলাতী জিনিষ কাটতি হইয়াছে ঃ—

বিলাতী খেলাত পরে জরকশী (জরি) বীরা (শিরস্ত্রাণ)

মানিক কলগী তোরা চকমকে হীরা॥ ৭৬ অ, ম,

বিবাহের বয়স ঃ—

অতি অল্প বয়সেই বিবাহ হইত। এখনকার দিনে কন্যার বিবাহ হইতে বিলম্ব হইলে যেমন পাড়া প্রতিবেশীরা নিন্দা করে ও গঞ্জনা দেয়, তখন



পুত্র অবিবাহিত অবস্থায় বেশী দিন থাকিল লোকে নিন্দা করিত ঃ—

আইবড় এত বড় বেটা হৈল ঘরে।

কেমন করিয়া দেখে পেটে ভাত জরে॥ ১৭ শিবায়ণ।

কবিকঙ্কণে ভাঁড়ুদত্তের ভ্রাতার পঁচিশ বৎসর বয়স হইয়াছে বলিয়া বলা হইতেছে তাহার আর বিবাহ হইবে না। শ্রীমন্ত দ্বাদশ বৎসর বয়সে নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া দুই রাজকন্যা বিবাহ করিল। ধনপতির প্রথম বিবাহও অল্প বয়সে। কালকেতুরও বার তের বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল।

বালিকাদের বিবাহের বয়স আরও কম ছিল। দেখিতে পাওয়া যায় খুল্লনা বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত আছে বলিয়া দলাই ওঝা লক্ষপতিকে তিরস্কার করিতেছে।

বহু বিবাহ।—

প্রায় সকল লোকেরই একাধিক বিবাহ ছিল। কবিকঙ্কণে ধনপতি, বিক্রমকেশরী, ঘনরামে লাউসেন, ভারতচন্দ্রে হরিহোড় ও ভবানন্দ প্রভৃতির একাধিক বনিতা। এতদ্ভিন্ন কুলীনের ত বহুবিবাহ ছিলই। কুলীনের মেয়েরা বড়ই কষ্টে দিন কাটাইত। কেহ 'পৈতা তুলিয়া' জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন, আর ন'মাসে ছ'মাসে স্বামী একদিন আসিয়া সে পয়সাগুলি লইয়া পলায়ন করিতেন।

এরূপ বহুবিবাহের ফলও যে কিরূপ বিষময় হইত তাহাও কবিগণ দেখাইতে ভুলেন নাই।

স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া জানিত। খুল্লনার বার তের বৎসর বয়স; সে লহনার জাল পত্র পড়িল, এমন কি এত অভিজ্ঞ ছিল, যে তাহা স্বামীর লেখা নয় বলিয়া উড়াইয়া দিল। আবার সেই পত্র লীলা ঠাকুরাণীই লিখিলেন।

আবার ধর্ম্মমঙ্গলে, লাউসেন পত্নী কলিঙ্গা ও কালড়া উভয়েই স্বামীর পত্র পড়িয়া উত্তর লিখিতেছেন।

চরকা প্রচলিত ছিল। সংসারে বৃদ্ধা রমণীরা চরকায় সুতা কাটিতেন। আর তাহাতে তাঁহাদের হাতে বেশ দু' পয়সা থাকিত।

আমোদ প্রমোদ ঃ—

পাশা খেলা ও জুয়া খেলা অধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল। এমন কি

বালক বালিকা, যুবক যুবতী সকলেই পাশা খেলায় ভোর হইয়া থাকিত। কবিকঙ্কনে খুল্লনা ও ধনপতি, বিক্রমকেশরী ও গৌড়পতির বিষয় দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

এমন কি মন্ত্রীর উপর রাজ্যের ভার দিয়া নৃপতিগণ দিবারাত্রি পাশা খেলিতেন।

আর এক প্রকার খেলা,—পায়রা লইয়া, এমন কি এই খেলা সম্রাট আকবর পর্য্যন্ত খেলিতেন।

বালকদের খেলা;—টিকগুলি, কাঁনামাছি, বাঘচাল, পাশা, সাঁতার, কৃত্রিম যুদ্ধ ও ঝালিখেলা এবং গুলতাই বাঁটুল।

নেশা ঃ—

মদ ত ছিলই; তদুপরি সিদ্ধি গাঁজাও চলিত। ভারতচন্দ্র মহাদেবের মুখে প্রচার করিয়াছেন,—"দুধ কুসুম্ভায় আজি হয়েছে বাসনা।—" এই কুসুম্ভা জিনিষটা কি এখন বাঙ্গালী জানে না। 'এখনও রাজপুতনা এবং তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে এ কুসুম্ভা ভক্ষণ একটী আমোদজনক ব্যাপার, উহা অহিফেনের দ্বারা প্রস্তুত হয়, এবং কুসুম্ভা ভক্ষণের নিমন্ত্রণ একটি উৎসব বলিয়া গণ্য হয়।' *

ধর্ম্মমঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায় ঃ—

ভাজা ভুজা গাঁজা পোস্ত ঘোঁটা সিদ্ধি সুরা।
সেজে লও সরস কলসী পাঁচ পূরা॥—৫৯০

এবং ইহার —

মুয়া মুড়ি মুড়কী মধুর মত্তমান।
পরিপাটী পাঁচ ভুজা করে জল পান॥—৫৯১

তখন পশ্চিম বাঙ্গালায় গন্ধবণিক জাতির বসবাস অধিক পরিমাণে ছিল। 'চৈতন্য ভাগবত' 'মনসার ভাসান' 'কবিকঙ্কণের চণ্ডী' প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে গন্ধবণিক জাতি সমাজের মধ্যে ধনী, মানী ও বাণিজ্যপ্রবণ ছিল। মেদিনীপুর হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত সমগ্র পশ্চিম বাঙ্গালা ইহাদের বাসভূমি ছিল।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, তখনকার সমাজ, এখনকার সমাজ অপেক্ষা

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—২২৪



অধিক পরিমাণে উন্নত ছিল। তখন সমাজে প্রাণ ছিল, আহার ছিল, আরাম ছিল, বল ছিল, বীর্য্য ছিল। সুখী ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালী তখন আপনার অন্তঃপুরের দিকে তাকাইলেই অসংখ্য সীতা, সাবিত্রী, অন্নপূর্ণার পবিত্র শান্তিময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাইত। এখন যুঝি তেমন আর নাই। আবার বাঙ্গালী যদি আপনার অন্তঃপুরের ভিতর আবার তেমনি প্রেমময়ী, শান্তিময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, তবেই আবার প্রাণ পাইবে, শান্তি পাইবে। সে মূর্ত্তির মহিমাময়ী মূর্ত্তির জ্যোতিপাতে সকলই আবার সুখের হইবে। সে সাধ্বী সাবিত্রীর অঙ্গপ্রভায় সকল অমঙ্গল বিদূরিত হইবে। আবার বাঙ্গালীর সংসার লক্ষ্মীর সংসার হইয়া উঠিবে।

শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

# দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

পূর্ব্বে "ভারতে সাধারণের শিক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধে পুরাণ শাস্ত্রের কোন কোন উপাখ্যানের বিশেষ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম। তদনুসারে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ প্রহ্লাদ চরিত্র আলোচনা করিয়া তাহা হইতে ইহজীবনের উপযোগী একটী উপদেশ উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিতেছি।

যদি কোন বংশের অধিকাংশ লোক দুষ্ট, দুরন্ত, অত্যাচারী, নিষ্ঠুর ও পাপাচারী হয়, এবং সেই কুলে দৈবাৎ একটী শিষ্ট, শান্ত, সরল, দয়াবান ও ধার্ম্মিক লোক জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে লোকে বলে ঐ ব্যক্তি "দৈত্য কুলে প্রহ্লাদ"। অসুরগণ দেবদ্বেষী, ধর্ম্মবিরোধী, ও খল প্রকৃতি, তাহাদিগের মধ্যে প্রহ্লাদের মত মহানুভব ভগবদ্ভক্ত জন্ম গ্রহণ করিলে সকলেরই আশ্চর্য্যান্বিত হইবার বিষয়। সেই প্রকার নরলোকে অসুর প্রকৃতির লোকের ঔরসে একজন দেব প্রকৃতির মনুষ্য জন্মিলে লোকের মনে চমৎকার সহকৃত আনন্দের উদয় হইয়া থাকে।

বিশ্ব বিধাতার সৃষ্টিতে বৃক্ষ পত্রের পতনের ন্যায় ক্ষুদ্রতম ঘটনা হইতে ভূমিকম্প ও প্রবল বাত্যা প্রভৃতি বিস্ময়কর মহত্তম ঘটনা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রহ্লাদের জন্মের মত ঘটনা কদাচিৎ দৈবাৎ হয়, বলিয়া উহাতে কি কোন প্রকার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান নাই? উহা কি বৃষবৃক্ষে অমৃত ফলের উৎপত্তির ন্যায় অলৌকিক ব্যাপার মনে করিয়া কারণানুসন্ধানের চেষ্টা সম্পূর্ণ নিস্ফল বিবেচনা করিতে হইবে? এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ চরিত্র আলোচনা করিয়া কি শিক্ষা পাওয়া যায় তাহা দেখা যাউক।

মহাভাগবত প্রহ্লাদ অসুর বালকদিগকে অমৃতোপম তত্ত্বজ্ঞান ও হরি-ভক্তির উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছিলেন যে "এই সকল কথা আমি তোমাদিগকে নূতন বলিতেছি এমন মনে করিও না, ইহা ভগবান নরসখা নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি। তখন অসুর বালকগণ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমরা সকলেই বালক, অন্তঃপুরেই থাকি। এই দুই গুরুপুত্র ব্যতীত অন্য শিক্ষককে জানি না। তুমি নারদের নিকট কিরূপে ও কোন সময়ে এই সমস্ত উপদেশ লাভ করিয়াছিলে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি এ বিষয়ে আমাদিগের সংশয় দূর কর। অসুর বালকদিগের প্রশ্নের উত্তরে প্রহ্লাদ বলিলেন হে বয়স্যগণ! আমার পিতা অসুররাজ হিরণ্যকশিপু তপস্যার্থ মন্দরাচলে গমন করিলে এবং পিপীলিকায় তাঁহার শরীর ভক্ষণ করায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন 'আঃ পিপীলিকা দ্বারা যেমন মহাসর্প ভক্ষিত হয় সেইরূপ সকল লোকের সন্তাপকারী পাপাচারী, এই হিরণ্যকশিপু স্বকৃত পাপেই বিনাশিত হইল'। দেবগণ অতঃপর উৎসাহ সহকারে দানবদিগের দমনার্থে যুদ্ধোদ্যম করিয়াছিলেন। তৎকালে অসুরদিগের যে সকল দলাধিপতি ছিল, তাহারা দেবতাদিগের প্রবল পরাক্রমে ভীত হইয়া পলায়ন পরায়ণ হয়। তাহারা সকলে স্ব স্ব প্রাণ রক্ষার্থ এ প্রকার ব্যস্ত হইয়াছিল যে পুত্র, কলত্র, সুহৃদ, সম্পদ, গৃহ ও গৃহোপকরণাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবারও অবসর পায় নাই। এদিকে জয়াকাঙ্ক্ষী অমর-



গণ সর্ব্বস্বাপহরণ পূর্ব্বক অবাধে দানবরাজের আবাস বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন, আর ইন্দ্র আমার জননী দৈত্যরাজ-মহিষীকে গ্রহণ করিয়া চলিলেন। দেবরাজ যখন ভয়াতুর মৃগীর ন্যায় রোরুদ্যমানা আমার মাতাকে লইয়া যান, তখন দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে পথিমধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহা দেখিতে পাইলেন এবং ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে মহাভাগ! দেবরাজ! এই অবলার কোন অপরাধ নাই। ইনি পর পত্নী ও পরম সাধ্বী, ইঁহাকে লইয়া যাওয়া উচিত নহে, অবিলম্বে পরিত্যাগ কর। নারদবাক্য শুনিয়া ইন্দ্র বলিলেন ইহার কুক্ষিতে দেবশত্রু দৈত্যরাজের দুঃসহ বীর্য্য আছে। অতএব যাবৎ প্রসব না হয়, তাবৎ আমার আবাসে অবস্থিতি করুক এবং পুত্র জন্মিলে তাহাকে বধ করিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিব। নারদ বলিলেন ইহার গর্ভস্থ পুত্র নিষ্পাপ, মহাভাগবত, স্বীয় গুণে অতি মহান এবং অনন্তের অনুচর সুতরাং বিশিষ্ট বলশালী; তুমি ইহার মৃত্যুর হেতু হইতে পারিবে না। দেবরাজ নারদের বাক্য মান্য করিয়া আমার জননীকে ছাড়িয়া দিলেন এবং অনন্তের প্রিয় ভক্ত আমি তাঁহার জঠরে বিদ্যমান আছি বলিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর দেবর্ষি আমার মাতাকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া গিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন বৎসে! যে পর্য্যন্ত তোমার ভর্ত্তার আগমন না হয় সে পর্য্যন্ত এই আশ্রমে অবস্থিতি কর। আমার মাতা নারদের বাক্যে নিরুদ্বিগ্না হইয়া 'হে ভগবন্ তাহাই করিব' বলিয়া তাঁহার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিলেন। তদনন্তর গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গল এবং স্বামীর আগমনানন্তর প্রসব কামনায় সাধ্বী জননী পরম ভক্তি সহকারে দেবর্ষির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। অশেষ শক্তিসম্পন্ন পরম-কারুণিক ঋষি আমার মাতার অভিলষিত সন্তানের মঙ্গল ও ইচ্ছা-প্রসবরূপ দুইটী বরই প্রদান করিলেন। পরে আমাকে উদ্দেশ করিয়া ভক্তি-যোগরূপ পবিত্র ধর্ম্মতত্ত্ব ও আত্মানাত্মবিবেকরূপ নির্ম্মল জ্ঞানের উপদেশ দিলেন। আমার মাতা স্ত্রীজাতি এবং বহুকাল অতীত হইল এজন্য তাঁহার উপদেশস্মৃতি তিরোহিত হইয়াছে, কিন্তু আমার প্রতি ঋষির সবিশেষ অনুগ্রহ থাকায় সেই স্মৃতি আমার অব্যাহত রহিয়াছে"।

জগদ্‌গুরু নারদের অলৌকিক শক্তি প্রভাবে গর্ভস্থ সন্তানও হরিভক্তি ও

তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ ধারণ ও স্মরণ করিতে পারে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব। প্রকৃত উপদেষ্টার পক্ষে সে প্রকার সম্ভব না হইলেও সন্তান কুক্ষিস্থ থাকার সময় তাহার জননী ধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ এবং তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলে ভাবী সন্তানের মনে ধর্ম্মভাবের বীজ সংক্রামিত হইতে পারে ও পরে সন্তানের জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তদ্বিষয়ক শিক্ষা ও আচরণ করাইলে ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া সম্ভবপর। মাতার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অনুসারে সন্তান সুবোধ বা নির্ব্বোধ, সাধু বা অসাধু হয় ইহা অনেকে বিশ্বাস করেন। গ্রীক দার্শনিক আরিস্তুতল এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। জননীর অন্তঃসত্ত্বাবস্থার ভাব্য ভাবনা অনুসারে পুত্র কন্যার মানসিক অবস্থা হইয়া থাকে ইহা অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত।

প্রস্তাবিত বিষয়ে দুই একটী পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতের সবিস্তার উল্লেখ করিব ; তাহার কারণ অধুনাতন অনেক সুশিক্ষিত লোকতাঁহাদিগের কথায় সবিশেষ আস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছি। যখন থিয়োসোফিষ্টদিগের প্রথম নেতা কর্ণেল অল্‌কট হিন্দু-ধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়া বক্তৃতাদি করিতে লাগিলেন তখন যে সকল হিন্দু সন্তান হিন্দুধর্ম্মের সারবত্তা ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেন না তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিলেন। অনেকে সেই সম্প্রদায়ের সভ্য শ্রেণী-ভুক্ত হইলেন, অনেকে তাহাতে প্রবিষ্ট না হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি সহানু-ভূতি দেখাইতে লাগিলেন। অনেকে তাঁহাদিগের বক্তৃতাদি শ্রবণের পর হইতে হিন্দু সদাচারের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ পিতা মাতার কথায় যে কাজ হয় নাই, পরম মান্য দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের কথায় যে কাজ হয় নাই তাহা উক্ত সাহেব মহাশয়ের ও তাঁহার সহযোগীদিগের কথায় হইল। এরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শনে দোষারোপ করিতে পারি না। যে সকল দেশের অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নিতান্ত জড়-বাদী ও চিন্ময় আত্মা বা পরমেশ্বরের সত্তায় কিছু মাত্র বিশ্বাস করেন না আবার যাঁহাদিগের দেশের পাদ্রিগণ পথে পথে আড়ম্বর সহকারে হিন্দু-ধর্ম্মের অসারতা ও নিকৃষ্টতা বর্ণন করিয়া থাকেন, সেই জাতীয় একজন বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও সুপণ্ডিত লোক হিন্দুধর্ম্মের সবিশেষ গুণ বর্ণন করিলে এবং



হিন্দু আচার ও অনুষ্ঠানের প্রশংসা করিলে স্ব ধর্ম্মে অবিশ্বাসী হিন্দু সন্তানের স্বভাবতঃ সে বিষয় আগ্রহের সহিত ভাবিতে চিন্তিতে ও অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়। থিয়োসফিষ্ট সম্প্রদায় এ দেশে প্রতিষ্ঠীত হইবার পূর্ব্বে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বহু হিন্দু সন্তানের মনে বিনষ্টপ্রায় স্বধর্ম্মানুরাগ কালধর্ম্মে পুনরুজ্জীবিত হইতেছিল, উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা দ্বারা সেই অনুরাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কথায় কথায় আলোচ্য বিষয় হইতে কিছু সরিয়া পড়িয়াছি। অতএব এখন প্রস্তুত বিষয়ে অধুনাতন কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত লিখিতেছি।

মার্কিন দেশীয় ডাক্তার জন কাউয়ান এম ডি নব জীবন বিজ্ঞান ( The science of a new life by John Cowan M. D. ) নামক একখানি সুবিস্তৃত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্ত্রী ও পুরুষের শরীর বিধান বিবাহের যোগ্য কাল, পতি পত্নী নির্ব্বাচন প্রণালী, স্ত্রী পুরুষের পরস্পর কর্ত্তব্য, ইন্দ্রিয় সংযম অভ্যাস করার উপায় এবং প্রতিভাশালী সুসন্তান লাভের উপায় ইত্যাদি নানা বিষয় যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলেন যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে স্ব স্ব ইচ্ছাশক্তি বশীভূত ও একাভিমুখী করিয়া গ্রন্থ লিখিত উপদেশ অনুসারে কায়মনোবাক্যে দৃঢ়তর যত্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে ইচ্ছানুরূপ সু সন্তান লাভ করিবেন। যে বিদ্যা, ব্যবসায়, বা শিল্পা-দিতে তাঁহাদিগের ভাবী সন্তানের পারদর্শিতা ও অসাধারণ দক্ষতা লাভ করার কামনা করেন, মাতৃকুক্ষিতে জীব সঞ্চার হইবার সম্ভাব্যমান কালের একমাস পূর্ব্ব হইতে দম্পতী সেই বিদ্যা, ব্যবসায় বা শিল্পাদির আলোচনা করিতে আরম্ভ করিবেন। উভয়ে তদ্বিষয়ক পুস্তক পাঠ, তদ্বিষয়ে কথোপকথন এবং তদুপযোগী কার্য্য করিবেন। সেই বিষয়ে তাঁহাদিগের বিশেষজ্ঞ হওয়ার আবশ্যকতা নাই। কেবল সেই বিষয় নিয়ত চিন্তা ও তজ্জন্য দৃঢ়তর চেষ্টা করিলেই যথেষ্ট হইবে।

মনে করুন যদি দম্পতী ইচ্ছা করেন যে তাঁহাদিগের সন্তান একজন সুকবি হয়, তাহা হইলে তাঁহারা উক্ত এক মাস পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থ পাঠ করিবেন, কবিতা রস মাধুর্য্যের আস্বাদে পটু সমালোচকদিগের রচনার অনু-শীলন করিবেন। আপনারা উভয়ে যথাজ্ঞান সমালোচনা করিবেন।

কল্পনা শক্তির উদ্দীপন হয় এমন স্থানে ভ্রমণ বা তাদৃশ বস্তু দর্শন ও চিন্তা করিবেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহারা নিজেও কোন বিষয়ে কবিতা রচনা করিবার চেষ্টা করিবেন। ভাল হউক মন্দ হউক তাহা না ভাবিয়া কবিতা রচনা করিবেন। চেষ্টা করাই কেবল আবশ্যক। এই সময়ে স্বামীর চি ও কার্য্যই সমধিক ফলোপধায়ক হয়। জায়ার জঠরে নব জীব সঞ্চার স্বামীর বিশেষ আর কিছু কর্ত্তব্য নাই। তৎপর নয় মাস কাল কেবল স্ত্রী পূর্ব্ববৎ আলোচনা, চিন্তা ও চর্চ্চা করিতে থাকিবেন, স্বামী আলাপাদি দ্বারা তদ্বিষয়ে সহায়তা করিবেন। অপত্য ভূমিষ্ঠ হইলে যত দিন স্তন্যপান করিবে ততদিন প্রসূতি প্রতিবার স্তন্য পান করাইবার সময় পূর্ব্ববৎ স্থির চিত্তে নির্দ্দিষ্ট বিষয় একটু অনুশীলন করিয়া পরে স্তন্য দান করিবেন অনন্তর শিশুর জ্ঞানোন্মেষ হইলে রীতিমত শিক্ষাদানের সময় অভী বিষয়ে সবিশেষ মনোনিবেশ করাইতে হইবে।

এইরূপে গণিত, বিজ্ঞান, কিংবা কোন কারুকার্য্যাদিতে প্রতিভাশালী সন্তান আকাঙ্ক্ষা করিলে দম্পতীকে পূর্ব্ববৎ তত্তদ্বিষয়ের অধ্যয়ন, অনুশীলন, পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

ডাক্তার কাউয়ান নিজ গ্রন্থে যে প্রকার উপদেশ দিয়াছেন, তাহা ক ণত করা অতি কঠিন। উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে দ্বেষ, ঈর্ষা, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির নিরোধ করিয়া একাগ্রমনে বাঞ্ছিত ফল লাভের জন্য প্রয়াস করিতে হইবে।

প্রহ্লাদ জননী কয়াধুর সৌভাগ্যক্রমে যে প্রকার সুযোগ হইয়াছিল, সেরূপ অন্য কাহারও ভাগ্যে হইবার সম্ভাবনা নাই। ভক্তিমার্গের অদ্বিতীয় গুরু দেবর্ষি নারদের আশ্রমে মূর্ত্তিমতী হরিভক্তি বিরাজমান, সেইখানে নিয়ত বাস, তাঁহার শ্রীমুখে ধর্ম্ম তত্ত্ব ও ভক্তিযোগের উপদেশ শ্রবণ এবং তদনুরূপ মনন ও অনুষ্ঠানের সুযোগ দুর্লভ, পরম দুর্লভ।

জননীর ভাবনা অনুসারে সন্তানের বাহ্য আকৃতি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে একখানি ইংরাজী পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে কোন ইউরোপীয় ভদ্রলোকের গৃহে একটী নরম সুন্দরী বালিকার ছবি থাকিত, তাঁহারা ঐপ্রকার একটী কন্যা জন্মে সর্ব্বদা এই প্রকার ইচ্ছা করিতেন, ঐ ইউরোপীয় মহিলা গর্ভবতী



হইয়া সেই ছবিটী দেখিতেন এবং সর্ব্বদাই ভাবিতেন উহার তুল্য একটী কন্যা জন্মিলে সুখী হন। কালক্রমে তাঁহাদিগের একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল, সেই কন্যার বর্ণ ও আকৃতি উক্ত ছবির এত সুসদৃশ হইয়াছিল যে নবাগত ব্যক্তি ছবিখানি দেখিয়া উহা তাঁহাদিগের কন্যার প্রতিকৃতি এইরূপ মনে করিতেন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন তাঁহাদের তনয়াই ঐ ছবির প্রতিকৃতি। ডারুইন একটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাতে কেবল পুরুষের অনুক্ষণ দৃঢ় চিন্তার ফলে তাঁহার পত্নী সেই চিন্তিত ব্যক্তির সদৃশ একটী সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। বাহ্য আকৃতি সম্বন্ধে যেরূপ উল্লিখিত হইল, ইহা সত্য কি না, তাহা অনেক দম্পতী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন, কারণ ইহা অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুকর।

প্রবন্ধোল্লিখিত বিষয়ে একটী গুরুতর আপত্তি আছে, তাহার মীমাংসা করা একান্ত আবশ্যক। হিন্দু শাস্ত্রের এইটী স্থির সিদ্ধান্ত যে জীবগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের শুভাশুভ কর্ম্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই সিদ্ধান্তে হিন্দু মাত্রের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ রোগ, শোক, দুঃখ, দরিদ্রতায় পড়িলে বলিয়া থাকে "আমি যেমন কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছি তাহারই ফল ভোগ করিতেছি"। অজ্ঞ বিজ্ঞ সকলেই এইরূপ বলিয়া থাকে। এই বিশ্বাসের বলে দুঃখে তাদৃশ কাতর হয় না এবং অনায়াসে মনকে প্রবোধ দিতে পারে। ফলতঃ জন্মান্তর স্বীকার না করিলে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধার্ম্মিক, কেহ অধার্ম্মিক, কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ সুস্থ, কেহ রুগ্ন লোকদিগের এই প্রকার অবস্থা বৈচিত্রের কোন সমুচিত কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। বাস্তবিক প্রাক্তন সংস্কার অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম জন্য বাসনাই এ সমস্তের মূল কারণ। আবার পিতা মাতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা অনুসারে পুত্র কন্যার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা হইয়া থাকে, তাহাও দেখিতেছি। ইহার সামঞ্জস্য এইরূপে রক্ষিত হইতে পারে, যে প্রাক্তন সংস্কার মূল কারণ এবং জনক জননীর শরীর ও মনের অবস্থা সহকারী কারণ। কর্ম্ম করিতে আমাদিগের অধিকার আছে, তদনুযায়ী ফল প্রাপ্তিতে আমাদিগের কোনই অধিকার নাই। ভগবান্‌ই কেবল কর্ম্মফল দাতা। তিনি কৃপা করিয়া এমন

অবস্থায় জীবদিগকে স্থাপিত করেন, যে তাহাদিগের প্রাক্তন সংস্কাররূপ বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত পল্লবিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইতে পারে।

দেবর্ষি নারদ লীলারসময় ভগবানের লীলাপুষ্টির সহায়তা অনেক সময় করিয়াছেন। প্রভুর কার্য্যে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারিলেই প্রিয়তম ভৃত্যের পরমানন্দ লাভ হয়। ত্রিকালজ্ঞ ঋষি স্বীয় অপ্রতিহত জ্ঞান প্রভাবে জানিয়াছিলেন যে শ্রীভগবান্ ভক্তি ও ভক্তের মহিমা বিস্তার করিবার নিমিত্ত এবং আদি দৈত্য হিরণ্যকশিপুর বিনাশ দ্বারা জগতের ও তাহার মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত প্রাক্তন ভক্তি সংস্কার সম্পন্ন একটী প্রিয় ভক্তকে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই কারণে তিনি প্রহ্লাদ জননীকে দেবরাজের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া নিজ আশ্রমে লইয়া গিয়া ভাগবৎ ধর্ম্ম ও ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদেশরূপ জল সেচনে প্রহ্লাদের অন্তর্নিহিত সংস্কার বীজ অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত ও অবশেষে প্রকাণ্ড মহাবৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছিল। প্রহ্লাদ পিতা হইতেও অতি বলবতী ইচ্ছাশক্তি ও অকুতোভয়তা এই গুণ দুইটী পাইয়াছিলেন, কিন্তু পিতা সেই দুই গুণ অসাধু কার্য্যে প্রয়োগ করিতেন এবং পুত্র তাহা সাধু কার্য্যে প্রয়োগ করিতেন।

লোকে ধন সম্পত্তি লাভ করিবার নিমিত্ত কত চিন্তা, যত্ন, পরিশ্রম ও কৌশল করিয়া থাকে। বহুকাল পূর্ব্ব হইতে তাহার জন্য আয়োজন ও উদ্যোগ করে। কিন্তু কয়জন গুণবান্, বুদ্ধিমান্ ও ধার্ম্মিক সন্তান লাভের আশায় সেরূপ প্রযত্ন করে? সহস্রের মধ্যে একজন সে বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করে, অবশিষ্ট নয় শত নিরনব্বই জন সে বিষয়ে মনে কখনই কিছু ভাবে না। তাহারা ঘটনাক্রমে সুবোধ বা নির্ব্বোধ, সৎ বা অসৎ পুত্র প্রাপ্ত হয়। মানব! তুমি সামান্য বিত্ত প্রত্যাশায় কত কষ্ট স্বীকার করিতেছ, উৎকৃষ্ট প্রাক্তন সংস্কার সম্পন্ন প্রতিভাশালী সন্তান লাভের জন্য অনুরূপ তপস্যা না করিলে পাইবে কেন, যদি হরিভক্ত অপত্য লাভ করিতে বাঞ্ছা কর, তোমরা পতি পত্নী এক সময়ে কায়মনোবাক্যে ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান কর। যদি যোগী পুত্র চাও তবে তোমরা দৃঢ়তা সহকারে যোগাভ্যাস কর। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, যোগসিদ্ধি লাভ করিবার পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির কিরূপ গতি হইবে? তদুত্তরে শ্রীভগবান্



বলিলেন, "শুচিনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে। অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাং। তত্র তং বুদ্ধি সংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং" যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি দেহান্ত হইলে শুচি শ্রীমানের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন, অথবা ধীমান্ যোগীদিগের কুলে জন্মিয়া পূর্ব্ব দেহের বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার যোগাভ্যাস করিয়া সম্যকরূপে সিদ্ধ হয়েন।

এখন পাঠকগণ আমার নিকট একটী কৈফিয়াৎ চাহিতে পারেন, যে দাস্যভাবের ভক্তগণের চূড়ামণি মহাত্মা প্রহ্লাদের নাম প্রবন্ধের শিরোভাগে লিখিত হইল, কিন্তু তিনি অসুর বালকদিগকে যে সুমধুর ভক্তিযোগ ও সুবিমল ধর্ম্ম তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন এবং শ্রীভগবানের নিকট যে অমূল্য অতুল্য স্তব করিয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ করা হইল না, কেবল একটী ঐহিক বিষয়ের আলোচনা করা হইল মাত্র। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে প্রহ্লাদকৃত উপদেশ ও স্তব বিষয়ে আমার কথঞ্চিৎ সামান্যাকারে জ্ঞান থাকিতে পারে, তাহা বলা কেবল তোতাপাখীর মত অভ্যস্ত বুলি বলা হইবে। তৎ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ অনুভূতি হয় নাই। ভগবৎ কৃপা ব্যতীত সে অনুভূতি হইতেও পারে না। তাঁহার অকপট আরাধনা ভিন্ন কৃপা কিরূপে হইবে? আমার পক্ষে ভগবদারাধনা দুর্ঘট হইয়াছে। যে হৃদয়াসনে তাঁহাকে বসাইয়া পূজা ও আরধনা করিব তাহা বিষয়াসক্তিরূপ মহারাক্ষসী সর্ব্বতোভাবে অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

# ভাব ও ভাষা।

হৃদয় মাত্রেই ভাব আছে, কিন্তু ভাব প্রকাশের ভাষা সকলের নাই, ইহার কারণ কি? প্রথমতঃ দেখা যাউক, ভাব ও ভাষা জিনিষটা কি! কোন দৃশ্য দেখিয়া, কোন সঙ্গীত শুনিয়া, কোন কুসুমাঘ্রাণ করিয়া, কোন দ্রব্য আস্বাদ করিয়া, কিম্বা কোন কিছু স্পর্শ করিয়া আমরা হৃদয়মধ্যে যে স্পন্দন অনুভব করি—তাহাই ভাব। সংক্ষেপে, পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া আমাদের প্রাণে যে জ্ঞান সঞ্চিত হয়, তাহাই ভাব। আর, উক্ত ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান প্রকাশের শক্তির নাম ভাষা। স্থূল দৃষ্টিতে এইটুকু মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ভাব ও ভাষার এইরূপ সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেই চলিবে না। উক্ত পঞ্চদ্বার দিয়া প্রত্যেক বস্তুর—প্রত্যেক দৃশ্যের প্রত্যেক ঘটনার একটা ছায়া আমাদের হৃদয়কে আঘাত করে বটে, কিন্তু সকল সময়ে আমাদের প্রাণে লাগিয়া থাকিতে পারে না। যখন মানবপ্রাণে এমন একটা শক্তি জন্মে, যাহা উক্ত ছায়াগুলিকে আপনার সহিত গাঁথিয়া লইতে পারে—তখনই আমরা ভাবগ্রাহী বা ভাবুক হইতে পারি। সে শক্তি কি, এখন তাহারই অনুসন্ধান করা যাউক:—

অনুসন্ধানের জন্য অধিক দূর যাইতে হইবে না, যে হেতু সে শক্তি 'প্রেম' ব্যতীত আর অন্য কিছুই নহে; কিরূপে?—তাহাই বুঝাইতেছি:—

পূর্ণব্রহ্মের অংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া পৃথিবীর আর একটী নাম 'ব্রহ্মাণ্ড'; সেই ব্রহ্মই আবার প্রেমের পূর্ণ স্বরূপ; সুতরাং প্রেম হইতে জগত সৃষ্ট হওয়ায়, জগতের প্রতি পরমাণুতে প্রেম জড়িত ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। আরও, আমরা চাক্ষুষ দেখিতে পাই যে জগতের প্রত্যেক প্রাণীর প্রাণেই অল্প বিস্তর পরিমানে এই প্রেমের অস্তিত্ব আছে—এরূপ অবস্থায় কে অস্বীকার করিবে যে তরুলতা, প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতি অচেতন পদার্থও সম্পূর্ণরূপে এই প্রেমে বিজড়িত? এখন ভাবের সহিত এই প্রেমের সম্বন্ধ কি দেখা যাউক:—



প্রেমই ভাবের প্রস্রবণ; প্রেম না থাকিলে ভাব জন্মিতে পারে না; প্রেমের অস্তিত্ব সর্ব্ব হৃদয়েই, সুতরাং ভাবের স্থিতিও হৃদয় মাত্রেই; কিন্তু প্রেমের পূর্ণ বিকাশ সর্ব্বত্র নাই বলিয়াই সকলের হৃদয়ে ভাব স্ফূর্ত্তি পায় না। 'প্রেমই ভাবের প্রস্রবণ'—কথাটা একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায় যে 'ভাবই প্রেম'! আমাদের হৃদয়ে যে পরিমাণে প্রেমের বিকাশ হয়, ঠিক সেই পরিমাণে বাহ্য জগৎ হইতে আমরা ভাব গ্রহণ করিতে পারি; কিন্তু সে ভাব কি? তাহাও প্রেম ছাড়া আর কিছুই নহে। সে কিরূপ তাহা পরে বুঝাইতেছি।

পৃথিবীতে বিভিন্ন সত্তার দুইটী পদার্থ অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় মিশিয়া যাইতে পারে না; জলে জল মিশাইলে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না, কিন্তু জলে দুগ্ধ মিশাইলে তাহার স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়;—সেইরূপ, আমাদের হৃদয়ের প্রেম যখন বাহ্য জগতের প্রেমই শুধু আকর্ষণ করে, তখন আমরা ঠিক ছবিরই মত ছায়াটীকেও গ্রহণ করিতে পারি। এই অবস্থায় আমাদের ভাব স্বচ্ছ ও কাব্য পরিস্ফুট হয়। এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে—প্রেম, প্রেম ছাড়া অন্য কিছু আকর্ষণ করে কি না? —না, তাহা করে না; এবং তাহা করিলে প্রেম আর 'প্রেম' থাকে না, দুগ্ধ মিশ্রিত জলের ন্যায় ভিন্ন আকার ধারণ করে। এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে দিক্ দিয়াই যাই না কেন, যে ভাবই দেখি না কেন,—আমরা বাস্তবের প্রেম ছাড়া কল্পনায় আর কিছুই দেখি না। বস্তুত বাস্তবের প্রেম টুকুই কল্পনার প্রাণ; এই প্রেম আকর্ষণ করিবার উপযুক্ত প্রেম (শক্তি) হৃদয়ে জন্মিলেই, আমাদের কল্পনা ঠিক বাস্তবেরই ছায়া তুলিয়া ধরিতে পারে এবং ভাষা প্রাণময়ী হয়। নগেন্দ্রবালা যখন লিখিলেন:—

বড় সাধ হয় মনে প্রণয় হইয়া আমি
জুড়াব তাহার হৃদি যে জন হতাশ প্রেমী'—

তখন বুঝিলাম, হতাশ হৃদয়ের প্রেমটুকু তিনি আপনার বিমল প্রেমে গলাইয়া লইতেছেন। তখন দেখিলাম, যেন কতকগুলি হতাশ প্রেমিক ভগ্ন হৃদয়ে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, আর তিনি পুণ্য প্রেমধারা সিঞ্চনে তাহাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছেন! এই সহজ সরল দুইটী পংক্তির

ভিতর কি উচ্চভাব—কি স্বতঃ উৎসারিত ভাষা—কি সুন্দর ছবিখানি ফুটিয়াছে! আবার যখন লিখিলেন ঃ—

" এস এস তুমি আমার দুয়ারে
আমি তব নহি পর,
যেই বিশ্বে তুমি লভেছ জনম
সেই বিশ্বে মোর ঘর "—

তখন বুঝিলাম, তিনি দেবী—তিনি বিশ্ব প্রেমিকা! এ কবিতার ভিতর কি আছে? রূপক নাই অনুপ্রাস নাই, ভাষার ছটা নাই, পাণ্ডিত্য নাই!—তথাপি ইহাতে কি নাই? কোমলতা, মধুরতা, উদারতা, আত্মনির্ভরতা, উচ্চ আদর্শ, পাঠক মাত্রকেই মুগ্ধ করিবার, আকৃষ্ট করিবার প্রবলা শক্তি—আবার বলি, ইহাতে কি নাই? এখন মানকুমারীর একটী কবিতার প্রতি পাঠকগণের মনযোগ আকর্ষণ করিব। তিনি লিখিলেন ঃ—

" আমি চাই জিতেন্দ্রিয় বিশ্বাসী পরাণ
ছিঁড়িয়াছে মোহপাশ, ছয়রিপু চিরদাস,
নর নারী ভাইবোন নাহি অন্য জ্ঞান ;
চাহিতে মুখের পানে, সঙ্কোচ আসে না প্রাণে
কি যেন দেবত্ব মাখা সে পূত বয়ান!
আমি চাই জিতেন্দ্রিয় বিশ্বাসী পরাণ। "

এরূপ অপূর্ব্ব ভাব কাহার হৃদয় মুগ্ধ না করে? এরূপ উচ্চ আদর্শ কাহার প্রাণে নবশক্তি না ঢালিয়া দেয়? কবিতার অক্ষরে অক্ষরে কি তেজ, কি স্বর্গীয় আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে! এই কবিতার রচনা মুহূর্ত্তে কবির মনের অবস্থাটী একবার ভাবিয়া দেখা যাউক ঃ—

কবি, আপন আত্মাকে, আপন কল্পনাকে, সংসারের কত উর্দ্ধে কোন্ স্বর্গরাজ্যে ছাড়িয়া দিয়া গাহিতেছেন—" আমি চাই জিতেন্দ্রিয় বিশ্বাসী পরাণ "—জানি না তাঁহার হৃদয়ময় তখন কোন্ তাপসের তপঃজ্যোতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল!—পরক্ষণেই বলিতেছেন ঃ—

ছিঁড়িয়াছে মোহপাশ, ছয় রিপু চির দাস,
নর নারী ভাইবোন্ নাহি অন্য জ্ঞান "



এ উক্তি কখন সম্ভবে? যখন মানব মন প্রেমের পূর্ণ প্রভাব সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারে—যখন সংসার ভুলিয়া গিয়া, আপনাকে ভুলিয়া গিয়া, আপন তেজে জীবাত্মা জ্ঞানমার্গেরদিকে ছুটিয়া যায়, তখনই শুধু এইরূপ গীতি স্বভাবতই সম্ভবপর।

পরক্ষণেই—

" চাহিতে মুখের পানে, সঙ্কোচ আসেনা প্রাণে
কি যেন দেবত্ব মাখা সে পূত বয়ান! "

এইখানেই কবির হৃদয়খানি উন্নতির শেষ সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে; এখানে সংসার তাঁহার পদতলে। স্বর্গ তাঁহার হৃদয়ে! প্রেম বুঝি তাঁহারই অঙ্গ-জ্যোতি!

এখন দেখা যাক্—এ উচ্চ আদর্শের মূল কোথায়? পূর্ব্বে বলিয়াছি, 'বাস্তবের প্রেমই কল্পনার প্রাণ;' এখন দেখিতেছি—এ প্রেমের 'ছবি' তাঁহারই হৃদয়ে এবং ছায়া তাঁহার কল্পনায়। মৃত্তিকা পাইলে তাহা ইচ্ছামত গড়িয়া তুলিতে পারা যায়, অতএব কাব্যের মূলে একটা ক্ষীণ সত্য না থাকিলে তাহা ফুটিতে পারে না। আমরা যেটুকু বেশ অনুভব করিতে পারি, তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত রচনা হৃদয়গ্রাহী হয়।

কবি গাহিলেন ঃ—

নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত-চরণ-তল
অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল অঞ্চল
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্র তুষার কিরিটিনী! "—

ইহার ভিতর আমরা কি দেখিতে পাই? দেখি—জড় অচেতন ভারতভূমির তিনি প্রাণ খুঁজিয়া পাইয়াছেন! ভারতকে 'ভুবন-মন-মোহিনী জননী' কল্পনা করিয়া নীল সিন্ধুজলে তাঁহার চরণ ধৌত দেখিতেছেন,—শ্যামল তরুপল্লবগুলি বায়ুহিল্লোলে কাঁপিয়া কাঁপিয়া, তাঁহার অঞ্চলরূপে উড়িতে দেখিতেছেন,—হিমাচলকে তাঁহার ললাট কল্পনা করিয়া, অম্বর কর্ত্তৃক চুম্বিত দেখিতেছেন, আর তুষার-ধবল হিমাচল শিরকেই তিনি মনশ্চক্ষে ভারতের গৌরব মুকুটরূপে দেখিতে পাইতেছেন। এ দৃষ্টিশক্তি তাঁহার

কোথা হইতে আসিল? অমল মাতৃভক্তি, উচ্চ স্বদেশপ্রেম, হৃদয়ের পাতে পাতে জ্বলিতেছিল বলিয়াই এ ছবি তিনি দেখাইয়াছিলেন, এ ভাব তিনি ফুটাইতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং 'প্রেম' ও 'ভাব' পরস্পর বিভিন্ন নহে।

এখন ভাষার কথা। ভাষা কোথা হইতে আসে? ভাবের পূর্ণ উপলব্ধি হইতেই ভাষা আপনা আপনি নিঃসৃত হয়। ভাষা শিক্ষা দ্বারা লাভ করা যায় না অথবা সুদীর্ঘ সমাস-সন্ধি উপমা সমন্বিত রচনার ভাষাই ভাষা নহে; যাহা দ্বারা আপন হৃদয় ভাব বেশ স্বচ্ছরূপে পাঠক মণ্ডলীর হৃদয় দর্পণে প্রতিফলিত করিতে পারা যায়—তাহাই ভাষা। মনে কর, আমরা একটী ফুল দেখিলাম; যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ফুলের খাঁটী প্রেম (সৌন্দর্য্য) টুকু, আমাদের হৃদয়ের প্রেম দ্বারা আকর্ষণ করিয়া লইতে না পারি ততক্ষণ সেই ফুল সম্বন্ধে আমরা একটা 'ভাব' গড়িয়া তুলিতে পারি না, সুতরাং আমাদের ভাষাও পরিস্ফুট হয় না। ভাব হইতে ভাষা জন্মে—এই ভাব ও প্রেম আবার একই জিনিষ, সুতরাং ভাষা ও প্রেম হইতে উৎসারিত হয়। যাহা অল্প সীমার মধ্যে অধিক ভাব প্রকাশ করিতে পারে তাহাই খাঁটি ভাষা; এখন দেখা যাক্ প্রেম কিরূপে এইরূপ ভাষার উৎস:—

বঙ্কিমবাবু কুন্দ চরিত্র অঙ্কিত করিলেন—কুন্দের হৃদয়ে অপরিসীম প্রেম ঢালিলেন, কিন্তু কুন্দের ভাষা তিনি কিরূপ দেখাইয়াছেন? —

পাঠক! একবার দীর্ঘিকাতীরে, নগেন্দ্রের প্রতি প্রশ্নে কুন্দের সেই 'না' উত্তর স্মরণ করুন; সেই ছোট 'না' কথাটী কুন্দ হৃদয়ের কতদূর ভাব জ্ঞাপক। সেই 'না' ভাষাটীতে কত প্রেম কত ভাব, কত কথা বিজড়িত! কুন্দচরিত্র কবির কল্পনা—কিন্তু তাহার এরূপ ভাষা তিনি কেন কল্পনা করিয়াছিলেন? কারণ তিনি জানিতেন—প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের সৌন্দর্য্যই সংক্ষিপ্ত ভাষা; কারণ কুন্দহৃদয়ের প্রেম কবি হৃদয়েরই ছায়া। প্রেমই আমাদিগকে তন্ময়তা শিক্ষা দেয় সুতরাং তাহারই উপাসনায় আমাদিগের হৃদয় মন নিয়োজিত করিলে ভাষা আপনিই আমাদিগকে খুঁজিয়া লইবে, —আমাদিগকে আর ভাষা খুঁজিতে হইবে না।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

# সমালোচন। *

আমরা সমালোচনার্থ এই সকল মাসিক পত্রিকাগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি;—অলৌকিক রহস্য, বামাবোধিনী, উপাসনা, মুকুল, কৃষক, সাহিত্য সংহিতা, মহাজন বন্ধু,, অর্চ্চনা, পন্থা, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক পত্রিকা)।

এই গুলির মধ্যে পাঠক মহাশয় দেখিবেন যে বামাবোধিনী সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন পত্র, ৪৭ বর্ষ চলিতেছে, আর অলৌকিক রহস্য সর্ব্বাপেক্ষা নূতন অর্থাৎ গত বৈশাখে বাহির হইয়াছে। অর্চ্চনা, উপাসনা, দুইটি ভগিনী ৫। ৬ বৎসরের বালিকা, বাকি কাগজগুলি সকলেই প্রতিষ্ঠিত। মুকুল আমাদের এক বয়সী হইলেও মুকুল—পঞ্চদশী—ভরসা করি আজিও প্রস্ফুটিত হয়েন নাই। সূর্য্যের বরে কুন্তীদেবীর ন্যায় মুকুল চিরযৌবনা বা স্থির যৌবনা থাকুন। মুকুলের ফুটিয়া কাজ নাই। কাঁচা মিঠে আম কে পাকা খাইতে চাহে?

বৈশাখে সম্বৎসর পরে অনেকের মনের কথা বলা সম্ভব এই আশ্বাসে কাগজ খুলিয়া দেখি, বলিয়াছেনঃ—

পন্থা—আমাদের ত্রয়োদশ বৎসর।

মহাজনবন্ধু—নবম বর্ষের ভূমিকা।

বামাবোধিনী—নব বর্ষ।

আর অলৌকিক রহস্য—আমাদের বক্তব্য।

বামাবোধিনী—বেদীতে বসিয়াছেন। প্রথমেই নববর্ষের আনন্দের কথা বলিয়া, বলিতেছেন সকলেই আপন আপন কর্ত্তব্য সাধন করিতেছে "আমাদের জীবনের এক নূতন অধ্যায় অতীতের আলোচনা করিতে গেলে গত ৪৬ বৎসর মধ্যে কত যে সুখ দুখ, আনন্দ বিষাদের মধুর ও কঠোর স্মৃতি হৃদয়ে জাগরিত হইয়া উঠে, তাহার ইয়ত্তা নাই। * * এই ক্ষুদ্র শক্তি সেই মহাশক্তির টানে আপন কঠোর কর্ত্তব্য সাধন করিয়া চলিয়াছে। * * আমাদের সে বিষয় (ফলাফলের বিষয়) ভাবিবার কোন

* সমালোচনটী কয়েক মাস পূর্ব্বে আমাদের হস্তগত হইয়াছিল। কার্য্যের বিশৃঙ্খল হেতু প্রকাশিত হয় নাই। পূর্ণিমা প্রকাশক।

অধিকার নাই। কেবল কর্ত্তব্য সাধন করাই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। * * হে ভগবন্, * * আমরা যেন জীবনের কঠিন পরীক্ষায় ভীত হইয়া কর্ত্তব্য সাধনে পশ্চাৎপদ না হই। তোমারই প্রতি কেবল লক্ষ্য রাখিয়া আমরা যেন কল্যানের পথে অগ্রসর হইতে পারি। তুমি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর।"

পন্থা —বলিতেছেন "গত বৎসরের পন্থার পাঠকগণের ও পন্থার প্রতিপাদ্য পরাবিদ্যা সমিতির সুখ দুঃখ পাপ পুণ্যাদির সমস্ত ফল শ্রীভগবৎ চরণে সমর্পিত হৌক। ওঁ" * * এবারে ব্রহ্ম বিদ্যা কি তাহার আলোচনা আবশ্যক।" দশপৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধে এই আলোচনা হইয়াছে। সুতরাং পন্থাও বেদীতে বসিয়াছেন। স্থানে স্থানে ভাষা বড় জটিল। এরূপ প্রবন্ধের ভাষা যত সরল হইবে ততই তাহার উপকারিতা বাড়িবে, ভাষা জটিল হইলে লোকে বিরক্তহয়—বুঝিতে পারে না, কোনও উপকার হয় না। একটা নমুনা দেখুন "বিশ্লিষ্ট ও ভেদ ভাবে বিশিষ্ট আমি-জ্ঞানের বা উপাস্য বস্তু-জ্ঞানে চিত্ত স্থাপিত করিলে সূক্ষ্মাদি লোক সকল প্রতীত হয় বটে কিন্তু তাহার মধ্যে ভেদাত্মক বিশিষ্ট জ্ঞানের খেলার অবসান হয় না, এই ভেদাত্মক ভাবের অভিব্যক্তির নাম বৈখরী বাক্ বা নাদ।"

মহাজন বন্ধুও বেদীতে বসিয়াছেন। তবে এ বেদী, আচার্য্যের বেদী নহে, ইহা কথক ঠাকুরের বেদী। আচার্য্যের বেদীর ধ্রুপদ, খেয়াল, রুদ্র তাল, পঞ্চম সোয়ারীর জীমূত গর্জ্জন ইহাতে নাই। তবে বড় জোর মধ্যমানের ঠেকা হইতে ঠুংরি কার্ব্বা, যৎ প্রভৃতি বংশীধ্বনি। গ্রাহককে দেবতা জ্ঞানে বলিতেছেন "হে দেবতা শুভ নয়নে আমাকে দর্শন কর, আমরা এই বর চাই। * * আমরা বিশ্বাস করি, তুমি বিশ্বাসঘাতক হইও না, দেবতাকে দেবতার মত দেখিতে চাই, বিশ্বাসঘাতক হয়ে ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিও না। * * আমাদের গ্রাহক মহোদয়েরাই "বিরাট আমি।" মনে পড়িল একজন সম্পাদক গ্রাহককে গ্রাসক বলিয়াছিলেন।

সপ্তা হপ্তা সিন্ধু হিন্দু এক যদি হয়।
গ্রাহকে গ্রাসকে তবে ভেদ কেন রয়॥

পাঠক মহাশয় তুলনায় সমালোচন করুন। জানি না আপনি গ্রাহক কিনা।



অলৌকিক রহস্য—আসরে নামিতেছেন, সুতরাং ইহার গৌরচন্দ্রিকা গোড়ায়। এখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিগণ অপৌরুষেয় বেদকে কৃষকের গান, আর পুরাণ শাস্ত্রকে জনপ্রবাদ পরম্পরার সমষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; পরলোক, দেবতা, সূক্ষ্ম শরীর, ভূতযোনি, স্বর্গ, নরক, প্রভৃতি সমস্তই শিশুমানবের উদ্দাম কল্পনাশক্তি বা বায়ু-রোগ গ্রস্ত ব্যক্তির বিকৃত মস্তিষ্ক প্রসূত বলিয়া উপহাস করেন, সন্ধ্যা, বন্দনা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ প্রভৃতি হিন্দুর নিত্যানুষ্ঠানের কর্ত্তব্যগুলিকে স্বার্থপর অলস মানবের বিধান বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। * * *

সৌভাগ্যের বিষয় * * পাশ্চাত্য মনীষিগণ পূর্ব্বোক্ত অতি প্রাকৃত ও অলৌকিক তত্ত্ব সমূহের রহস্যোদ্ঘাটনে যত্নশীল হইয়াছেন। তাঁহাদের অসাধারণ উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ফলে যে সমস্ত গূঢ় রহস্য আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে বিজ্ঞান জগতে এক নূতন যুগের আবির্ভাব লক্ষিত হইতেছে। এক্ষণে যাহাতে বঙ্গীয় পাঠকগণ উপরি উক্ত সমস্ত তত্ত্বের আভাস প্রাপ্ত হইতে পারেন এবং তৎসমূহের সাহায্যে আমাদের নষ্টপ্রায় শাস্ত্রীয় জ্ঞানরাশির প্রভাব পুনরায় তাঁহাদের হৃদয়কন্দর সমুদ্ভাসিত করিতে * * কৃতকার্য্য হন, সেই উদ্দেশ্যে আমাদের এই অলৌকিক রহস্যের অবতারণা।"

এরূপ একখানি মাসিক পত্রিকার প্রয়োজন ছিল। ইংরোজিতে এইরূপ একখানি পত্রিকা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ সম্পাদন করেন। বাঙ্গালী পাঠকের অভাব এইবার 'অলৌকিক রহস্য' মোচন করিল। আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। মৃত্যুর পর একটা অবস্থা আছে, দেহের অবসানেই জীবের সব যায় না, সব ধ্বংস হয় না Total annihilation হয় না। ইহা জানিতে পারিলে অনেক উপাধিধারী যুবক সাবধান হইবেন, অনেকে নাস্তিকতার হাত হইতে রক্ষা পাইবেন। আমরা জানি, একজন উকিল কিছুই মানিতেন না। তারপর একদিন রজনীযোগে অর্গলবদ্ধ ঘর হইতে তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃজায়া সহসা অন্তর্হিত হইল। তাঁহার পত্নী ঘরে আলো জ্বালিয়া দেখেন 'বউ' নাই। ঘরে খিল দেওয়া, গেল কোথা, খিল খুলিয়া বাহিরে আসিয়া উকীল মহাশয় খুঁজিতে খুঁজিতে গোঁ গোঁ শব্দ শুনিলেন

উঠানে। এখানে একটা ঘর ছিল—ছাদে উঠিবার সিঁড়ী ছিল না। সেই ছাদে গোঁ গোঁ শব্দ। পাড়ার লোক একত্র হইয়া মই লাগাইয়া বহু কষ্টে সেই অজ্ঞান স্ত্রীলোককে ছাদ হইতে নামাইলেন। চৈতন্য হইলে বলিলেন "আমার মৃত স্বামী আমাকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলিলেন, আমি অস্বীকার করিলে, তিনি আমায় ধরিলেন। তারপর অজ্ঞান হইলাম; তারপর এই জ্ঞান হইয়াছে। আর কিছু জানি না।' উকিল বাবুর অবিশ্বাস উড়িয়া গেল। তিনি পরম শ্রদ্ধাবান হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এখন তিনি পরম নিষ্ঠাবান সাধক। পরে বুঝা যায়, একজন মহাপুরুষের কৃপায় তাঁহার গৃহে এই অলৌকিক রহস্যের অবতারণ হয়। তাই বলি 'অলৌকিক রহস্য' হইতে আমাদের প্রভূত উপকার হইবে। এবার এই প্রবন্ধগুলি আছে—ভৌতিক কাহিনী, প্রেতিনীর সহিত বিবাহ, ভূতের সহিত সাক্ষাৎ, ভূতের ভীষণ প্রতিহিংসা, দাদা মহাশয়ের ঝুলি, পুনরাগমন, যমালয়ের পত্রাবলী। ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রবন্ধ পরিচয় দিলাম না।

সম্পাদক হইতেছেন শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ, সহকারী সম্পাদক দুই জন শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, ও মাখমলাল রায় চৌধুরী বি, এ। ইহার মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ডাক মাশুল সমেত ১৷৷০ টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যা ৶০। প্রাপ্তি স্থান ৪৭। ১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট কলি কাতা। কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাণীনাথ নন্দী।

এই সঙ্গে বলিয়া রাখি এবারকার পন্থাতেও 'প্রেত তত্ত্ব' বলিয়া প্রবন্ধ আছে। পন্থার অপর প্রবন্ধ গুলিও ভাল। ব্রহ্ম অজ্ঞেয়, ত্রিমূর্ত্তি, ধর্ম্ম বেদান্তাভাস প্রভৃতির পরিচয় দেওয়া মাসিক সমালোচনায় চলে না। পন্থা পূর্ব্ব গৌরবে চলিতেছে, তবে আমাদের মনে হয় যে সাধারণ পাঠকের মুখের দিকে চাহিয়া ভাষাটা একটু সরল করিলে ভাল হয়। একটা পুরান কথা মনে পড়িল। যখন সন ১২৭৯ সালে প্রথম 'বঙ্গদর্শন' বাহির হয় সেই সময়ের কথা। একজন ভদ্রলোক ৺ বঙ্কিম বাবুকে বলেন 'বঙ্গদর্শনের সব বুঝা যায় না—যাহাতে সকলে বুঝিতে পারে এমন করিয়া লিখিলে হয় না?' বঙ্কিম বাবু এই কথার লিখিত জবাব বঙ্গদর্শনেই দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন (সংক্ষেপে) 'বঙ্গদর্শন অশিক্ষিতের জন্য নহে।' পন্থার প্রচারক-



গণ ইচ্ছা করিলে এই জবাব দিতে পারেন। যদি দেন তাহা হইলে আমরা প্রত্যুত্তর করিব 'যিনি এ বিষয়ে শিক্ষিত তিনি আর পন্থা পড়িতে যাইবেন কেন?'

উপাসনা।—কর্ম্মব্রহ্ম বিচার (২) প্রভৃতি প্রবন্ধ ছাড়িয়া দিলেও আছে হিন্দুজাতির ক্ষয় ও তন্নিবারণের উপায় কি, কুরুক্ষেত্রের কলঙ্ক, আসুর বিবাহ, আগমন (কবিতা)। কর্ম্মব্রহ্ম বিচার পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে এখনও চলিতেছে। মূল কথা মানব জীবনের সংস্কার প্রভৃতি যাহা কিছু বিধি নিষেধ আছে সকলই ঈশ্বর প্রেরিত। লেখক এক স্থানে বলিতেছেন বেদ মনুষ্য প্রণীত সুতরাং মানুষের যখন ভ্রম হয় তখন বেদে ভ্রম প্রমাদ আছে। হিন্দুর পক্ষে এ কথা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়। লেখক বলিতেছেন অন্ধ বিশ্বাস এ বিষয়ে ভাল নয়। তিনি প্রথমেই বেদের শ্লোক তুলিয়া নিরুক্তির ব্যাখ্যা দিয়াছেন এবং তাহার অনুবাদ ও দিয়াছেন। বলিতেছেন, অভিধানে যে মানে নাই সেইখানে নিরুক্তি লেখক কোথা পাইলেন? এইরূপ গোটাকত ভুল দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। আমরা জানি বেদ অপৌরুষের সুতরাং ইহাতে আমাদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না, তবে তরলমতি যুবকদের অনিষ্ট হইতে পারে। তাই যদি জগদম্বার ইচ্ছা হয় তবে হইবে। কে কি করিবে। আমাদের দেশের এই নিয়ম যে যদি হঠাৎ কোন ঋষি একটা ভুল করিয়া ফেলেন, তবে সেটা ভুল ভুল বলিয়া ঢক্কা না বাজাইয়া তাহাকে সংশোধন না করিয়া ঋষিবাক্য বলিয়া আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া রাখিয়া দেন। মানীর মান এমনিই করিয়া দেবোপম ঋষি মুনিগণ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এই যে সেদিন নবদ্বীপ ধামে ঐ ব্যাপারই হইয়াছিল। কবি দাশরথী রায় গান গাহিতে গাহিতে বলিয়া ফেলিলেন:—

ষড় রিপু হ'ল কোদণ্ড স্বরূপ।
পূর্ণ ক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ॥

একজন পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন, ভুল ভুল কোদণ্ড বা ধনুক দ্বারা মৃত্তিকা খনন করা যায় না। কূপ খনন করিতে কোদালী চাই। কোদণ্ড শব্দের পরিবর্ত্তে ওটা কোদাল শব্দ হইবে। মহামহোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয়

পণ্ডিতকে ধমক দিয়া বলিলেন, বালকের মত চাঞ্চল্য দেখাইও না; যখন দাশরথীর মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, তখন ওটা কবি-প্রয়োগ, আজ হইতে কোদণ্ড মানে কোদাল বলিতে হইবে। বাপুহে বলি নিরক্তর ভুল ধরিয়া কাহার কি উপকার হইবে? ইহা বৃথা জলধি মন্থন।

'হিন্দুজাতীর ক্ষয়' ইত্যাদি প্রবন্ধে অদ্ভুত যুক্তি তর্ক, প্রভৃতি আছে। হিন্দু বিধবারা বিবাহ না করায় তাঁহারা সন্তান প্রসব করিতে পারেন না। পুনর্ব্বার বিবাহ হইলে অনেক সন্তানের জননী হইতে পারিতেন। গুপ্ত প্রণয়ের ফলে হিন্দুর মধ্যে ভ্রূণহত্যা হয় আর মুসলমান রমণীরা স্বচ্ছন্দে সন্তান প্রসব করেন। হিন্দুর সংখ্যা কমিবার ইহা একটি কারণ। গত দশ বৎসরে ৬ লক্ষ লোক কৃশ্চন হইয়াছে—ইহাদের অনেকে দুর্ভিক্ষ কৃশ্চন অর্থাৎ পেটের জ্বালায় ব্যাপ্তাইজ হইয়াছেন। লাহোরের আর্য্য সমাজ এখন এই সকল খৃষ্টানকে পুনরায় গঙ্গাজলে ব্যাপ্তাইজ করিয়া হিন্দু করিয়া লইতেছেন। এই সুযোগে ঐরূপ খৃষ্টানদিগকে হিন্দু করিলে ক্ষতি কি?

হিন্দুজাতি ক্রমে লয় পাইবে এইটি অনেকের ধারণা। ডাক্তার উপেন্দ্র নাথ (বিলাত ফেরৎ ও পেন্সন প্রাপ্ত) এ বিষয়ে একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। যদি মা জগদম্বার এইরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে যে হিন্দুজাতি লয় প্রাপ্ত হইবে—তাহা হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। কিন্তু যখন এত চেষ্টা এত নজর তখন বৎসর বৎসর শতাধিক হিন্দুসন্তানকে বিদেশে বিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠাইয়া তাঁহারা হিন্দু সমাজকে ক্ষুন্ন করিতেছেন কেন? পূর্ণিমা এ সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছিল অহিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদিগকে বিদেশে পাঠাইলে হয় না?

মহাজন বন্ধু।—ফর্ম্মোজা দ্বীপে চিনির কাজ, ভারতের মাকু ও সুত। ভবিষ্যৎ বাজারের অবস্থা আমাদিগকে নানা শিক্ষা দিতেছেন।

কৃষক।—প্রথমেই গ্রাম্য ব্যাঙ্কের কথা বা যৌথ ঋণ দান সমিতি। নববর্ষ, জাতীয় বিদ্যা মন্দিরের প্রদর্শনী, কার্ত্তিকশালী ধান্য, আমেরিকায় ভারতের শ্রমজীবী, প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ, সার সংগ্রহ ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য সাহিত্যের ভাগ বেশী। এক একটি শস্য ধরিয়া তাহার চাঁষ করিবার ব্যবস্থা দিলে বড় ভাল হয়।



সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।—এই সকল প্রবন্ধ আছে—খনিজ বিদ্যার পরিভাষা, শঙ্করাচার্য্য, বাঙ্গালা উপসর্গ, কোচবিহারের হেঁয়ালী, প্রাচীন পদাবলীর পাঠ, ইহা পূর্ব্ববৎ চলিতেছে।

সাহিত্য সংহিতা।—গোপলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদক হইয়াছেন। ভালই হইয়াছে। অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে, এই দেখুন না—ন্যায় শাস্ত্রের উপযোগীতা, হালির ধুমকেতু, গীতোক্ত কর্ম্মযোগ, রত্নাবলী, হৃদয়-রাণী, ভাষার জীবন রক্ষা, দুগ্ধ, ভারতী চরণে, গোপার প্রতি, দেবালয়, কৃপণ।

ন্যায় শাস্ত্রের উপযোগিতা সম্বন্ধে দুই কথা বলিব কি, হঠাৎ মনে হইল, রামপ্রসাদ কি বলিয়াছেন। সকল বিষয়ের দুইটা দিক আছে! তর্কবাগীশ মহাশয় এ পিট দেখাইতে বাধ্য।

"ষড় দর্শনের সেই অন্ধগুলা
কিনিল জ্যেষ্ঠা মূলা,
ওরে খেলা ধূলা কে ভাঙ্গিবা।"

শীতের শেষে হালীর ধুমকেতু আপনারা দেখিতে পাইবেন। এই ধুমকেতু ৭৬ বৎসরে একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। ১৮০৫ সালে দেখা দিয়াছিল। গীতার কর্ম্মযোগ আর রত্নাবলীর অনুবাদ সম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই। হৃদয়রাণী উপন্যাস এবার পঞ্চম পরিচ্ছেদ আরম্ভ। 'ভাষার জীবন রক্ষা' প্রবন্ধে কতকগুলি উপায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেইগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিলে ভাষা অমরত্ব পদে উন্নীত হইবে।" দুগ্ধ প্রবন্ধে কতকগুলি আয়ুর্ব্বেদের শ্লোক হইতে গুণাগুণ বিচার করা হইয়াছে। তৎপরে গোপ, দেবালয়, কৃপণ, ভারতী চরণে প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি আছে।

মুকুল।—এইগুলি প্রবন্ধ আছে। চার্লস ডারউইন, টুবলু (ইন্দুরের গল্প) সোনার প্রাণ, জীবনের পথে, আকাশ মণ্ডল, ধাঁধাঁর উত্তর ও নূতন ধাঁধাঁ। বার বার বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি মুকুল শুধু বালককেই আনন্দহৃদয় না। অনেক বৃদ্ধকেও আনন্দ বিতরণ করে। টুবলু ইন্দুরের কাহিনী বড় ভাল লাগিয়াছে। সোনার প্রাণ—বিদেশীর গল্প সৌভ্রাত্রের কথা। আকাশ মণ্ডল প্রবন্ধে বলা হইয়াছে বিশিষ্ট তারা আছে ৯টি।

প্রথম শ্রেণীর তারা—১৮,
দ্বিতীয় শ্রেণীর তারা—৭১,
তৃতীয় শ্রেণীর তারা—২২৯,
চতুর্থ শ্রেণীর তারা—৭৪১,
পঞ্চম শ্রেণীর তারা—২১১৮,
ষষ্ঠ শ্রেণীর তারা—১০৫৪৮,
সপ্তম শ্রেণীর তারা—২২৫৫৬,
অষ্টম শ্রেণীর তারা—১০১৯৮৪,

পাঠক একবার ব্যাপারটা কি ভাবুন। এক একটি সূর্য্য নয়?

অর্চ্চনা।—শক্তির মূল তত্ত্ব ও পূজা, গঙ্গোত্তরী পথের মাধুরী। প্রজা বৎসল জাহাঙ্গীর, সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র কন্যা, মৃত্যু বিভীষিকা, পরিচয় (পদ্য) যবন তত্ত্ব নিকলো মানুষী, দৈব ও পুরুষকার, পরিত্যক্ত ভ্রমর (কবিতা)। অর্চ্চনা বেশ সতেজ ও স্ফূর্ত্তিতে চলিতেছে। বেশ বুঝা যায় পরিচালকগণ ইহাতে প্রাণ ঢালিতেছেন। একজন লেখক ভারতে শক্তি পূজা বহুদিন প্রচলিত আছে প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু বেদের কথা উল্লেখ করেন নাই। বেদে 'উমা হৈমবতীর' কথা আছে। বেদে তান্ত্রিক পূজার মূল তত্ত্ব আছে।

কমলা। কমলার ছাপা ভাল নয়। প্রবন্ধ পরিচয় লউন। ভারতের খনিজ ধন (তাম্র) রঙ, বঙ্গদেশের শ্রম শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা, রেশম প্রস্তুত ও রেশমী বস্ত্র বয়ন, কাষ্ঠ মজ্জা দ্বারা কাগজ প্রস্তুত, একই ক্ষেত্র হইতে একাধিক ফসল উৎপত্তি, মাছের কথা, ভারতে দুর্ভিক্ষ। কি কারবার করিবে? কমলা বেশ চলিতেছে, আর আমাদের কি এখন দরকার সেদিকে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আছে। আশা করি বাঁচিয়া থাকিবে ও দেশের মঙ্গল করিবে।

সার্ব্বজনীন উপাসনা ও সাম্যবাদ। শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী প্রণীত। পাঠক পড়িয়া দেখিবেন। একটি ভাল কথা, লেখক ইংরেজ রাজ্যের স্থায়িত্ব কামনা করেন। এরূপ খোলা কথার উপযোগিতা আছে।



# বারাণসী ও সারনাথে।

মধুপুরে,—গিরিতটে, শীতল সমীরে, চাঁদের আলোয়, সাঁওতালের বাঁশলির করুণ বিলাপে, হৃদয় উদাসে পূর্ণ করিয়াছিল। শরতের নির্ম্মুক্ত আকাশতলে, উন্মুক্ত প্রান্তরে, নদীতটে, গিরিমূলে, শালবনে, সুরম্য প্রস্ফুটিত পুষ্পোদ্যানে, কত ছুটাছুটি করিতেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই প্রাণে শান্তি আসিতেছিল না। আনন্দময়ীর আগমনে সারা বরষের শোক তাপ, দুঃখ কষ্ট বিস্মৃত হইয়া মার চরণে পুষ্পাঞ্জলী দিয়া বঙ্গবাসী আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করে। স্বাস্থ্যান্বেষণে সাধ করিয়া প্রবাসী হইয়াছি। ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত দেশে প্রত্যাগমন করিতে সাহস হইতেছিল না। এদিকে আনন্দময়ী মাকে অন্তত আর এক বৎসর দেখিতে পাইব না—ইহাতে প্রাণে দারুণ কষ্ট হইতেছিল, মন প্রাণ নিঝুম হইয়া আসিতেছিল। মধুপুরে প্রবাসে অনেক বাঙ্গালীই বাস করিয়া আছেন, কিন্তু মাকে দেখিবার—মার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলী দিবার কল্পনা কেহ করিয়াছেন কিনা জানি না, কার্য্যতঃ কেহ কিছুই করেন নাই। শুনিলাম, মেথর বাড়ীতে মা আসিতেছেন। সেইখানেই গেলাম, চিরকালের সংস্কারে মন পূর্ণ, কাজেই দূর হইতে দেখিলাম—প্রতিমা গঠন আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। পঞ্চমীর দিনে প্রাণ আর বাঁধ মানিল না। ষ্টেশনে ছুটিলাম। টিকিট করিতে করিতেই ট্রেন আসিয়া হাজির। বারাণসীধামে যাইবার জন্য ট্রেনে উঠিলাম। তখন অপরাহ্ণ। ট্রেনে যতটা ভীড় হইবে আশা করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই দেখিলাম না। ঝাঝা ষ্টেশনেই আমাদের কামরা খালি হইল। আমাদের গাড়ী প্রায় সকল ষ্টেশনেই থামিতে থামিতে চলিল, কাজেই রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হইল না। বিশেষ, চলন্ত ট্রেনে চোরের প্রাদুর্ভাব, সেজন্য একটু সতর্কও থাকিতে হইয়াছিল। শেষ রাত্রিতে মোগলসরাই ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। তথায় নামিয়া, রেলের উপরকার পুল পার হইয়া, আউদ-রহিলখণ্ড রেলের ট্রেনে উঠিলাম। ট্রেনের ভিতর আলো নাই, গিয়া দেখি ট্রেনখানি

আরোহীতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, অথচ অন্ধকারে কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না—সকলে ভূতের মত বসিয়া আছেন। যাইহোক কোনও ক্রমে একটি কামরা দখল করিয়া, মোটঘাট রাখিয়া, প্ল্যাটফরমে পাদচারণা করিতে লাগিলাম। তথায় দেখি, পূর্ণিমার সর্ব্বস্ব, বিষ্ণুবাবু গার্ড সাহেবের তল্লাসে ছুটাছুটী করিতেছেন। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান পান নাই, প্রথম শ্রেণীতে যাইবেন, তাই জানাইয়া রাখিতেছেন। ভোর হইল, ট্রেনও ছাড়িল। ট্রেন যখন বারাণসীর পর পারে সেতুর নিকটবর্ত্তী হইল, তখন মন আনন্দ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল। দশ বৎসর পূর্ব্বে একবার আসিয়াছিলাম। তখনকার সুপরিচিত দৃশ্য আবার দৃশ্যপটের ন্যায় নয়ন সমক্ষে সমুদ্ভাসিত হইল। বারাণসীর সেই সুরম্য সোপান সম্বলিত ঘাট শ্রেণী, সেই প্রস্তর বিনির্ম্মিত চারু শিল্পকার্য্য পূর্ণ মন্দির চূড়, সেই অভ্রভেদী বেণীমাধবের 'ধ্বজা' দ্বয়, আরও কত কি দেখিতে দেখিতে কাশী ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। দেখিলাম, এইখানেই গাড়ী একরূপ খালি হইল, বিষ্ণুবাবুও নামিয়া গেলেন। আমি এখানে নামিলাম না—ক্যান্টন্‌মেণ্ট্ ষ্টেশনে নামিব। সেখান হইতে আমাদের বাসা বেশী দূর নয়। অল্পক্ষণ মধ্যেই ট্রেন বেনারাস ক্যান্টন্‌মেণ্ট্ ষ্টেশনে আসিল, আমরাও নামিয়া পড়িলাম। একখানি গাড়ী করিয়া আমাদের সোনাপুরা চৌমহনীর বাসায় প্রাতে ৭ টার সময় পৌঁছিলাম। পরদিন মধ্যাহ্নে আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছি—বাসার নিম্নে রাজপথে পরিচিত স্বর শুনিতে পাইলাম। অবিলম্বে দেখিলাম, জ্যেষ্ঠাগ্রজ ও বন্ধুবর চারুবাবু সহাস্য বদনে আসিয়া হাজির। আমি ত তাঁহাদিগকে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম, আনন্দিতও হইলাম। বিস্মিত—পূর্ব্বদিনে আমি যখন আসি, তখন তাঁহাদের বারাণসী আসিবার কল্পনাও ছিল না,—আর আনন্দিত তো হইবারই কথা। প্রবাসে পাঁচ জন আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সহ ভ্রমণ করার অপেক্ষা আর আনন্দ আছে কি? পুণ্যধাম বারাণসীতে প্রায় প্রত্যেক পল্লী আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দোৎসবে মুখরিত। আমরা মনের সাধে প্রাণ ভরিয়া মার রাঙ্গিবচরণ দর্শন করিয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিলাম।



মহাষ্টমীর দিন প্রাতে বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দর্শন করিলাম। আবার সেই পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিল। বিধর্ম্মীর অত্যাচার, অনাচার, নিষ্ঠুর নিপীড়ন, ভীষণ ভ্রুকুটী সহ্য করিয়া আজিও সনাতন আর্য্যধর্ম্ম সজীব ও সজাগ রহিয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে—যুগ যুগান্তর কালের অনন্ত সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে—কত রাজ্যের অভ্যুত্থান হইয়াছে, কত রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছে, কত রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, আবার লয় পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই—কিন্তু সনাতন আর্য্যধর্ম্ম কিছুতেই টলে নাই—স্বীয় পূর্ণ প্রভাবে দেদীপ্যমান, স্বীয় গৌরবে গৌরবান্বিত, স্বীয় অপূর্ব্ব মহিমায় মহিমান্বিত।

মধ্যাহ্নে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল—স্বর্গগত কাশীধামের সুবিখ্যাত পূর্ণানন্দ স্বামীর আলয়ে। তথায় মায়ের প্রসাদ পাইয়া আমরা বজরা যোগে বরুণা সঙ্গমে যাত্রা করিলাম। সুপরিচিত দৃশ্য সকল দেখিতে দেখিতে আমরা বরুণা সঙ্গমে আসিয়া পৌঁছিলাম—পথে সহরের ভীষণ দুর্গন্ধময়ী পঙ্কিলময় পদার্থ পয়ঃপ্রণালীযোগে গঙ্গায় আসিয়া পড়িতেছে। কি নারকীয় দৃশ্য! এরূপ জঘন্য স্থানে পূর্ব্বে কখনও আসিয়াছিলাম কি না স্মরণ হয় না।

বরুণা সঙ্গমের নিকট একটী বিরাট অরণ্য বিরাজিত—স্থানে স্থানে চাষ আবাদ হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে জন প্রাণীও দেখিলাম না। শুনিলাম সেখানে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চৈৎ সিংহের দুর্গ ছিল। একটী পুরাতন ইষ্টক নির্ম্মিত দুর্গদ্বার আজিও বর্ত্তমান। সেই দ্বার দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিতে হইত। তারপর যত দূর অগ্রসর হইতে লাগিলাম, মধ্যে মধ্যে কেবল বন্য লতাগুল্ম বেষ্টিত ইষ্টকস্তূপ দৃষ্টিগোচর হইল। দুর্গের অপর প্রান্তে অর্থাৎ সহরের দিকে একটি দুর্গপ্রাচীর ও ভগ্ন দুর্গ দ্বার, দেখিলাম তাহার অনতিদূরে একটি ছোট কুঠারীতে জন কয়েক লোক। রামলীলায় সঙ বাহির হইবে, এই নির্জ্জন স্থানে সকলে সমবেত হইয়া সাজগোছ করিতেছে, তখন দলের সকলে আসে নাই। যাহারা আসিয়াছে, তাহাদের উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি দেখিয়া স্বতঃই আনন্দিত হইতে হয়। তাহারা আমাদিগকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাহাদের সঙ

দেখিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল—আমাদের সময় সংক্ষেপ কাজেই অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। তাহারাও ছাড়িবে না। অবশেষে যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারাই সত্বর সাজিয়া লইল। রাম লছ্‌মন রণ-সাজে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, বানর ও রাক্ষসে যুদ্ধ বাধিয়া গেল—সে কি ভীষণ যুদ্ধ! ঠকাঠক্ ফটাফট্ শব্দে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে বানরেরই জিত হইল। বানরদলের আর আনন্দ ধরে না। "রাম লছমান জানকীজী" বলিয়া সুর ধরিয়া সেই নির্জ্জন অরণ্য ভূমি কাঁপাইয়া তুলিল। সেই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আবার সেই ত্রেতা যুগের কথা মনে পড়িয়া গেল—কোথায় সেই অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র, কোথায় সেই আদর্শ ভ্রাতা লক্ষ্মণ, আর কোথায় বা সেই আদর্শ সতী মা জানকী। আর কোথা এই সেদিনের সেই চৈৎসিং ও তাঁহার দুর্গ। কালের অনন্ত স্রোতে একে একে সব ভাসিয়া গিয়াছে—আছে কেবল স্মৃতি। এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে বরুণা সঙ্গমে ফিরিয়া আসিলাম।

শুনিলাম চৈৎসিং দুর্গের সন্নিকটে একবার জাতীয় মহাসম্মিলনী হইয়া ছিল। আমাদের পথপ্রদর্শক কহিল যে বরুণাসঙ্গম বিশ্বেশ্বরের রাজ্যের বাহিরে অর্থাৎ বরুণাসঙ্গমে যে বিষ্ণু মূর্ত্তি আছেন এটা তাঁহারই রাজ্য-ভুক্ত। আমরা বলিলাম, সীমানা লইয়া গোল হইতে পারে, এজন্য সীমানা নির্দ্দেশক অবশ্য কোনও চিহ্ন আছে আমাদিগকে দেখাইয়া দাও—সে বেচারা স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিল না, কেবল হাঁসিতে লাগিল।

আমরা তথায় দেব মূর্ত্তি সকল দর্শন করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বজরায় উঠিলাম। প্রত্যাগমন কালে শঙ্খ, ঘণ্টা, ঢক্কা সহযোগে দেবারতির শব্দ ও রসুনচৌকির সানাইয়ের সুমধুর সকরুণ আলাপে মনে এক অপূর্ব্ব ভাব আনিয়া দিল। গঙ্গাতীরে সোপান শ্রেণীতে উপবিষ্ট হইয়া শত শত নর নারী সন্ধ্যাবন্দনায় নিযুক্ত। সোপান শ্রেণীর উপর বংশখণ্ডোপরি ফানুসের আলো, গঙ্গাবক্ষে প্রদীপের আলো, উর্ম্মিরাশির উপর তালে তালে নাচিতে নাচিতে, হেলিতে হেলিতে, দুলিতে দুলিতে, ভাসিয়া চলিয়াছে, কি সুন্দর অপরূপ দৃশ্য—আকাশের তারাগুলি যেন গঙ্গাবক্ষে নামিয়া অনন্তের উদ্দেশে ধীরে ধীরে চলিয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ,
স্থাপিত ১৩০১ বঙ্গাব্দ,



পরদিন মহানবমী। প্রাতেই আমরা জগৎবিখ্যাতা ভারতহিতৈষিনী বিদুষী আনি বেশান্তের প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট্রাল হিন্দু কালেজ দেখিতে গেলাম। পূজাবকাশে কালেজ বন্দ, তবে কালেজ বোর্ডিংএ অনেক ছাত্র রহিয়াছেন দেখিলাম। দশ বৎসর পূর্ব্বে এই কালেজ দেখিয়াছিলাম, আর আজ দেখিলাম, তখন সবে কালেজ স্থাপিত হইয়াছিল। কাশীনরেশ প্রভু-নারায়ণ তাঁহার গ্রীষ্মাবাস কালেজের জন্য দান করিয়াছিলেন। তখন কালেজ দ্বিতলে ও নিম্নতলে স্কুল বসিত। তখন পণ্ডিতপ্রবর রিচার্ডসান সাহেব প্রিন্সিপ্যাল ও ব্যান্‌বেরী সাহেব হেডমাষ্টার ছিলেন। তখন দেখিয়া ছিলাম, একটী ঘরে লাইব্রেরী ও একটী ঘরে ল্যাবোরেটারী, এবার গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা একরূপ অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। একটী পল্লী জুড়িয়া কালেজ বাড়ী চলিয়াছে। ল্যাবোরেটারী সুন্দর পৃথক বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে, বোর্ডিং তো একটী বিরাট ব্যাপার। ধন্য আনি বেশান্ত। তাঁহারই—একমাত্র তাঁহারই যত্ন, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে এই অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। তিনি কেবল ভারতে নয়, য়ুরোপ ও মার্কিন দেশে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই কালেজের জন্য সুবিশাল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কালেজের উন্নতির জন্য তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব দান করিতেছেন। আনি বেশান্তের যত্নে পথভ্রষ্ট হিন্দুর ছেলে আবার ঘরে ফিরিয়াছে। যে শাস্ত্ররাশি আবর্জ্জনা বলিয়া ফেলিয়া দিয়া ছিল, আবার তাহা সাদরে কুড়াইয়া লইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যিক চাকচিক্যে বিমোহিত হইয়া যাহা অবহেলা করিয়াছিল—আবার সেই অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী হইয়া পরলোকের পথ সুগম করিয়া রাখিতে সমর্থ হইতেছে।

তারপর আনি বেশান্তের অপর কীর্ত্তি—কালেজ বাটীর সম্মুখে থিওজফি-ক্যাল সোসাইটি দেখিতে গেলাম। দশ বৎসর পূর্ব্বে এখানেও আসিয়া-ছিলাম। অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দেখিলাম অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর বাড়ী তৈয়ার হইয়াছে। স্থানটী পরিচিত হইলেও মনে হইল যেন নূতন স্থানে আসিয়াছি, এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! শুনিলাম থিওজফিক্যাল সোসাইটির সংশ্লিষ্ট তারা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস বাটীর উপরতলায় বাঁকীপুরের

সুপ্রসিদ্ধ পূর্ণেন্দুবাবু আছেন। তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তিনি বলিলেন, একবার সারনাথ দেখিয়া যাইবেন। আরও বলিলেন, ট্রেনের সুবিধা থাকিলে সারনাথ ষ্টেশনে নামাই ভাল। কথা স্থির হইল যে একাদশীর দিন তাঁহার সহিত আমরা কাশী নরেশের রাজধানী রামনগর দুর্গে যাইব ও তথা হইতে চৈৎ সিংহের মন্দির ও উদ্যান দেখিয়া আসিব। আর একবার যখন রামনগর দুর্গে গিয়াছিলাম তখন পূর্ণেন্দুবাবুই আমাদের প্রধান সাথী ছিলেন। তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া ৺ বটুক ভৈরব দর্শন করিলাম।

তারপর ৺ দুর্গাবাড়ীতে গিয়া দেবী দর্শন করিলাম। এখানে বানরের বিশেষ উৎপাত দেখিলাম। সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত হইয়া চলিতে হয়—আর পাণ্ডা মহাশয়গণ আমাদের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিলেও সকলের সহিত অনেক সময় সেরূপ করেন না, জুলুম করেন বলিয়াই অনুমিত হইল। প্রত্যাগমন কালে ভাস্করানন্দ স্বামীর মঠ দেখিলাম —সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় ভাস্করানন্দ স্বামীর শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং আশে পাশে অনেকগুলি বিগ্রহও আছেন।

আমাদের বাসায় ফিরিতে মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গিয়াছিল। আহারান্তে আমাদের মত পরিবর্ত্তিত হইল। বন্ধুবর চারুবাবু ই, আই, রেলের উকীল, তাঁহার অনেক কাজ, ছুটী অল্পদিনের, একাদশীর দিন তাঁহাকে ফিরিতেই হইবে, সুতরাং আমাদের প্রোগ্রাম বদলাইতে হইল। আমরা সেই দিনই রামনগর যাইব স্থির করিলাম। পূর্ণেন্দুবাবুকে engagement ভঙ্গের সংবাদ দিলাম। আমরা একখানি বজরা করিয়া রামনগর গেলাম। মহারাজ প্রভুনারায়ণ ও কুমার বাহাদুর তখন সদলে রামনগর হইতে ক্রোশাধিক দূরে রামলীলা দেখিতে গিয়াছেন, কাজেই তাঁহাদের সহিত তথায় সাক্ষাৎ হইল না। আমরা দুর্গ ও রাজবাটী দেখিলাম। সেবারকার মত সব দেখিলাম, কেবল আধুনিক ধরণে কয়েকটী ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। সেবারে হস্তিদন্ত নির্ম্মিত কৌচগুলি দেখিয়াছিলাম, এবার সেগুলি দেখিলাম না। সম্ভবতঃ সেইগুলিই লর্ড কার্জ্জন তাঁহার কেড্‌লষ্টানের



আবাসগৃহ সুসজ্জিত করিবার জন্য বন্দুকের বিনিময়ে কাশীনরেশের নিকট হইতে লইয়া গিয়াছেন।

নিম্নতলে একটী অন্ধকার সুরঙ্গ পথ দিয়া দেবালয়ে যাইতে হয়, তথায় গঙ্গার উপরে শ্বেতমর্ম্মর-নির্ম্মিত সুরধুনী মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তাহার পর কয়েকটী মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। ব্যাসদেবের চিত্র বলিয়া একখানি তৈলচিত্র একটী মন্দিরের গাত্রে বিলম্বিত আছে। তৈলচিত্রখানি পুরাতন বটে, তবে ব্যাসদেবের তৈলচিত্র থাকা বিশ্বাস হয় না, সম্ভবতঃ কোনও শিল্পীর কল্পনা প্রসূত। দেব মন্দিরগুলি সম্বন্ধে ২। ১ কথা বলা উচিত মনে করি। মন্দিরগুলি বিশেষ অযত্নে পড়িয়া আছে, বহুকাল মেরামত হয় নাই। অনেকগুলি অশ্বত্থ গাছ উঠিয়াছে, আর কিছু দিন এরূপ অবস্থায় থাকিলে, মন্দিরগুলি ভগ্নস্তূপে পরিণত হইবে। আর পারাবতের ও চামচিকার বাস ত্যাগ করান নিষ্ঠুরতা হইলেও সম্মার্জনী দ্বারা তলস্থ আবর্জ্জনা দূর করিতে কোন বাধা দেখি না। এই মন্দিরগুলি দেখিলে বস্তুতই প্রাণে বিষম আঘাত লাগে। কাশীনরেশের কিছুরই অভাব নাই, লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অকাতরে দান করিতেছেন, অথচ তাঁহার এ দিকে দৃষ্টি নাই কেন, এ বিষয়ে কে সদুত্তর দিবে?

রাজবাটী ও দুর্গ দেখিয়া আমরা যখন তোরণ দ্বারে পৌঁছিলাম তখন প্রায় গোধূলি। শুনিলাম, ক্রোশাধিক দূরে রামলীলার বড় ধুম হইতেছে। আমাদেরও সখ্ চাপিল—যখন এতদূর আসিয়াছি তখন এটাও দেখিয়া যাওয়া যাক্। আমরা গাড়ী বা এক্কার অনুসন্ধান করিলাম, পাইলাম না— অনেকে ভরসা দিল, পথে যাইতে যাইতে মিলিবে। আমরাও সেই ভরসাতেই রওনা হইলাম। তোরণ দ্বারের সম্মুখ দিয়া সোজা ধূলিপূর্ণ রাস্তা গিয়াছে। আমরা সেই রাস্তা ধরিয়া চলিলাম।

আমরা ক্রমশঃ সহর প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিলাম। পথে যাইতে যাইতে অনেক অনুসন্ধান করিলাম, গাড়ী বা এক্কা কিছুই মিলিল না। অথচ পশ্চাৎপদ হওয়াও কাপুরুষতা, সুতরাং অগ্রসর হওয়া ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর ছিল না। ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া আসিল, দেখিলাম ২। ৪ জন করিয়া অশ্বারোহী প্রত্যাগমন করিতেছেন—মনে করিলাম, বুঝি মেলা

ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যাইহৌক আমরা ক্রমে মেলাস্থলে গিয়া পৌঁছিলাম। দেখিলাম কাশীনরেশ ও রাজকুমার আমাত্যগণ সহ সুসজ্জিত হস্তীর উপর হাওদায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন, আর তাঁহাদের সম্মুখে সহস্র সহস্র লোকের জনতা। মধ্যে মধ্যে প্রহরীগণ বেত্রাঘাতে জনতার শান্তি রক্ষা করিতেছে। রঙ্গস্থলে জ্বলন্ত মশাল হস্তে যোদ্ধৃগণ রণমদে উন্মত্ত। দর্শকগণ অধিকাংশই হিন্দুস্থানী। আমরা অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সুতরাং আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম না। প্রত্যাগমন কালে দুইখানি এক্কা মিলিল —এক্কা দুইখানিরই অবস্থা শোচনীয়, ঘাসের বস্তার উপর বসিবার আসন ও ছত্রি প্রভৃতি কিছুই নাই, কষ্টে সৃষ্টে একরূপে উপবেশন করিয়া ধুলি ভোগ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে আসিয়া আমাদের বজরায় পৌঁছিলাম। বজরার ছাদে আমরা কেহ শুইয়া কেহ বসিয়া পড়িলাম। উপরে অনন্ত নীল নভোমণ্ডলে তারকারাজি ঝক্ মক্ করিতেছে, নিম্নে গঙ্গাবক্ষে তাহার প্রতিবিম্ব তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে যেন আমাদের সাথে ছুটিয়াছে। দূরে—অতি দূরে সানাইয়ের সুমধুর আলাপ হইতেছে, তাহার ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ স্বর কখন কখন আমাদের কর্ণে আসিয়া পৌঁছিতেছে। অনতিদূরে এক খানি পান্‌সী হইতে গজল্ শুনা যাইতেছিল হঠাৎ থামিয়া গেল। বজরার ক্ষেপনি নিক্ষেপের শব্দ ছাড়া আর যেন সব নিস্তব্ধ। সহরের কোলাহল যেন নিমেষে থামিয়া গিয়াছে, যেন প্রকৃতিদেবী কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছেন। মনে হইতেছে যেন সেই আকাশ, নদী ও সেই বজরা ভিন্ন জগৎ সংসারে আর কিছু নাই, যেন সব বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা যেন অনন্তের উদ্দেশে, কোন্ অনির্দ্দিষ্ট পথে, কোন্ ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল প্রভাবে কোথায় পরিচালিত হইতেছি। আমাদের ইচ্ছাশক্তি, কার্য্যশক্তি, বাক্-শক্তি কে যেন হরণ করিয়াছে—আমরা নির্ব্বাক্ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া অনন্তের মহিমায় বিভোর হইয়া রহিয়াছি। অধিকক্ষণ কিন্তু এ ভাব থাকিল না। চারুবাবুর সঙ্গীতানুরাগ হঠাৎ উথলিয়া উঠিল—তিনি গান ধরিলেন—তিনি অবশ্য সুগায়ক নহেন, গানেরও কোনও বিশেষত্ব ছিল না—কিন্তু তবু তিনি গান করিতে ছাড়িলেন না—নদী অম্বর কাঁপাইয়া, অনন্ত নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া, তাঁহার স্বর লহরী উঠিল, নামিল, আবার উঠিল, আবার নামিল,



ক্রমে থামিয়া গেল—সকলের মনে কেমন একটা অপূর্ব্ব ভাব আনিয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমরা ক্রমে আমাদের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম।

বলিতে ভুলিয়াছি, যাইবার সময় চৈৎসিং, ওয়ারেন হেষ্টিংসের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য গঙ্গাতীরে যে দ্বার দিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়াছিলাম। গঙ্গার উপর গৃহ প্রাচীরে লর্ড কার্জ্জনের অনুকম্পায় সেই পলায়ন বার্ত্তা একখানি শ্বেত মর্ম্মর ফলকে খোদিত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে।

পরদিন বিজয়াদশমী। আমরা সারনাথ দেখিয়া দশমীর বাচ্‌খেলা দেখিব স্থির করিলাম। সকাল সকাল আহারাদি করিয়া আমরা রওনা হইলাম। বলিতে ভুলিয়াছি—একদিন আমাদের আর একজন সঙ্গী জুটিয়াছিলেন—চারুবাবুর বন্ধু, সুতরাং আমাদেরও বন্ধু, বর্দ্ধমানের উকীল বাবু ভুপেন্দ্রনাথ ঘোষাল। তিনি তাঁহার আত্মীয় কৃষ্ণবাবুর বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন। কথা স্থির হয়—আমরা তাঁহার বাসা হইতে তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া যাইব। আমরা তথায় গিয়া দেখিলাম, ভুপেনবাবু গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছেন, তখনও প্রত্যাগমন করেন নাই। কাজেই অপেক্ষা করিতে হইল। এদিকে আমাদের সহিত আলাপ করিবার জন্য গৃহস্বামী বৈঠকখানায় আসিলেন—ভুপেনবাবুও সেই সময় আসিয়া পৌঁছিলেন এবং আমাদের সহিত গৃহস্বামীর পরিচয় করিয়া দিতে যাইতে-ছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই আমরা পরস্পরকে চিনিতে পারিলাম। গৃহ-স্বামী আমাদের সুপরিচিত অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার রায় বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় নয় বৎসর পরে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। আফগান যুদ্ধের সময় কিরূপ বিপদ মস্তকে করিয়া তাঁহাকে শত্রু মধ্যে অশ্ব চালনা করিয়া পার্ব্বত্য পথে যাইতে হইয়াছিল—এবং কতবার কত বিপদসঙ্কুল স্থানে ভগবান তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন তিনি তাহা একে একে গল্পচ্ছলে বলিতে লাগিলেন। সেই সকল কৌতুকোদ্দীপক কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমরা রোমাঞ্চিত ও বিস্মিত হইলাম। দেশ কাল পাত্র ভুলিলাম—সারনাথ যাত্রার কথা বিস্মৃত হইলাম, আমরা তখন কল্পনানেত্রে পার্ব্বত্য জাতির সহিত সংঘর্ষের ভীষণ

চিত্র দেখিতে লাগিলাম—সহসা ভূপেনবাবু আসিয়া আমাদের কল্পনা ভাঙ্গিয়া দিলেন। কৃষ্ণবাবু যখন গল্প করিতেছিলেন, ভূপেনবাবু সেই অবসরে আহারাদি সারিয়া আসিয়া সারনাথ যাইবার জন্য আমাদিগকে তাগিদ দিতেছিলেন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কৃষ্ণবাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। আমরা ক্যান্টোন্‌মেণ্ট্ ষ্টেশনে আসিয়া শুনিলাম শীঘ্রই সারনাথের ট্রেন ছাড়িবে। তাড়াতাড়ি টিকিট করিলাম—কিন্তু ট্রেন আর ছাড়ে না। ব্র্যাড্‌শ কিনিয়া দেখি, ট্রেন ছাড়িতে তখনও দেড়ঘণ্টা বাকী, আর ফিরিবার ট্রেন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুতরাং বিজয়া দশমীর বাচ্‌খেলা দেখার আশা ত্যাগ করিতে হইবে। আমরা অগত্যা টিকিট ফেরৎ দিতে গেলাম—হিন্দুস্থানী বুকিং ক্লার্ক টিকিট ফেরৎ কিছুতেই লইবে না, আমরাও নাছোরবান্দা, শুধু শুধু রেল কোম্পানীকে আক্কেল সেলামী দিব কেন? কাজেই বড় সাহেবকে বলিয়া টিকিট ফেরৎ লওয়াইলাম। তারপর একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী করিয়া সারনাথ উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। গাড়ী খুব দ্রুতবেগেই ছুটিল। আমরা একঘণ্টার মধ্যে সারনাথে আসিয়া পৌছিলাম। পথে যাইতে যাইতে সারনাথ ষ্টেশন দেখিলাম, ষ্টেশনটি ক্ষুদ্র। আমাদের গন্তব্য স্থান হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। পথে কয়েকটী ভগ্নস্তম্ভ বা স্তূপ দেখিলাম। সে সকল অতিক্রম করিয়া বৌদ্ধকীর্ত্তি প্রাচীন সারনাথের দ্বারের নিকট গাড়ী আসিয়া থামিল। আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া কয়েকটী সোপান অতিবাহন করিয়া একটী চত্বরে প্রবেশ করিলাম। তথায় একটী বহু শাখা ও কাণ্ডে পরিপূর্ণ প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ দেখিলাম। বট বৃক্ষটী কত দিনের তাহার অবশ্য কোনও নিদর্শন নাই, তবে নিতান্ত অল্প দিনের নয় সেটা স্থির। বটবৃক্ষটির সন্নিকটে প্রাচীর বেষ্টিত একটী এক-তল ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী রহিয়াছে, তাহার দ্বার তালা দ্বারা আবদ্ধ, তথায় জনপ্রাণীও উপস্থিত ছিল না, সুতরাং তাহার অভ্যন্তরে কি আছে না আছে তাহা আজিও জানিতে পারি নাই।

চত্বর পার হইয়া আমরা জগৎ বিখ্যাত সারনাথ স্তূপের নিকট উপস্থিত হইলাম। সুবৃহৎ স্তূপটী প্রস্তর এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক খণ্ডে গ্রথিত। ইষ্টক-



গুলি অনেক স্থানে খসিয়া পড়িয়াছে, স্তম্ভ শিরে ও গাত্রে তৃণ গুল্মাদি জন্মিয়াছে। স্থানে স্থানে নূতন প্রস্তরও বসান হইয়াছে। ২।১ খানি প্রস্তর সোনালি রং করা। স্তম্ভটীর উচ্চতা ও পরিধি আমরা সঠিক নির্ণয় করি নাই—সে সময় আমাদের ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিব এরূপ কল্পনা থাকিলে অবশ্যই করিতাম। স্তূপটী বহুদূর হইতে নয়ন পথে পতিত হয়। দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া কালের কঠোর নিষ্পেষনে নিষ্পেষিত হইয়া কত ভূমিকম্পে দোদুল্যমান হইয়া, কত ঝঞ্ঝাবাত ও বারিবর্ষণ মস্তকে পাতিয়া লইয়া, আজিও স্তূপটী বৌদ্ধ কীর্ত্তির অতীত সাক্ষী স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

আমরা কয়েকবার স্তূপটী প্রদক্ষিণ করিলাম। প্রদক্ষিণ করিতে করিতে আমাদের কত কথা মনে পড়িয়া গেল। কপিলবাস্তুর রাজকুমার—রাজা শুদ্ধদনের আদরের ধন—পতিপ্রাণা সাধ্বী গোপার জীবন সর্ব্বস্ব, ঊনত্রিংশ বর্ষের দিব্যকান্তি যুবা পুরুষ, ঘোর নিশীথে রাজ্যসুখ, সম্পদ, বিলাস বাসনা, অতুল বৈভব স্বেচ্ছায় পদদলিত করিয়া আকুল প্রাণে কিসের জন্য ছুটিয়াছেন? জরাজীর্ণ, মৃত মুমূর্ষু ও ভিক্ষুককে দেখিয়া তাঁহার চৈতন্যের উদয় হইয়াছে—মানব জীবনের অনিত্যতা ও অনিশ্চিয়তায় তাঁহাকে নিত্য পদার্থের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন? অনিত্য সংসারের মায়া, মোহ, মমতা ত্যাগ করিয়া তিনি কঠোর তপস্যায় রত হইলেন। সে কি ভীষণ তপস্যা! মার আসিয়া কত প্রলোভন দেখাইল, কত বিভীষিকা প্রদর্শন করিল—সিদ্ধার্থ ধীর, স্থির, নিশ্চল, অটল—কিছুতেই তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্য টলাইতে পারিল না। অবশেষে সিদ্ধার্থ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলেন। তিনি আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন। কামনার নির্ব্বাণ হইল, সুখের নির্ব্বাণ হইল, দুঃখের নির্ব্বাণ হইল। তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধ হইলেন।

বোধিদ্রুমে ষষ্ঠবর্ষ ব্যাপি অতি কঠোর তপশ্চরণের পূর্ব্বে উরুবিল্বগ্রামের উপবনে অবস্থিতি কালে পঞ্চজন সন্ন্যাসী শিষ্যভাবে তাঁহার সহিত মিলিত হন। বুদ্ধদেব এক্ষণে স্বয়ং মুক্ত—সেই মুক্তি বার্ত্তা জানাইয়া জগৎবাসীকে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইল। তিনি বোধিদ্রুমের আশ্রয়

হইতে বহির্গত হইয়া পুণ্যধাম বারাণসীর অদূরবর্ত্তী সারনাথে আসিয়া তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ শিষ্যকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার ষষ্টি সংখ্যক শিষ্য হইল। তিনি তাঁহাদিগকে মুক্তি বার্ত্তা প্রচার করিবার জন্য আদেশ দিলেন। সদ্দৃষ্টি, সৎসঙ্কল্প, সদ্‌বাক্য, সদ্ব্যবহার, সদুপায়ে জীবিকার্জ্জন, সচ্চেষ্টা, সৎস্মৃতি, সম্যক্ সমাধি—এই অষ্টবিধ উপায়ে মানব ধর্ম্মমার্গে অগ্রসর হইতে পারে। মুক্তি মানবের স্বকৃত কর্ম্মের ফল। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সকল জীবনেই মানব স্বীয় পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে—পাপ মাত্রেরই দণ্ড ও পুণ্য মাত্রেরই পুরস্কার আছে—কেহই কর্ম্মফল খণ্ডন করিতে পারেন না। বর্ত্তমান জন্মের সুখ দুঃখ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল এবং বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মফল ভাবি জন্মের সুখ দুঃখের কারণ হইবে। ক্রিয়া শুদ্ধি দ্বারা পুনর্জ্জন্ম হইতে পরিত্রাণের উপায় করাই মানবের কর্ত্তব্য। যখন পাপ বিলুপ্ত হইয়া জীবন পুণ্যময় হইবে তখন মৃত্যুর পর শরীরান্তর গ্রহণ করিয়া আর দৈহিক যন্ত্রনা ভোগ করিতে হইবে না। এই অবস্থাই নির্ব্বাণ। এ অবস্থায় রাগ, দ্বেষ, স্নেহ, মায়া প্রভৃতি থাকে না, মনের সকল ভাবই চলিয়া যায়। অহিংসা, অস্তেয়, সুনৃত, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ—নিষ্পাপ জীবনের প্রধান লক্ষণ। এই সারনাথের মঠ বা বিহার হইতে এই মুক্তি বার্ত্তা বজ্রনিনাদে দিকে দিকে বিঘোষিত হইতে লাগিল। রাজ্যেশ্বরের সিংহাসন টলিল, দীন দরিদ্র ভিখারীর হৃদয় স্পন্দিত হইল—সকলে মুক্তি বার্ত্তা শুনিবার জন্য দলে দলে ছুটিয়া আসিতে লাগিল।

আমরা বৃহৎ স্তূপটী ত্যাগ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদের বড় আদরের জিনিষ, সদাশয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও সংরক্ষিত সারনাথে প্রাপ্ত, দ্বিসহস্রাধিক বর্ষের পূর্ব্বকার নানাবিধ দ্রব্য সম্ভার সুসজ্জিত দেখিলাম। আমরা বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলাম—দেখিয়া যেন আশা মিটে না, মনে হয় আবার দেখি। সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা কয়েক ঘণ্টার কাজ নয়। কোন্‌টা ফেলিয়া কোন্‌টা দেখি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। মোটামুটি যাহা দেখিয়াছি তাহার পরিচয় দেওয়াও এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবে না। নানাবিধ প্রস্তর মূর্ত্তি দেখিলাম—বুদ্ধমূর্ত্তি তো



থাকিবেই, তা ছাড়া নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি ও পশ্বাদির মূর্ত্তিও আছে। সবগুলি পূর্ণাঙ্গ নহে, কোনও না কোনও অঙ্গহানি হইয়াছে। সুনিপুণ ভাস্করের হস্তে কঠিন প্রস্তরও কিরূপ নবনীবৎ কোমল ও আজ্ঞাবহ হইয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে বস্তুতই বিস্মিত হইতে হয়। বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি যেন দেব ভাবের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি, দৃষ্টিমাত্রেই ভক্তি আকর্ষণ করে। কোথাও রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি, কোথাও শ্রীরামচন্দ্র ও হনুমানের মূর্ত্তি, কোথাও বা অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি রহিয়াছে, কোথাও বা নৃত্য গীত হইতেছে। এইরূপ কত দৃশ্য কঠিন প্রস্তরে আলেখ্যবৎ অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রত্যেক প্রস্তর খণ্ডে দুই সহস্রাধিক বর্ষের পূর্ব্বকার ইতিহাসের উপকরণ সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা হইতে কত নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

একখানি অতি বৃহৎ প্রস্তরে রাশি চক্র সুন্দরভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। কতকগুলি বৃহৎ মানবাকারের প্রস্তর মূর্ত্তি রহিয়াছে, সম্ভবতঃ প্রহরীর প্রতিমূর্ত্তি। দশ হস্তে দশ প্রহরণ লইয়া হনুমানের ন্যায় বৃহদাকার মূর্ত্তি রহিয়াছে। আরও কত যে মূর্ত্তি দেখিলাম তাহার সংখ্যা নাই। কোথাও মুকুটধারিণী দেবী বা মানবী মূর্ত্তি, কোথাও সালঙ্কৃতা রমণী প্রসাধনে নিযুক্তা রহিয়াছে—তাহার নিটোল গঠন, সুচারু কেশ বিন্যাস, অঙ্গের ভঙ্গী পুরাকালের সুদক্ষ শিল্পীর পরিচয় দিতেছে। দুই একটী মূর্ত্তি এমন সুন্দর ভাবে অঙ্কিত যে মনে হয় বুঝি বা প্রস্তরে এত সূক্ষ্ম শিল্প সম্ভবে না—মোমের উপর যদৃচ্ছাক্রমে অতি সন্তর্পণে সেগুলি অঙ্কিত হইয়াছে। প্রাঙ্গনে কত রকমের, কত আকারের, কত কারুকার্য্যময় বিচিত্র প্রস্তর খণ্ড ইতস্ততঃ রক্ষিত হইয়াছে। নানাবিধ জীব জন্তুর প্রতিকৃতি দেখিলাম, কোনটী হস্তহীন, কোনটী পদহীন, কোনটী লাঙ্গুল হীন, কোনটী বা নাসিকা কর্ণ হীন, অনেক জন্তু অদ্ভুত রকমের বোধ হইল। হইতে পারে বহুকাল পূর্ব্বে সে সব জন্তু বিদ্যমান ছিল, কালক্রমে ইহসংসার হইতে তাহারা বিলুপ্ত হইয়াছে। একটী অদ্ভুত সিংহ মূর্ত্তি দেখিলাম, পূর্ণাঙ্গ নহে—মস্তকের কতকাংশ ভগ্ন হইয়াছে—এরূপ মসৃণ ও নিখুঁত পশু মূর্ত্তি আর দেখিয়াছি কিনা স্মরণ হয় না। দেহের সকল অংশই সুগঠিত—শিল্পীর দক্ষতা প্রত্যেক অঙ্গেই সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন্‌টী রাখিয়া কোনটীর

বর্ণনা করিব—কল্পনানেত্রে একে একে সকলগুলিই চক্ষের সমক্ষে প্রতিভাত হইতেছে—পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

এনামেলে ও পোর্সিলেনের মত পালিশ করা কত দ্রব্য দেখিলাম। সে কালের দ্বিচক্র গোযান, সুবৃহৎ জলাধার বা মাটীর জালা রহিয়াছে, সেগুলি ফাটিয়া গিয়াছিল, রজ্জু সাহায্যে সুরক্ষিত হইয়াছে। হাঁড়ি, সরা, কলসী, দীপাধার, চারুশিল্পপূর্ণ ইষ্টক, সবই প্রায় নূতন। এত কালের জিনিষ—অথচ কেমন সুন্দর অবস্থায় রহিয়াছে। ঔষধ মাড়িবার সুবৃহৎ খল, ধাতু গলাইবার যন্ত্র, আরও কত কি রহিয়াছে, সকলগুলির নামই জানি না, তা বর্ণনা করিব কি?

এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম—কার্ত্তিক মাস হইলেও দিবা দ্বিপ্রহরে মার্ত্তণ্ড তাপে চতুর্দ্দিক অগ্নিবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল—তৃষ্ণায় কণ্ঠ ও তালু বিশুষ্ক, আরামপ্রিয় বাঙ্গালী আর কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? আমরা অদূরে বৃক্ষ ছায়ায় বিশ্রাম করিতে গেলাম। জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশয় আজ রবিবার বলিয়া অনাহার করেন নাই—তিনি তো গাত্রবস্ত্র বিছাইয়া নিম্ববৃক্ষতলে তৃণ শয্যায় শয়ন করিলেন। ভূপেনবাবুও তাঁহার পন্থানুসরণ করিলেন—কতকগুলি সজ্জিত ইষ্টকের উপর বসিয়া থাকিলাম, আমি ও চারুবাবু। বৃক্ষতলে মন্দ মন্দ সুস্নিগ্ধ বায়ু বহিতেছিল, তাহাতেই কতকটা শ্রান্তি দূর হইল—আমি উঠিয়া পড়িলাম। আর কেহ আমার সঙ্গী হইতে চাহিলেন না—ভূপেনবাবু তো স্পষ্টই বলিলেন, যাহা দেখিবার, যথেষ্টই দেখিয়াছি—আর এ রৌদ্রে কষ্ট ভোগ করিয়া কাজ নাই। আমি কিন্তু স্থির থাকিতে পারিলাম না।

যে সকল বিহার ও মঠ যুগ যুগান্তর ধরিয়া লোক লোচনের বহির্ভূত হইয়া মৃত্তিকান্তরালে সমাহিত ছিল, প্রত্নতত্ত্ববিদের কৃপায়, মহানুভব ইংরেজ রাজের সদাশয়তায়, আবার তাহা কত শতাব্দী পরে জগতের সমক্ষে পূর্ণ গৌরবে প্রকাশিত হইয়াছে। মা বসুমতী যক্ষের ধনের মত সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কত সযতনে ভারতের অতীত গৌরবের সাক্ষী স্বরূপ শিল্প, কলাবিদ্যা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতির চরমোৎকর্ষের আদর্শ সকল বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন—আজ সেই অমূল্য দ্রব্য সম্ভার তাঁহার উপযুক্ত সন্তান-



গণকে উপহার দিয়া যেন নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি ভূপ্রোথিত প্রকোষ্ঠগুলি দেখিতে লাগিলাম। অধিকাংশ প্রকোষ্ঠই চতুষ্কোন ও ক্ষুদ্র এবং সমতল ভূমির অনেক নিম্নে অবস্থিত বলিয়াই অনুমিত হইল। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণগণ এই সকল প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন। গৃহগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক ও প্রস্তরে নির্ম্মিত, দ্বারগুলি প্রায়ই কারুকার্য্যময় প্রস্তর খণ্ডে বিনির্ম্মিত। বৃত্তাকারের বৃহৎ প্রকোষ্ঠও দেখিলাম, বোধ হয় তাহা মঠের সম্মিলন গৃহরূপে ব্যবহৃত হইত। ধর্ম্মপোদেষ্টা বা আচার্য্যগণ বেদীতে উপবেশন করিয়া ধর্ম্মালোচনায় বা জ্ঞানালোচনায় এ স্থানে কত সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। কত নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া কত সাধকের সাধন পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

কয়েকটী সুবৃহৎ গোলাকার ভগ্ন স্তম্ভ বা থাম দেখিলাম। স্তম্ভগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত—কিন্তু কেমন সুন্দর ও মসৃণ। আজকালকার এনামেল পেণ্টের ইহার সহিত তুলনাই হয় না। এখনও ঝক্ ঝক্ করিতেছে, যেন সদ্য নির্ম্মিত হইয়াছে—কাঁচের স্তম্ভ বলিয়া ভ্রম হয়। এরূপ সুন্দর সুগঠিত সুবৃহৎ স্তম্ভ কি উপাদানে গঠিত হইয়া সহস্র সহস্র বৎসর কালের সর্ব্বধ্বংসী প্রকৃতি উপেক্ষা করিয়া চিরনবীনতা লাভ করিয়াছে—ইহা কম বিস্ময়ের বিষয় নহে। আমি এই সকল দেখিয়া বেড়াইতেছি, জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশয় আসিয়া আমার সহিত যোগদান করিলেন। প্রত্যাগমন কালে দেখি ভূপেনবাবু ও চারুবাবু আমাদের দিকে আসিতেছেন।

আমরা এইবার প্রত্যাগমন করিবার জন্য এই সকল ভগ্ন স্তূপের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। এই বিহারটীর কতকাংশ মাত্র ভূ-গর্ভ হইতে খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে। এখনও বহুদূরব্যাপী মৃত্তিকা স্তূপ রহিয়াছে, সেগুলি উদ্ধার করিলে না জানি কত অমূল্য, কত অজানিত দ্রব্য সকল আবিষ্কৃত হইবে, কত প্রাচীন কৌতুকোদ্দীপক তথ্য জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত হইবে। বিহারটী পরিখা বেষ্টিত ছিল, এখনও পরিখার কতকাংশ জলে পরিপূর্ণ দেখিলাম—সেকালের সুগভীর কূপও দেখিলাম।

সারনাথে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি দস্তুর মত সুসজ্জিত ভাবে রক্ষা করিবার জন্য

গবর্ণমেণ্ট স্তূপের সম্মুখে রাস্তার পর পারে একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতেছেন। অট্টালিকা নির্ম্মিত হইলে এই সকল দ্রব্য তথায় স্থানান্তরিত করা হইবে।

সারনাথ আধুনিক নাম, সম্ভবতঃ শিবলিঙ্গ সারনাথের নামে স্থানটীর নামকরণ হইয়াছে। বৌদ্ধযুগে ইহার নাম ছিল মৃগদাব।

বৌদ্ধ সারনাথের নিকট বিদায় লইলাম। এবার হিন্দু সারনাথাভিমুখে চলিলাম। সে দিকে পাকা রাস্তা নাই সুতরাং গাড়ী গেল না। আমরা পদব্রজেই যাত্রা করিলাম। এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া একটী পর্ব্বতাকার মৃত্তিকা স্তূপের উপর সারনাথের মন্দির দেখিলাম। মন্দিরের পূরোভাগে একটী ক্ষুদ্র সরোবর। আমরা কয়েকটী সোপান অতিক্রম করিয়া মন্দিরে উঠিলাম। সারনাথ ও তাঁহার ভ্রাতাকে দর্শন করিলাম। উভয়েই শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি। আমরা মন্দির হইতে অবতরণ করিয়া মুখ হাত ধুইলাম। আমরা পিপাসায় কাতর হইয়াছিলাম কিন্তু সেই পুষ্করণীর জল পান করিতে সাহস করিলাম না। তারপর সেই প্রখর রৌদ্রে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে মাঠ অতিক্রম করিয়া আবার সারনাথ স্তূপের নিকট আসিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। ক্রমে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। তারপরই আবার বিজয়া দশমীর বাচ্ খেলা দেখিতে গঙ্গাতীরে গিয়া উপনীত হইলাম।

বাচ্খেলার কিছু বিশেষত্ব দেখিলাম না। আশৈশব বিজয়া দশমীর দিন আমাদের বাস গ্রামের গঙ্গাবক্ষে বাচ্খেলা দেখিয়া আসিতেছি। যদিও দিন দিন লোকের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নির্জ্জীব হইয়া আসিতেছে, প্রতিমার সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, লোকে কাল ম্যালেরিয়াতে জর্জ্জরিত, নানাবিধ রোগে ও শোকে প্রপীড়িত এবং ভীষণ জীবন সংগ্রামে পর্য্যুদস্ত, তথাপি বিজয়া দশমীর স্ফূর্ত্তির ও উৎসাহের যে সজীব চিত্র আমার মানস ক্ষেত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে তাহার সহিত তুলনায় পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছিলাম না। যাহাহৌক ক্রমে সন্ধ্যারতি হইয়া গেল। বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে প্রতিমাগুলিকে একে একে গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত করিল। আমরাও মা আনন্দময়ীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শূন্য হৃদয়ে নিরানন্দ মনে বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।



পর দিন একাদশী। চারু বাবু চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে বিদায় দিয়া আমরা অসীসঙ্গমে গমন করিলাম। অসী একেবারেই মজিয়া গিয়াছে, নদীর চিহ্ন মাত্র নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অসী বিলুপ্ত হইলেও অসীসঙ্গমের মাহাত্ম্য যাইবে কোথা? দলে দলে নর নারী আসিয়া অসীসঙ্গমে অবগাহন স্নান করিয়া যাইতেছে। অসীসঙ্গম যাঁহার ধর্ম্ম প্রভায় আজিও সমালোকিত, সেই মহাপুরুষের শ্রীচরণ দর্শন করিতে গেলাম। যাঁহার চরণতলে বসিয়া ভাস্করানন্দ স্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, সেই সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, ত্রিকালদর্শী, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষকে দর্শন করিলাম। তিনি অধিকাংশ সময়ই যোগাসনে বসিয়া থাকেন। তিনি তাঁহার সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠেই ছিলেন। আমরা গিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলাম। তিনি মৃদু হাস্য করিতে করিতে আমাদের কুশলাবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই মৃদু হাস্যে যেন স্বর্গীয় আভা স্ফূরিত হইতে লাগিল, তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি যেন স্বর্গীয় জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। তাঁহার চরণ যুগল টুক্ টুক্ করিতেছে, যেন অলক্তক রাগে অনুরঞ্জিত। তাঁহার আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল বক্ষ, প্রশস্ত ললাট, গৌরবর্ণ, সৌম্য মূর্ত্তি, ব্রাহ্মণ্য তেজে তেজোময় ও সুন্দর স্বাস্থ্যের আকরস্বরূপ। তাঁহার বয়সের ইয়ত্তা নাই। শত বর্ষ তো বহু কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে অথচ মুক্তাবিনিন্দিত দশন পংক্তিদ্বয় এখনও অটুট রহিয়াছে। আমাদের বহুভাগ্য যে ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার করুণাকণা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এত বয়স হইয়াছে—এত বড় পণ্ডিত অথচ কেমন শিশুর ন্যায় সরল। তাঁহাকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই তাঁহার মাহাত্ম্য অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মনে হয় যেন তিনি আত্ম প্রকাশ করিতে সমুৎসুক নহেন। যাঁহারা তাঁহার নিকট দুদণ্ড অবস্থান করিয়াছেন, তাঁহারাই মুগ্ধ হইয়াছেন। কত অশীতিপর বৃদ্ধ দেখিলাম, থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে লাঠী ধরিয়া বহু কষ্টে আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। কত মহা মহা পণ্ডিত আসিয়া শাস্ত্রের কূটার্থ বুঝাইয়া লইয়া যাইতেছেন। অসী সঙ্গমের সেই মহাপুরুষের নাম অনেকেই অবগত আছেন—আবার অনেকে নাও জানিতে পারেন। তাঁহার নাম শ্রীমৎ পণ্ডিত অনন্তরাম মিশ্রজী। আমরা

তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

কয়েকদিন পরে জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশয় তথা হইতে চলিয়া আসিলেন। আমি আরও কিছু দিন থাকিয়া গেলাম। এ কয়েক দিন অবশ্য বাসায় বসিয়া ছিলাম না। কেবল ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। এত ঘুরিয়াছি, এত দেখিয়াছি, অথচ মনে হইতেছে এখনও দেখিতে অনেক বাকী আছে। যাহা দেখিয়াছি, তাহার বর্ণনা করা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবে না। কেবল বিশ্বেশ্বরের আরতি বর্ণনা করিতে গেলে একটী প্রবন্ধ লিখিতে হয়। এরূপ সুন্দর দৃশ্য যিনি দেখিয়াছেন তিনিই বিমোহিত হইয়াছেন। যখন শত শত ভক্তকণ্ঠ-বিনির্গত শিব শম্ভু, শিব শম্ভু রবে দিগন্ত প্রকম্পিত হয়, যখন স্তাবকগণ সমস্বরে স্তোত্র গান করিতে করিতে আরতি করিতে থাকেন, চামর ব্যজনকারীগণ ভাবে ভোর হইয়া তালে তালে নৃত্য করিতে থাকেন, তখন মনে হয় বুঝি আমরা মর লোকে নাই, কোন্ অজানিত লোকে বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের মহারতি দেখিতেছি। মন এক অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হইয়া যায়।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবক সন্ন্যাসীগণ যেরূপ দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া নিঃস্বার্থভাবে সেবাশ্রম পরিচালনা করিতেছেন, তাহা বস্তুতই প্রশংসার যোগ্য। কাশীধামের মত স্থানে এরূপ মহদানুষ্ঠানের কার্য্যক্ষেত্র যাহাতে আরও বিস্তৃত হয়, ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রায় একমাস কাশীধামে অবস্থানের পর আবার মধুপুর প্রবাসে প্রত্যাগমন করিবার জন্য ট্রেনে উঠিলাম। যখন সেতু পার হইতেছিলাম, তখন মন যেন অবসাদে পূর্ণ হইতেছিল, আন্তরিক কষ্ট বোধ হইতেছিল। এ হেন পুণ্যধাম ত্যাগ করিতে কাহার প্রাণে আঘাত না লাগে? অন্ধকার রজনী কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না, অথচ কত আগ্রহের সহিত চলন্ত ট্রেনের পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া দুরে পর্ব্বতসদৃশ ঘাটশ্রেণীর আবছায়া দেখিতে দেখিতে অপর গারে গিয়া উপনীত হইলাম। আবার মোগলসরাই ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেন বদল করিলাম। বেনারাস হইতে ট্রেন ছাড়িতে



অর্দ্ধঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল, যখন আউদ রহিলখণ্ড ট্রেন মোগলসরাই আসিয়া পৌছিল, তখন ই, আই, আর ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে, তাড়াতাড়ি ছুটাছুটি করিয়া একটী কামরা দখল করিলাম। সৌভাগ্যের বিষয় সে কামরায় যে কয়েক জন যাত্রী ছিলেন পরের ষ্টেশনে নামিয়া গেলেন। অপর কেহ উঠেন নাই সুতরাং বেশ আরামেই আসিলাম। অবশ্য ভাল নিদ্রা হয় নাই। প্রাতে প্রায় ১০টার সময় ট্রেন আসিয়া মধুপুর ষ্টেশনে পৌছিল। আমিও নামিয়া পড়িলাম। দেখি জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশয় এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন ষ্টেশনে উপস্থিত রহিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত বাসায় গিয়া পৌছিলাম।

# সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্।

[ ৬ ]

বিদেশ বিভূমিতে বিপদে পড়িলে সময়ে সময়ে একটু গরম হইতে হয়। হইলে কাজ পাওয়া যায়। ছোবলাইতে হয় না কেবল ফোঁস করিলেই হয়। মাদুরার ষ্টেশন রক্ষকের ইচ্ছা ছিল তিনি কিছুতেই আমাদিগকে অতক্ষণ ধরিয়া বিশ্রামের ঘরে থাকিতে দিবেন না। আমরা উপায়ান্তর না দেখিয়া শেষে গরম হইয়াছিলাম। তিনি ভয় পাইলেন অথচ আমরা যুক্তিগর্ভ বচন শুনাইলাম। সঙ্গে লট্‌বহর, বিদেশী হইলেও পদমর্য্যাদা আছে, ছোট লোক নহি। হাইকোর্টের সঙ্গে যাহার সংস্রব আছে তাহার কথায় বিশ্বাস করা যাইতে পারে অনর্থক কেন একজনকে কষ্ট দেওয়া তোমাদেরই রেলে এক সপ্তাহ ধরিয়া ভ্রমণ চলিবে তোমরা ভদ্র ব্যবহার না দেখাইলে কোথা যাইব? ইত্যাদি ইত্যাদি।

শেষ টের পাইয়াছিলাম এতটা গোলযোগের কর্ত্তা কেবল মেথর মহাশয়। তিনি মুরুব্বী ধরেন সাহেবের চাপরাসীকে, তারপর ফিরিঙ্গী, পর্ত্তু-

গীজ, তারপর ছোট সাহেব ইত্যাদি। যাহাহৌক শেষে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য স্বরূপ রজত খণ্ড দক্ষিণা দেওয়ায় আমাদের শ্রাদ্ধীয় কার্য্য ঠিক সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

রাত্রি ২৷৷০টার সময় গাড়ী আসিল। মোট লইয়া বিপদ। গাড়ীতে এত ভিড় যে তিল ধরিবার স্থান নাই। কে কর্ত্তা বুঝি না। একজন বলে ১ম শ্রেণীতে যাও। কেহ বলে এ গাড়ীতে যাইতেই পাইবে না। কেহ বলিলেন তৃতীয় শ্রেণীতে যাও। রিজার্ভ করিতে চাহিলাম—পাইলাম না। অনেক খিঁচুনী শান্তভাবে আহার করিয়া ১টা ফার্ষ্ট ক্লাশে উঠিয়া বসিলাম। সেখানেও ভিড়—আমাদের মত ২য় শ্রেণীর যাত্রীরাও আসিয়া বসিয়াছেন—বেশী ভাড়া দিতে প্রস্তুত। ইতোমধ্যে একজন আসিয়া বলিল কিছু হুইসকীর জন্য যদি খরচ করিতে পারেন তবে আর নাড়ানাড়ি করিতে হইবে না। আমি অস্বীকার করিলাম। ক্ষণকাল পরে একজন সাহেব আসিয়া আমাদিগকে নামিতে অনুরোধ করিলেন। অধিক লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। আমরা নামিয়া ২য় শ্রেণীতে গেলাম। মোট সব ১ম শ্রেণীতে রহিয়া গেল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কষ্টের অবধি নাই। বসিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া রাত্রি কাটাইলাম। ভোরে মিনাচী ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। ২য় শ্রেণীতে এত ভিড় হইল যে প্রাণ যায়। আমরা উঠিয়া ১ম শ্রেণীতে গেলাম সেখান প্রাতঃকৃত্য সারিতেছি এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া আপত্তি করিল। ইসারায় সেই একই কথা বলে। আমরা বিরক্ত হইয়া অনেক অনুসন্ধানের পর একটী ভাল গাড়ী পাইলাম। তখনই শুনিলাম নূতন গাড়ী আসিবে। হা অদৃষ্ট কিছুতেই সুখ নাই। নূতন গাড়ী আসিল সেই গাড়ীতে চাপিয়া টিনিভেলী আসিয়া পঁহুছিলাম।

ষ্টেশন প্লাটফরমে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া মোট ঘাট রাখিলাম। আবশ্যকীয় বস্ত্রাদি লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তায় আসিয়া একজন ছাত্রের সঙ্গে দেখা হইল, তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে টিনিভেলী আসিয়াছেন, শীঘ্রই পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। ইহাদের বাসা আছে, তার নিকটবর্ত্তী একটী হোটেলে আহার করেন। বালকটী একটী আদর্শ বালক। ছেলে ভাল। শান্ত। তাঁহাকে আমরা ছাড়িলাম না। সুবক



আমাদিগকে হোটেলে লইয়া গেল। আমরা কি রাঁধিতে হইবে ফরমাস করিলাম। হোটেলের লোকে হাঁসিতে লাগিল। আমরা বলিলাম হাঁস আর যাই কর এইরূপ—যেরূপ বলিতেছি—রাঁধিয়া দাও, দ্বিগুণ মূল্য দিব। আর ঘৃত বেশী চাই, দুধ দধি বেশী চাই। লাউ রাঁধিতে দিলাম। ইত্যাদি। রান্না চাপিয়া গেল। আমরা নদীতে অবগাহন স্নান করিতে অগ্রসর হইলাম। রাস্তায় বাহির হইয়াই দেখি—পূর্ব্বেও একটু দেখিয়াছিলাম—অপূর্ব্ব দৃশ্য। চতুর্দ্দিকে বারমেসে আম গাছ, গাড়ী গাড়ী বারমেসে আমের কলম ষ্টেসন অভিমুখে যাইতেছে। গাছের দিকে তাকাইয়া দেখি নানা জাতি আম—কোথাও বৌল, কোথাও কড়াই, কোথাও কসি, কোন শাখায় ঝোল খাইবার মত, কোন শাখায় রং ধরিয়াছে কোন শাখায় পক্কাবস্থা। দেখিয়া ভারী আমোদ হইল। আম অনেক বিদেশে চালান যাইতেছে। তবে স্বাদু বলিয়া আমরা মনে করি নাই। শ্রীমান হনুমান যত পারিয়াছিলেন আমের আঁটী রাবণের মধুবন হইতে ছুড়িয়া ছুড়িয়া ভারতবর্ষে ফেলিয়া ছিলেন। টিনিভেলী শেষ দক্ষিণ জেলা তার পরই ভারত মহাসাগর, তারপর লঙ্কাদ্বীপ, সুতরাং যত আমের আঁটী সব টিনিভেলিতেই পড়িয়াছিল। তবে শ্রীমান হনুমানচন্দ্র অমর বর পাইবার পূর্ব্বে কি পরে এই সকল আম ভারতে ছুড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ঠিক করিতে পারেন নাই। আসিয়াটিক মিউজিয়মে হনুমান ভক্ষিত আমের আঁটী রক্ষিত আছে কি না সে সংবাদ আমার জানা নাই।

টিনিভেলিতে এখন বর্ষাকাল, অনবরত বৃষ্টি পড়িতেছে। রাস্তা ঘাট সকলই কর্দ্দমাক্ত। আমাদিগকে দয়া করিয়া কেহ কেহ দেখাইয়া দিলেন এ বাড়ীটা কি ও বাড়ীটা কি? শ্রীযুক্ত চীদাম্বর পিলে কোথা দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন, কোথা দাঙ্গা হইয়াছিল ঐ সব স্থান স্থানীয় লোকের কথানুসারে জানিতে পারিলাম। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে এই চীদাম্বর পিলে টিউটিকরিণ বন্দরে স্বদেশী ষ্টীমার কোংপানি খুলিয়াছিল ও জাহাজে যাত্রী লইয়া সিংহল দ্বীপে যাওয়া আসা করিত। যাত্রী ছাড়া হারা পণ্ড বহন কার্য্যও করিত। তাহাতেই লাভ বেশী। সে সব কথায়

আর কাজ নাই। পিলে মহাশয় কাজ ভাল করেন নাই এখন তাঁহার পীলে চমকিত অবস্থাতেই আছে। তিনি এখন জেল খাটিতেছেন যত দূর মনে হয় যাবজ্জীবন কি কয় বছরের জন্য দ্বীপান্তর হইয়াছে।

বর্ষার জল স্থানে স্থানে রাস্তায় জমিয়া রহিয়াছে ঠিক যেন রক্ত। বর্দ্ধমানের রাঙ্গামাটী কোথা লাগে। রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে মনে হইল যেন বর্দ্ধমান সহরে বিচরণ করিতেছি। দুধারে বাড়ীতে বাড়ীতে উকিলের পরিচয় অমুক শ্রীযুক্ত অমুক এম এ এল্ এল্ বি হাইকোর্টের উকিল প্রত্যেক বাটীর বাহিরে বারান্দায় তিনটিস্তর তারপর রাস্তায় নামিবার সোপান। সোপানের পরই vendor ভেণ্ডর মহাশয় বাক্স খুলিয়া বসিয়া আছেন। পরের স্তরে মক্কেলবৃন্দ ও মুহুরী মহাশয়। প্রথম স্তরে স্বয়ং উকীল মহাশয় সুমুখে একটী ডেস্ক ও পুস্তকাদি সমাবৃত। দেখিতে দেখিতে বড় আমোদ হইল। একটু তফাতে মাঠে ধান রোয়া হইতেছে। অনেকটা আসিয়া আমরা নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নদীটি পার্ব্বতীয়—কেবল পাথরের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া যাইতেছে। হোঁচটের ভয়ে পা বাড়াইবার যো নাই। নদীর নাম তাম্রপুর্ণী জলের রং ঠিক তামা। নদীর মাঝে মাঝে আশে পাশে বড় বড় পাথরের স্তূপ। যেন বহু পুরাতন পাড়াগেঁয়ে পুকুরের পাকাঘাটের আগাগোড়া রাণাটা। দুই একস্থানে ডুবন জল অনেক স্থানেই নয়। মধ্যে মধ্যে সেই অল্প জলই মাথার মণি বলিয়া গা ডুবাইয়া সিন্ধুঘোটকের মত বসিয়া আছে ও মধ্যে মধ্যে জলের উপর নাক তুলিয়া তিমি বা তিমিঙ্গিলের মত ফোঁস ফোঁস করিয়া লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলিতেছে। রজকগণ স্বচ্ছন্দভাবে স্থানে স্থানে আপনার কার্য্য করিতেছে দেখিয়া একটু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম বটে কিন্তু চকিতে মোহ মুদ্গর কাটিয়া গেল। মনে হইল দেবী কন্যা কুমারী নিকট বটেন। কত বাগুলী কত চক্রে ফিরিতে পারে। কত বিট্‌লে চণ্ডীদাস বলিতে পারেন —

শুন শুন রজকিনী রামি।
ও দুটি চরণ, শীতল জানিয়ে
স্মরণ লইনু আমি॥

এদিকে নদীতীরে অসংখ্য তালবৃক্ষ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্দেশকে স্মরণপথে



আনিয়া দিতেছে। ওদিকে অমনই ঘাটে বসিয়া ভারত রমণীর সাবান মাখা দেখিয়া জয়দেবের বৃন্দাবন লীলা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। বিংশ শতাব্দীর কঠোর সভ্যতা সূর্য্যের আলোক নয়নে প্রতিফলিত হইতেছে।

সরকারী পাইখানা আছে। এটা লোকের বড়ই সুবিধাজনক ও যাহা বলিতেছিলাম—সেই সভ্যতানুমোদিত, ঘাটে বসিয়া তেল মাখিয়া স্নান করিলাম, তর্পণ করিলাম। দেখিলাম মান্দ্রাজ হু হু করিয়া অহিন্দু হইয়া আসিতেছে। সে কথা আমি আপনাকে এক কথায় বুঝাইতে পারি না। আমাদের সাথী মহাদেব আয়েঙ্গীর ছোকরাকে জিজ্ঞাসায় জানিলাম ঘাটে কেন তিনটি স্ত্রীলোক স্নান করিয়া কাপড় শুখাইতে বসিয়াছে। শুনিলাম উহারা ব্রাহ্মণী—তবে এখন চণ্ডালিনী—অর্থাৎ ঋতুমতী হইয়াছেন। সুতরাং কেহ ছোঁয়া নেপা করিবেন না। মহাদেব মুখে শুনিলাম ৩ দিন স্বামীর মুখ দেখা নিষেধ স্বামী মহাশয়ও স্ত্রীর মুখ দেখিবেন না। হায় ভারত বলিয়া হুতাশ করিবার আবশ্যকতা নাই। ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করুন। ইহা ভাই ত তোমাদেরই হাতে—সমাজ সংস্কার ত তোমাদেরই হাতে।

হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম আমরা খাব বলিয়া সে দিন তখন পর্য্যন্ত কেহই আহার করেন নাই। সুতরাং একেবারে প্রায় ৪০ জন পংক্তি ভোজনে বসিয়া গেলাম। আমার বন্ধু বলিলেন আমাদের অনারে—টিনিবেলী আমাদিগকে বান্‌কোয়েট দিতেছে। আমরা মঞ্জুর করিলাম তবে এই স্থির হইল আহারের পর স্পিচ হইবে।

যাহাহৌক আজ খাইয়া বাঁচিলাম। উহারই মধ্যে ব্রাহ্মণ কুমার—তাঁর জয় হৌক—বেশ সংযোগ করিয়াছেন দেখিলাম। মনে হইল যেন দেশে বসিয়া খাইতেছি। যাহাহৌক অন্নপূর্ণার কৃপায় আহারান্তে দুধ শর্করা ও পক্ক কদলীর ব্যবস্থা। দধিও ছিল।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

# স্মরণে।

কই কোথা প্রাণ নাথ
চেয়ে আছি তব পথ
কত দিন হ'ল গত
আজিও তো এলে না।

তব পথ চেয়ে চেয়ে
কত দিন গেল বয়ে
এই কি অগস্ত্য যাত্রা
কেন ফিরে এলে না ?

কত দিন কতবার
তীর্থ হেতু ঘর বা'র
হইয়াছ বারংবার
বিলম্ব তো হয় না।

তবে আজ বল কেন
এতই বিলম্ব হেন
কত দিন হৃদি তীর্থ
শূন্য রবে বল না ?

বুঝি সব দেবতায়
মিলি আজ একতায়
দেবের দুর্লভ সঙ্গ
ছাড়িতে হে চাহে না।

কিন্তু তারা শুধু দেব
তুমি মম দেব দেব
ত্যজিয়ে তাদের পূজা
মম তরে এস না।

কে কবে শুনেছে হায়
নাহি মায়া, দেবতায়
দাসীর কপালে বুঝি
আজ সকলি কেমন।

তুমি তো হে দয়াময়
তবে কেন বল হায়
না শুনিছ আজ তুমি
তব দাসীর রোদন।

ছাড়ি সে অমরাবতী
এস নাথ মম হৃদি
থাকুক যতই দেব
(সেথা) আছে নিঠুর শমন।

দেবতা নিঠুর যেথা
তব স্থান নহে সেথা
এস এস ছেড়ে এস
তাদের সদন
হ'ক সে অমরাবতী
দেবের ভবন।

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক।

---

# মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

এ বৎসর কালের সর্ব্বধ্বংসী ক্রোড়ে আর একজন মহারথী আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। গত বর্ষে মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের মৃত্যুতে আমাদের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ হওয়া দূরে থাকুক আর একটী উজ্জ্বল রত্ন ভারতমাতার কণ্ঠহার হইতে খসিয়া পড়িল। চন্দ্রকান্তের ন্যায় পণ্ডিত আমাদের দেশে দুর্ল্লভ। তাঁহার যশোবিভা কেবল এ দেশে নহে সুদূর পাশ্চাত্য দেশেও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার কাতন্ত্র ছন্দ প্রক্রিয়া নামক অতিরিক্ত সূত্র সমূহ সম্বলিত বৈদিক ব্যাকরণ তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। মোক্ষমূলর, কাউয়েল, রোষ্ট বেণ্ডেল প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তাঁহার ভাষ্য পড়িয়া যেরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে স্বতঃই আনন্দরসে আপ্লুত হইতে হয়। এই সকল পত্রের মধ্যে আমরা কেবল মোক্ষমূলারের একখানি পত্রের ভাবার্থ নিম্নে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

৭নং নরহ্যাম গার্ডন্‌স্, অক্সফোর্ড,
১২ই জুলাই, ১৮৯৬।

প্রিয় মহাশয়—

আমি ভারতবর্ষ হইতে এত পুস্তক উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হই যে সেগুলি পাঠ করা বা প্রাপ্তি স্বীকার করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি ইচ্ছা করি যে আমার ভারতবর্ষের বন্ধুগণ আমার বয়স (৭২ বৎসর) এবং আমাকে কত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয় তাহা স্মরণ রাখিবেন। তাঁহাদের অনুগ্রহের জন্য আমি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রত্যেককে পৃথকভাবে ধন্যবাদ দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আপনার গ্রন্থ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা। আপনার কাতন্ত্র ছন্দ প্রক্রিয়া একখানি মৌলিক গ্রন্থ—ইহা নিশ্চয়ই আপনার অনেক পরিশ্রমের ফল। কেবল ভারতবর্ষে নয়—বিলাতেও প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ, বিশেষতঃ বৈদিক পণ্ডিতগণের ইহা বিশেষ উপকারে আসিবে। বৈদিক ব্যাকরণের জন্য য়ুরো-

পীয় সুধীগণ অনেক প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু পানিনি, কাত্যায়ণ, প্রভৃতির ন্যায় প্রামাণ্য গ্রন্থ অতি বিরল। দুর্ভাগ্যের বিষয় পাণিনিতে ছন্দ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয় নাই। আপনার গ্রন্থে সে অভাব দূর হইয়াছে। ইহাতে আমার অধ্যয়নের বিশেষ সাহায্য হইবে।

য়ুরোপের আর্য্যগণ আপনাদের প্রাচীন সাহিত্যে যেরূপ আগ্রহের সহিত মনোনিবেশ করিয়াছেন তাহাতে আপনি দুর্ভাগ্য বা কলিযুগের চিহ্ন বলিয়া আক্ষেপ করিবেন না। আপনাদের ইহাতে বরং সন্তোষ প্রকাশ করাই উচিত। আমরা জ্ঞানের সাধারণতন্ত্রে বাস করিতেছি, এখানে সকলেই সমান—এখানে কার্য্য দেখিয়া বিচার হয়—বংশমর্য্যাদা বা বর্ণ দেখিয়া নহে। অবশ্য সংস্কৃত শিখিবার আমাদের অপেক্ষা আপনারা অধিকতর সুবিধা ভোগ করেন—কিন্তু আমাদেরও কতকটা সুবিধা আছে বৈ কি। আপনারা এমন কতকগুলি কুসংস্কারের বশে চলেন যে সে সকল হইতে দূরে থাকা আপনাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে, কিন্তু আমাদের সে সব কিছুই নাই।

আমার কথার উপর নির্ভর করিবেন, য়ুরোপের পণ্ডিত সমাজে আপনার গ্রন্থের যথেষ্ট সমাদর হইবে, কুত্রাপি অনাদর হইবে না, ইহা স্থির জানিবেন। ইত্যাদি।

আপনার নিতান্ত বিশ্বস্ত
ম্যাক্স্‌মুলার।

চন্দ্রকান্তের গোভিল গৃহ্য সূত্রের ভাষ্যও কম সমাদর লাভ করে নাই। এই ভাষ্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাঙ্গালার এসিয়াটিক সোসাইটীর সম্মানিত সদস্য পদে বরিত হন। দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার সমকক্ষ অতি অল্পই ছিলেন। কণাদের বৈশেষিক দর্শন অবলম্বন করিয়া তিনি স্বয়ং একখানি বৈশেষিক দর্শন প্রকাশ করেন। কেবল দর্শন শাস্ত্রে কেন—কাব্য, বৈদিক ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায়, অলঙ্কার, নাটক প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি নানা বিষয়ে অন্যূন চল্লিশখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

তিনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক নিযুক্ত



হন এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার সাংখ্যতত্ত্ব ও নৈষধের ব্যাখ্যা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি মনীষিগণ পর্য্যন্ত চমৎকৃত ও মুগ্ধ হন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদান করেন। তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শ্রীগোপাল মল্লিক প্রদত্ত বেদান্ত দর্শনের প্রবন্ধের জন্য বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রকান্ত ১২৪৩ সালে ১৯শে কার্ত্তিক ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরে ভূমিষ্ঠ হন এবং বিগত ২০ শে মাঘ ৭৪ বৎসর বয়সে ৺কাশীধামে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার পিতা ৺ রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। রাধাকান্ত যখন মানবলীলা সম্বরণ করেন তখন চন্দ্রকান্ত বালক মাত্র। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে চন্দ্রকান্ত বিশেষ বিপন্ন হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানপিপাসা কিছুতেই নিবৃত্তি হইল না। তিনি বিক্রমপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত দীননাথ ন্যায়পঞ্চাননের নিকট স্মৃতি অধ্যয়ন করেন। তারপর নবদ্বীপে আসিয়া ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ, কাশীনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণের নিকট স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত ইত্যাদি অধ্যয়ন করিয়া পরিশেষে তর্কালঙ্কার উপাধিতে ভূষিত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করত একটী টোল সংস্থাপন করেন। চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে ছাত্র আসিয়া তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিল। তিনি কেবল অধ্যাপনাতেই সময় অতিবাহিত করিতেন না, অধ্যয়নে অনেক সময় ক্ষেপন করিতেন। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতির বিশেষ অনুরোধে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হন নাই—তাৎকালিক বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর আন্তরিক আগ্রহ দেখিয়া তিনি অবশেষে স্বীকৃত হন।

তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতকে হারাইয়া কেবল বঙ্গদেশ নহে, সমগ্র সভ্য জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ সমূহ তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে জগতে বিরাজিত থাকিবে—তাঁহাকে অক্ষয় ও অমর করিয়া রাখিবে।

# পরেশনাথ।

হে সাধক, সাধনার উপযুক্ত স্থান
ক'রেছিলে নির্ব্বাচন। যার বক্ষ'পরে
যোগাসন পাতি' হয়েছিলে অগ্রসর
নির্ব্বাণের পথে, সে যে মহাযোগী নিজে।
নিশ্চল নিথর দেহ সংযত-ইন্দ্রিয়
আছে মগ্ন গিরিরাজ বাহ্যজ্ঞান ভুলি'
পরম পুরুষ ধ্যানে; অভ্রভেদী শির
করি' নত পদ তাঁর করিছে পূজন।
সুমধুর স্তবগীতি মেঘমন্দ্রে কভু,
কভু বিহঙ্গের কলতানে তুলি' তার
করিছে বন্দনা সুখে সাধনার ধনে।
পেয়েছে পেয়েছে গিরি বুঝি দরশন
দিয়েছে বুঝিবা তায় সখা আলিঙ্গন।
এ মহা মিলন-সাক্ষ্য দানিতে জগতে
ওই দেখ মেঘকুল নাচে ঘিরি' তায়,
চন্দ্র সূর্য্য তারা বাসরের দীপমালা
জ্বলে তার চারিপাশে অম্লান জ্যোতিতে
ওই দেখ প্রেমানন্দ ধারা বক্ষ ভেদি'
ঝরিছে গিরির শত প্রস্রবণরূপে—
শীতল নির্ম্মল বারি ধরা-তাপ-হারী।
ধন্য, বিবেচনা, হে পরেশ নাথ! বটে,
এই গিরি উপযুক্ত আদর্শ তোমার।
মুক্তিপথ-যাত্রী তোমা সম মানবের,
বটে, এই উপযুক্ত সাধনা-সোপান॥

শ্রীচুণীলাল সেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ,
স্থাপিত ১৩০১ বঙ্গাব্দ,
বঙ্গীয়-সা... পরিষৎ,
... ...াব্দ,